# মাধ্যমিক
# শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

আলমগীর হোসেন খান

# মাধ্যমিক
# শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

www.pathagar.com

# মাধ্যমিক
# শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

আলমগীর হোসেন খান

হাতেখড়ি

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
আলমগীর হেসেন খান


| | | |
|---|---|---|
| প্রথম প্রকাশ | ❑ | অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২ |
| প্রকাশক | ❑ | আবু তাহের সরকার<br>হাতেখড়ি<br>৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০<br>ফোন : ৭১৭৫১৮১ |
| গ্রন্থস্বত্ব | ❑ | লেখক |
| বর্ণবিন্যাস | ❑ | এম এ মান্নান<br>এম এন কম্পিউটার<br>বাংলাবাজার, ঢাকা |
| মুদ্রণ | ❑ | গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স<br>৪৫/খ/২ রজনী চৌধুরী রোড<br>গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪ |
| প্রচ্ছদ | ❑ | মশিউর রহমান |
| মূল্য | ❑ | ৩০০.০০ টাকা |

*Maddhamik Shikkha Proshason O Babosthapona* by Alamgir Hossain Khan, Published by Abu Taher Sarker, Printed by Gawchhia Press & Publications, Dhaka-1204, Cover Design : Mashiur Rahman

**Price :** US$ 7

**ISBN** 984 70200 0063 1


www.pathagar.com

# উৎসর্গ

বিশিষ্ট সমাজসেবক,
শিক্ষানুরাগী, বিজ্ঞান শিক্ষার
অগ্রযাত্রার সাহসী সৈনিক
**জনাব আবু মুসা সরকার**
শ্রদ্ধাস্পদেষু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ভূমিকা

একটি জাতির উন্নতির চাবীকাঠি হল শিক্ষা। মেধা ও মননের আধুনিক এবং চিন্তা চেতনার প্রাগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে পারে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কমবেশি ধারণা আছে প্রায় সকলের। যুগোপযোগী মাধ্যমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর জন্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতিও প্রণীত হয়েছে, কিন্তু এর চূড়ান্ত রূপ দেখতে হলে আমাদের হয়তো আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। শিক্ষার গতি আনতে হবে সময়ের প্রয়োজনকে স্বীকার করে। অতীতের ভালোকে ধরে রাখতে হবে। আজকের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে হবে। 'মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা' কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসরণ করে লেখা হয়নি বটে, তবে আমি পেশাগত জীবনে বি. এড এবং এম. এড কোর্সের সাথে যুক্ত আছি বিধায় এ ধরনের একটা গ্রন্থ রচনায় হাত দেই। বইটি রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত লেখকের রেফারেন্স গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, সেগুলো যথাযথ আত্মস্থ করা হয়েছে। আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের ডীন এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জনাব ফাতেমা খাতুন প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এই গ্রন্থের বর্ণবিন্যাসে সহযোগিতা করেছেন এম এন কম্পিউটারের মান্নান ভাই। তার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভুলত্রুটি হয়তো রয়ে গেছে। সুধীজনের পরামর্শ এবং সহৃদয় সহযোগীতায় পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটি মোচনের আশা রাখি। গ্রন্থটি পেশাগত মাধ্যমিক পর্যায়ের সম্মানিত শিক্ষক, বি.এড এবং এম.এড কোর্সের প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষনার্থীদের কিছুটা উপকারে আসলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

আলমগীর হোসেন খান
অরুণাচল, ৩/গ
৩৭ শহীদ সাব্বির আলম খন্দকার রোড
মাসদাইর, নারায়ণগঞ্জ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# সূচি

শিক্ষার অর্থ, সংজ্ঞা, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ১১
শিক্ষার বিভিন্ন মতবাদ ২০
বিভিন্ন যুগে শিক্ষাব্যবস্থা ৩৩
উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ৪৭
শিক্ষা কমিশনের আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষা ৭৪
হান্টার শিক্ষা কমিশন ১৮৮২ (প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন) ৭৬
স্যাডলার কমিশন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন) ৭৯
শরীফ কমিশনের রিপোর্ট (১৯৫৮) ৮২
আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৫৭ ৮৭
কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭২ ৮৯
মনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন ৯৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা এবং শ্রেণী শিক্ষকের দায়িত্ব ১০২
মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কাঠামো ১০৬
মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের কাঠামো ১১১
বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের উন্নয়ন ১১৩
নির্বাচিত ৬টি দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, জাপান, ইংল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা ১১৫
"নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন শিক্ষা" প্রাণহীনদের মত ১২৬
"প্রচলিত শিক্ষাক্রমের সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন" ১৩০
নেতৃত্ব (Leadership) ১৩৩
জেন্ডার ধারণা ১৩৯
শিক্ষার্থীর শিখন পর্যালোচনা ১৪৪
একজন বিএড প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শিক্ষণ পর্যালোচনা ১৪৯
গবেষণামূলক সমীক্ষা (১) ১৫২
গবেষণামূলক সমীক্ষা (২) ১৬৬

www.pathagar.com

শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার ও সহপাঠীর ভূমিকা ১৮৫
মূল্যবোধ ১৯১
বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শিক্ষা ১৯৩
মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশ প্রক্রিয়া ঃ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ান ১৯৭
বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েদের চাহিদা ২০৪
গ্রাম অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ২০৬
আবেগ (Emotion) ২১১
আবেগিক বিকাশ ২১৫
স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য ২২৪
বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থী ২২৭
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ২৩২

www.pathagar.com

# শিক্ষার অর্থ, সংজ্ঞা, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

**(ক) শিক্ষা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ**

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'শাস' অর্থ শাসন করা। নিয়ন্ত্রন করা, নির্দেশ দেওয়া বা উপদেশ দেওয়া। শিক্ষা শব্দের সমার্থক 'বিদ্যা' শব্দটি সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ জানা বা জ্ঞান আহরণ করা। দু'টো শব্দের অর্থগুলোর প্রতি একটু খেয়াল করলেই প্রতীয়মান হয় যে, দু'টো শব্দই বিশেষ কৌশল অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। কাজেই বুৎপত্তিগত অর্থে 'শিক্ষা' বলতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা কিংবা বিশেষ কোন কৌশল আয়ত্ত করাকে বুঝায়। বাংলা 'শিক্ষা' শব্দের ইংরেজি Education' শব্দটির উৎপত্তি নিয়েও মতভেদ রয়েছে। একটি মতানুসারে 'Education' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন 'Educare' শব্দ থেকে। এ শব্দটির অর্থ লালন পালন করা, প্রতি পালন করা বা পরিচর্যা করা। এ সম্পর্কে অন্য একটি মতবাদ হচ্ছে 'Education' এর উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন 'Educare' শব্দ থেকে। 'Educare' অর্থ 'নিষ্কাশন করা' কিংবা ভিতর থেকে বাহিরে নিয়ে আসা, কিংবা নির্দেশনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া। তৃতীয় মতবাদ 'Education'-এর উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন 'Educatum' শব্দ থেকে। এর অর্থ শিক্ষণ বা শিক্ষাদানের কাজ। এ তিনটি ল্যাটিন শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করলে আমরা 'Education' শব্দের তিনটি অর্থ পাই :

(ক) যথাযথ যত্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে জীবনপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা জীবন পথে চলার জন্য শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত কৌশল হাসিল করতে সাহায্য করা।

(খ) জীবনকে গড়ে তোলার জন্য তার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ও বিকাশ সাধন করা কিংবা যথাযোগ্য নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার জীবন পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

(গ) নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জনে সহায়তা।



www.pathagar.com

**(খ) শিক্ষার সংজ্ঞা**

শিক্ষা মানুষের জীবনে অমূল্য ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। এর উপর নানা শিক্ষাবিদ দার্শনিক জ্ঞানীদের নানা মতবাদ থাকলেও একে যুগে যুগে বহুভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং এসকল সংজ্ঞার কোনটিই এককভাবে যুগের দাবী মেটাতে সক্ষম নয়। কাজেই পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি সূত্রকে বিশ্লেষণ না করে শিক্ষার মূল অর্থ যে শব্দ থেকে উদ্ভূত সেই শব্দ দ্বারা তৈরি সূত্র এবং এই সূত্রের মূল অর্থের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে উদ্ভূত সূত্রাদির বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার মূল অর্থ অনুধাবনের চেষ্টাই সবচেয়ে ভাল বলে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েই শিক্ষার সূত্র সংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত আকারে রূপ দেয়ার চেষ্টা করছি।

সাধারণ অর্থে বিদ্যাভ্যাসকে শিক্ষা বলা হয়। যিনি যত বেশি পুঁথিগত জ্ঞান লাভে সক্ষম, তিনি তত বেশি শিক্ষিত বলে সমাজের কাছে সমাদরও স্বীকৃতি পান।

আভিধানিক অর্থে 'শিক্ষা' বলতে অভ্যাস, শেখা বিদ্যাভ্যাস, অধ্যায়ন, চরিত্রোন্নতি 'প্রভৃতিকে বুঝায়। সু-অভ্যাস বা ক্রমাগত অনুশীলন শিক্ষার জন্য অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষার চরমোৎকর্ষ, চরিত্রোন্নতি, বিদ্যাভ্যাস লব্দ শিক্ষাকে স্থায়ী করে। অর্থাৎ সুনিয়ন্ত্রিতও সুনিগড়িত ব্যক্তিসত্তার কাঙ্ক্ষিত বিকাশ সাধন সার্থক শিক্ষার লক্ষ্য। ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে ইংরেজি Education শব্দের উৎপত্তি। Educ শব্দের মূলগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, E=out; duco=to Lead/to draw,out বা পরিচালিত করা, বের করা, প্রতিবাদ করা। তাহলে শিক্ষা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Education-এর তাৎপর্য হচ্ছে মানব মনের সহজাত বৃত্তি বা সম্ভাবনাকে বিকশিতও পরিচালিত করাই শিক্ষা। অন্যকথায়, শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করে প্রতিষ্ঠিত জীবনের দিকে পরিচালিত করাই শিক্ষা।

অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী, শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকগণ শিক্ষা সম্পর্কে তাদের মতবাদ দিয়েছেন। গ্রীক শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, "যখন কোন শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষকের কাছে আসে তখন তার মন একদম শূন্য থাকে না। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, তার মন দাগবিহীন এক টুকরো সাদা কাগজের মত থাকে না; বরঞ্চ তার মন নানাবিধ অভিজ্ঞতা, অবলোকন প্রবণতায়, বিভিন্ন প্রশ্নভারে, নানাবিধ ভাবাদর্শন এবং প্রতিনিয়ত অর্জিত অতিসাধারণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকে।

প্লেটো বলেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনের পরিপূর্ণ বিকাশ, যাতে সে তার অন্তর চক্ষু দ্বারা সব জিনিস সঠিকভাবে উপলব্ধি করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে।" তাঁর মতে, "শিক্ষা কোন নতুন নীতির জন্ম দেয় না। বরঞ্চ পৃথিবীতে বিদ্যমান নীতিমালাকে পথ প্রদর্শন বা পরিচালিত করে।"



www.pathagar.com

শিক্ষা অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্দি করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "মানুষ যে পূর্ণতা নিয়ে ধরাধামে আগমন করে, তার যথার্থ বিকাশই শিক্ষা।" অর্থাৎ তাঁর মতে, "জ্ঞান মানুষের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা ঘুমন্ত অবস্থায় তার মাঝে বিদ্যমান এবং শিক্ষা তাকে জাগিয়ে তোলে।"

মহাত্মাগান্ধী বলেছেন, "মানুষের যে সকল ভালগুন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে, তার যথাযথ বিকাশ সাধনই প্রকৃতি শিক্ষা।"

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ডিউই বলেছেন, "শিক্ষাই জীবন, শিক্ষা জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়।" জন ডিউই তার মতবাদের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে, "অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবহারের আশানুরূপ পরিবর্তনই শিক্ষা।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, "মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা।"

বনফুলের মতে, "সমাজের কল্যাণে মানুষ নামক ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব যে উপায়ে সম্যক রূপে বিকশিত হয়, তার নামই শিক্ষা।"

হেনরী এ্যাডামসের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে ধনাগারও সংস্কৃতি-যা মৃত্যুহীন।"

জোনাথ সুইটির মতে, "শিক্ষা আত্মার একটি চোখ।"

র্মরগান কিং এবং রবিনসনের ভাষায়, "আচরণের যে কোন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনকে শিক্ষা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা অনুশীলন বা অভিজ্ঞতার ফলে সংঘটিত হয়।"

দার্শনিক প্লেটোর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি।"

দার্শনিক এরিষ্টটলের মতে, "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা।" *(Education is the creation of a sound mind in a sound body.)*

শিক্ষাবিদ জন এমোস কমেনিয়াসের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোক-পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ নিজেকে ও বিশ্বকে জানতে পারে।"

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদ রুশোর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ।" *(Education is the child's development from within.)*

ফ্রেডারিক হার্বার্টের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন।" *(Education is the development of good moral character.)*

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, "সর্বোত্তম শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা যা আমাদেরকে কেবল তথ্যই পরিবেশন করে না বরং বিশ্বাসতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।" *(The highest education is that which does not give us information but marks our life in harmony with all existence.)*



www.pathagar.com

**(গ) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

মানব মনের বিকাশ ও তাকে প্রতিষ্ঠিত জীবনের পথে পরিচালনা উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। প্রতিটি জিনিসের যেমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে তেমনি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। তবে দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন সমাজের যুগোপযোগী পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্যও উদ্দেশ্য নির্মিত হয়। যে কোন রাষ্ট্রের সমাজ, মানুষ, তার সাংস্কৃতিক ভাব-ভাবনা ভৌগোলিকও রাজনৈতিক পরিবেশ তথা জাতীয় আদর্শের প্রভাবও প্রতিফলনে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা স্বাভাবিক। মানব শিশুর বিকাশ সাধনের মূল লক্ষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধন এবং এই জীবন তার সমাজ, জাতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক রক্ষা করে রূপায়িত হবে এটাই কাম্য। সুতরাং দেশ কালের পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য পরিমার্জিত হয়ে থাকে।

শিক্ষা বিশেষ লক্ষ্য মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে পরিচালিত করা। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকগণ মতবাদ দিয়েছেন।

গ্রীক দার্শনিক ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সত্যের আবিষ্কার ও শিক্ষার অপনোদন।"

গ্রীকদার্শনিক ও স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ প্লেটোর মতে, "মনের ও দেহের পরিপূর্ণ উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত।"

এরিষ্টটল অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছেন, "ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত কার্যকলাপের মাধ্যমে সুখ আহরণই শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

শিক্ষাবিদ কমোনিয়াসের মতে, "শিশুর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।"

শিক্ষাবিদ জনলক অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্তকরণ।"

স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ পেস্টালৎসী বলেছেন, "একই সাথে শরীরও মনের পূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।"

শিক্ষাদান ও পদ্ধতির জনক হার্বাট বলেছেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর সম্ভাবনা ও অনুরাগের পূর্ণবিকাশ এবং তার নৈতিক চরিত্রের আকাঙ্ক্ষিত আত্মপ্রকাশ।"

শিশু শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেল মন্তব্য করেছে, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে একটা সুন্দর বিশ্বাসযোগ্যও পবিত্র জীবনের উপলব্দি।"

শিক্ষাবিদ পার্কারের মতে, "একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সমাজে আত্মপ্রকাশের জন্য যে সমস্ত গুণ নিয়ে শিক্ষার্থী ধরাধামে আগমন করেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এই সফল গুণের যথার্থ বিকাশ সাধন।"



www.pathagar.com

আধুনিক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডিউই বলেছেন, "শিক্ষা উদ্দেশ্য হবে মতবাদের ধারাবাহিক পূর্ণবিন্যাস।"

উপরোক্ত শিক্ষাবিদদের প্রদত্ত মতবাদের উপর একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে যে সত্য উপস্থাপন করে তার মূল স্তর হচ্ছে, মানব সভ্যতার প্রতিটি স্তরে মানুষের গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ সাধনে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া শিক্ষার যেসব উদ্দেশ্য লক্ষণীয় তা নিম্নরূপ :

১। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাদের জীবনে স্ব-স্ব ধর্মকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়ে থাকেন। সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনকেই তাঁরা আজ ও শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গুরুত্ব প্রদান করেন।

২। শরীরও মন পুষ্ট না হলে কোন কাজেই সফলতা লাভ সম্ভব নয়। সুতরাং শিশুর শরীর ও মনকে সবলও কার্যক্ষম করা শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলা যায়।

৩। শিক্ষায় কোন নীচ সংকীর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। জ্ঞান লাভের আনন্দ উপভোগই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের ফলেই মানুষের রুচিও আচার ব্যবহার উন্নত হয় এবং তার দ্বারাই উন্নতিও সুসভ্য মানুষ এবং অনুন্নত ও অসভ্য মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

৪। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মানুষ যতই গর্ববোধ করুক না কেন, সেও শরীরের দাবী চাহিদা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাকে সর্বাগ্রে উহা পূরণের ব্যবস্থা করতে হয়। এই শিক্ষার লক্ষ্যও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে জীবিকা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা।

৫। উপযুক্ত ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক প্রস্তুত করাকে পৃথিবীর উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হিসাবে আজও চিহ্নিত।

৬। সম্পূর্ণ বা সুন্দর মহৎ ও উন্নত জীবন প্রস্তুত করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

৭। বর্তমান সময়ে চরিত্র গঠনই শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বা একমাত্র লক্ষ্য বলা হয়। রেমন্ট অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় বলেছেন, "ছাত্রকে মাংসপেশীর সম্পদ দান, তার জ্ঞানে সম্পূণতা সাধন বা তার সুকুমার ভাবাবৃত্তি উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষকের চরম বা সর্বপ্রধান লক্ষ্য নয়। ছাত্রের চরিত্র বল বৃদ্ধিও তার নির্মল চরিত্র গঠনই শিক্ষকের চরম লক্ষ্য।"



www.pathagar.com

৮। জাতিগঠনও জাতীয় উন্নতি করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। অর্থাৎ ব্যক্তির বিকাশ ও জাতির প্রয়োজন এই উভয় দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা করলেই অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ, সবল ও শক্তিশালী এবং সম্পদশালী জাতি গড়ে উঠতে পারে।

৯। ছাত্রজীবনে ছাত্র-ছাত্রীকে প্রকৃত মেধাবিকাশে সহায়তা দান করাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

১০। ছাত্রজীবনে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীকে নৈতিক শিক্ষাদান শিক্ষার উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে চলতে হবে এবং ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকদের এ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা ব্যতীত শিক্ষাদান ও সফলতা লাভ করা অসম্ভব।

**(ঘ) শিক্ষার পরিধি**

শিক্ষার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই শিক্ষার পরিধি রুপ লাভ করে। শিক্ষার সূত্র যদি শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর উন্নতির সঙ্গে এক করে দেখে তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। একজন শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব তাঁর ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজ জীবনে প্রয়োজনীয় নাগরিক দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা এবং যা সুশিক্ষা ব্যতীত অর্জন কোনভাবেই সম্ভব নয়। কতগুলো বিধিবদ্ধ নীতিকথা মুখস্ত করে শিক্ষার্থীর যে শিক্ষা লাভে প্রয়াস পায় তা বস্তুত পক্ষে সমগ্র শিক্ষার ১০ ভাগের একভাগ এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই শিক্ষাই আমাদের দেশের গোটা শিক্ষাঙ্গনে শিকড় গেড়ে বসে আছে। যাকে রাতারাতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন আদৌ সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার পরিধি তিনটি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। আর এই বস্তুগুলো হচ্ছে শিক্ষার্থীর (১) মানসিক (২) নৈতিকও (৩) শারীরিক উন্নতি সাধন। তাই সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত শিক্ষার সূত্রানুযায়ী আমরা শিক্ষাকে একসাথে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিকও নৈতিক গুণাবলীর পূর্ণবিকাশ সাধনের মাধ্যম বলে অভিহিত করতে পারি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষার পরিধি সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তোলার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাপূর্ণবিন্যাস করতে আমেরিকার শিক্ষা কমিশন যে মূল্যবান নীতিমালা আশ্রয় নিয়েছিলেন এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। কমিশনের ভাষা অনুযায়ী শিক্ষার পরিধি মূলত :

১. স্বাস্থ্য সংরক্ষণ

২. আত্মপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জন।



www.pathagar.com

৩. পরিবারের সু-সভ্য হিসাবে পরিচিতি হওয়া।

৪. ভালভাবে জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা অর্জন।

৫. নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ।

৬. অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার।

৭. নৈতিক চরিত্র লাভ প্রকৃতির সমন্বয়ে রূপ লাভ করা।

বাংলাদেশের শিক্ষা পরিধি এরূপ হওয়া উচিত। কারণ শিক্ষা জীবন পরিপূর্ণতাও সফলতা লাভে উক্ত মূল্যবান ভাষাগুলোর কোনটিকেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

**(ঙ) শিক্ষা পদ্ধতি**

শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে মনে রাখতে হবে শিক্ষা পদ্ধতি মূলত শিক্ষার ধারণা থেকে উদ্ভব। শিক্ষাকে যখন শিক্ষার্থীর সহজাত গুণাবলীর বিকাশ সাধনের শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় তখন আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে বিরাজমান সম্ভাবনার বিকাশ সাধনের সোপান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনকে কতগুলো তৈরি তথ্য ও জ্ঞান দ্বারা ভারাক্রান্ত করাকে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি কোনভাবেই অনুমোদন করে না। শিক্ষাকে যেহেতু শুধু পড়ানোর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান কাজ আছে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করানো। পড়ানো নীতি কথাগুলো যদি শিক্ষার্থীকে তার বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে না পারে তবে তার লব্দ জ্ঞান মূল্যহীন হতে বাধ্য। শিক্ষা পদ্ধতির কাজ হলো শিক্ষার বিষয়বস্তুর এমনভাবে রূপায়িত করা যা উপস্থাপনে শিক্ষার্থী তার মানসিক ভারসাম্য না হারিয়ে সহজও সাবলীলতার সঙ্গে তা আয়ত্ত করতে পারে।

শিক্ষাবিদ সক্রেটিস তাঁর সময়ের শিক্ষা পদ্ধতির মূলসূর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "সুষ্ঠুও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের মূল কথা হচ্ছে, শিশুকে কোন কিছু বলে প্রশ্নের মাধ্যমে তার কাছ থেকে নানাবিধ তথ্য আদায়ের চেষ্টা করতে হবে এবং প্রশ্ন ধরা হবে। শিশু যা জানে তা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে তাকে অজানার দিকে নিয়ে যাওয়া।" অর্থাৎ শিক্ষার কাজ হবে শিশুকে সাহায্য করা যাতে সে তার পর্যবেক্ষণও অন্যান্য লব্দ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তার বক্তব্য সহজতর করে উপস্থাপন করতে পারে।

একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলেছেন, "কেউ কখনো কাউকে শিক্ষা দিতে পারে না, আমাদের প্রত্যেককে নিজে নিজেকে শিক্ষা দিতে হবে। বাইরের শিক্ষক শুধু উপদেশ দানের মাধ্যমে ভেতরের শিক্ষককে জাগ্রত করে কোন বিষয়কে আয়ত্ত করতে উৎসাহও দান করে।"



www.pathagar.com

একটি চারাগাছের পরিচর্যায় নিয়োজিত মালির কর্তব্য আর একজন শিক্ষকের কাজের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। গাছ যেমন তার প্রয়োজনীয় উপাদান ঠিকমত পেলে আপনা-আপনি বেড়ে ওঠে, শিশুও তেমনি আপনা-আপনি বেড়ে উঠে যদি সে তার বর্ধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঠিকমত পায়। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষক যদি শিশুর চলার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সব আবর্জনা তিরোহিত করে শিশুর জ্ঞান লাভের পথ প্রশস্ত করে দিতে পারেন তবেই জ্ঞান আপনা আপনি শিশুর কাছে হাজির হয়। একজন শিশু সবরকম জ্ঞান নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করে থাকে। আর এই সঠিক পথ প্রদর্শনই শিক্ষকগণের প্রধান কাজ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পুরানো পদ্ধতি অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীকে কেবল বলে দেয়া বা তাদের কাছে বিরামহীনভাবে কোন কিছু ব্যক্ত করাকে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি অনুমোদন করে না। নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থী আত্মপ্রচেষ্টায় শিক্ষা লাভ করবে এবং শিক্ষক থাকবেন সাহায্যকারী বা উপদেষ্টার ভূমিকায়।

**(চ) শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা**

মানবজাতির সফলতার মূলে রয়েছে শিক্ষা। পৃথিবীতে যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী। ছাত্রজীবনে সফলতার মূল চাহিদা শক্তি শিক্ষার সুষ্ঠুব্যবহার। শিক্ষাছাড়া সামাজিক ও জাতীয় জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়। এই শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "বিদ্যা অর্জনের জন্য প্রয়োজনবোধে তোমরা সুদূর চীন দেশে যাও।" এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহানবী (সাঃ)-এর জন্মের পূর্বে আরবের জাতিসমূহ ছিল অশিক্ষিত, মূর্খ ও কুসংস্কারে জর্জরিত। মহানবী (সাঃ)-এর শাসনামলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আরবজাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। তৎকালিন সময়ে চীন ছিল শিক্ষার দিক দিয়ে একমাত্র উন্নত জাতি এবং চীন ছিল আরবদেশ থেকে দূরে অবস্থিত। আরবজাতিকে উন্নত করার জন্য মহানবী (সাঃ) শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই এই উক্তিটি করেছিলেন। এই বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই।

মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন তেমনি দেশের আর্থ সামাজিক বিকাশে শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম। শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য আজ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য আজ আফ্রিকান দেশগুলো অনুন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত। কোন দেশের গণতন্ত্রকে পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র অচল।"



www.pathagar.com

শিক্ষাই কেবলমাত্র একজন মানুষও একটি সমাজকে বিবেকবান আর অন্যদিকে উৎপাদনক্ষম করতে পারে। আর উৎপাদনক্ষম মানব সম্পদ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীকে ছাত্রজীবন থেকেই যথাযথ পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে। কেননা, শুধুমাত্র শিক্ষাই মানুষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে। করতে পারে তাকে সামাজিক সম্পদ সৃষ্টিকারীর দক্ষও শক্তিশালী কারিগর।" শিক্ষা ছাড়া সভ্যতার সুফল ভোগ করা অসম্ভব। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে স্বীয় অবস্থান অর্জনের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই। লেখক শংকরের মতে, "পড়তে বা লিখতে না জানলে কোন সভ্যতার মর্মমূলে প্রবেশ করা যায় না। অক্ষরই তো এ যুগের মানুষকে উন্মুক্ত করার চাবিকাঠি।"

শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, স্বচ্ছ করে। তাই শিক্ষিত লোকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুন্দরের ফুল ফোটে, অসুন্দর সেখানে অবস্থান নিতে পারে না।

মনীষী ফ্রান্সিস বেকন যথার্থই বলেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে মনের চোখ, সে চোখের দেখা কখনো ভুল হতে পারে না।"

মনীষী সিসেরোর মতে, "যতোই উর্বরা হোক একটা ক্ষেত যেমন কর্ষন ছাড়া ফসল দিতে পারে না। শিক্ষা ছাড়া মানুষের মনের অবস্থাও তেমনি।"

ডেমোক্রিটাসের মতে, "শিক্ষা ছাড়া কেউ জ্ঞান এবং নিপুণতা লাভ করতে পারে না।"

দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষের দু'চোখের দৃষ্টি যতই প্রখর হোক না কেন আলো ছাড়া সে দৃষ্টির অন্তর্ভেদী ক্ষমতা সুতীক্ষ্ম হয় না।

মনীষী জে. আর. লাওয়েল যথার্থই বলেছেন, "যে শিক্ষা আত্মাকে বলিষ্ঠ করে না, দৃষ্টিকে প্রসারিত করে না, তা আদৌও শিক্ষা নয়।"

সমাজের ভাল-মন্দ, ন্যায় অন্যায়ের নির্ভুল ব্যবধান একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই নির্ণয়, করা সম্ভব। তাছাড়া সমাজে মানুষও পশুর মাঝে যে বিষয়টি পার্থক্য তৈরি করে তার নাম জ্ঞান। শিক্ষা জ্ঞানের বাহন। যাদের মাঝে জ্ঞানের অভাব থাকে তাদের মাঝে প্রকৃত শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়। যারা শিক্ষার অভাবে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত হয় তাদেরকে "মূর্খ নামে অভিহিত করা হয়। প্রবাদ আছে, "মূর্খ মানুষ পশুর সমান।" মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে থেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

ছাত্র জীবনে শিক্ষার বিকল্প নেই। ছাত্র জীবন আর শিক্ষা একে অপরের সাথে অঙ্গা-অঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষা ছাড়া ছাত্র জীবন যেমন– কল্পনা করা যায় না; তেমনি সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছতে হলে শিক্ষার, প্রয়োজন অপরিসীম। শিক্ষার মাধ্যমে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহন করতে পারলেই ছাত্র জীবনের যথার্ত ফল পাওয়া যাবে। তাই গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল বলেছেন, "শিক্ষার শিকড় তেতো হলেও এর ফল মিষ্টি।"



www.pathagar.com

# শিক্ষার বিভিন্ন মতবাদ

**(ক) শিক্ষা-দর্শন**

শিক্ষা ও দর্শন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দর্শন শিক্ষার দিক নির্দেশনা করে এবং শিক্ষা দর্শনের বাস্তব প্রতিফলন নিশ্চিত করে। দর্শন ছাড়া শিক্ষা অন্ধ এবং শিক্ষা ছাড়া দর্শন খোঁড়া। মানুষের জীবন যাত্রাকে সুন্দর, গতিশীল, সাবলীল ও উন্নতি করার জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত বিশ্বাস কার্যকর, মৌলিক নীতিও মতবাদ। দর্শনের কাজ এসব নীতি ও মতবাদ অবলম্বনে সার্থক জীবন রুপায়ন।

**(খ) শিক্ষা সম্পর্কিত দার্শনিক মতবাদ**

বিভিন্নযুগে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। এই মতবাদগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যেই শিক্ষা তত্ত্ব একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শিক্ষা সম্পর্কিত দার্শনিক মতবাদগুলো হচ্ছে–

১. ভাববাদ (Idealism)
২. বাস্তববাদ (Realism)
৩. জড়বাদ (Materialism)
৪. প্রকৃতিবাদ (Naturalism)
৫. প্রয়োগবাদ (Pragmitism)।

**১. ভাববাদ ঃ** দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন অথচ সবচেয়ে, আলোচিত মতবাদটি হচ্ছে ভাববাদ বা আদর্শবাদ। সাধারণ অর্থে ভাব বলতে কোন কিছু সম্বন্ধে মানুষের মনের ধারণা বুঝায়। শিক্ষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ভাব হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যম। অর্থাৎ ভাবের মাধ্যমে আমরা বিশ্বজগতকে উপলব্দি করি। গ্রীক দার্শনিক এ্যানাক্সাগোরাসের 'দর্শন' চিন্তায় সর্বপ্রথম ভাববাদ রূপায়িত হয়ে উঠে। এ মতবাদে যে কয়জন বিখ্যাত দার্শনিক বিশ্বাস করতেন তাঁদের মধ্যে প্লেটো, সক্রেটিস, কান্ট, হেগেল, পেস্টালৎসী, ফ্রোয়েবেলও বার্কলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



www.pathagar.com

ভাববাদীদের শিক্ষাদর্শন হচ্ছে প্রত্যেকটি শিশুই সৎ গুণাবলী নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে এবং এসব গুণাবলী ঘুমন্ত অবস্থায় বা অবিকশিত অবস্থার শিশুর মাঝে বিদ্যমান থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিও পরিচর্যা দ্বারা শিশুর এই ঘুমন্ত সম্ভাবনার ও প্রতিভাকে বিকশিত করাই শিক্ষার সবচেয়ে বড় কাজ। তাঁদের মতে, শিক্ষা শিশুর ঘুমন্ত সম্ভাবনার পরিবর্তন বা বর্ধন করতে পারে না, তবে পূর্ণতা লাভে সহায়তা করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য থাকবে প্রতিটি শিশুই যাতে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন অনুযায়ী কতিপয় মূলনীতির উপর শিক্ষা গ্রহণ করে।

**২. বাস্তববাদ ঃ** বাস্তববাদ অনুসারে কোন বস্তু যেভাবে অবস্থান করে তাই তার অস্তিত্ব। বাস্তববাদের মূলকথা, স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি। বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল বাস্তববাদের প্রবক্তা। বাস্তববাদীদের পোষিত মতবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে আছে। এ মতানুসারে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বস্তু এবং বস্তুর উর্ধ্বে যে বিষয়ের অস্তিত্ব আছে। সে ভাববাদীদের শিক্ষাদর্শন নিম্নরূপ :

(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মোপলব্দি। এর অর্থ নিজেকে জানো, কিন্তু কোন বিষয় শিক্ষা লাভ করতে হলে কাজের মাধ্যমে হাতে কলমে সম্পাদান করতে হবে। যে কোন বিষয়ে জানার মাধ্যমে শোনা কথা বেশি দিন থাকে না। কারণ, কথা বা শব্দের সমষ্টি বাতাস মাত্র। কিন্তু হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করলে তা বেশি দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। সামাজিক মানুষই আদর্শ নাগরিক। সমাজের রীতি নীতি ও আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারাই শিক্ষা।

(খ) যেসব বিষয়ের সাথে মানুষের সামাজিও বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই বা যেসব বিষয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অপারগতা শিক্ষা করা নির্থক।

(গ) Learning by doing অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে শিক্ষা আহরণ। এ নীতির ভিত্তিতে শিশুকে হাতে-কলমে কিছু শেখার মাধ্যমে উপযুক্ততা লাভে সক্ষম করে তুলতে হবে। শিশুকে শিক্ষক শিক্ষাদান করবেন না, তার জন্য কেবল শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলবেন। সৃষ্টি পরিবেশে শিশু শিক্ষা লাভ করে, অনাগত ভবিষ্যতে তার দায়িত্ব পালনে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

(ঘ) সমগ্র মানব জীবনই একটি পরীক্ষা প্রণালী। জন ডিউইর মতে, বিভিন্ন পরীক্ষা প্রণালী দ্বারা শিক্ষার বাস্তব লক্ষ্যে চলতে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

**৩. জড়বাদ ঃ** প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে মানুষ তার নিয়ন্ত্রণে আনবার এবং সে শক্তি ও সম্পদকে ব্যক্তি ও সমাজের নানাবিধ উন্নতি কর্মে বিনিয়োগ করবার লক্ষ্যে জড়বাদ দর্শন বিশ্বাসী। জড়বাদের শিক্ষাদর্শন হচ্ছে, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে মানুষ তার জীবনে কাঙ্খিত, পরিবর্তন ও কল্যাণ সাধন করবে।



www.pathagar.com

**৪. প্রকৃতিবাদ ঃ** প্রকৃতিবাদে বিশ্বজগতে যাবতীয় বিষয়কে প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করা হয়। এমতবাদ অনুসারে (১) মহাবিশ্বে যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, (২) মহাবিশ্বের যাবতীয় ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে; (৩) বস্তু যত প্রকার পরিবর্তন বা রূপান্তর হয় তা প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়। মোটকথা, এ মতবাদে একমাত্র প্রাকৃতিকেই চরমও মৌল সত্য বলে গ্রহণ করা হয়। এখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্থান নেই। এ মতবাদের প্রবর্তক জ্যাঁ জ্যাক রুশো। প্রাকৃতিক মতবাদের শিক্ষাদর্শন হচ্ছে–

(ক) প্রকৃতির সাথে শিশু শিক্ষার সম্পর্ক অতি নিবিড়। প্রাকৃতিক উপায়ে ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মাধ্যমে প্রকৃতির নিকট হতে শিশু শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এটাই হবে তার মেধা বিকাশের উত্তম পথ।

(খ) শিশুর আচরণ, চিন্তা, প্রবণতা প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করবে। এক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ বা বিধি-বিধান থাকবে না।

(গ) শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশু সক্রিয়। খেলাধুলার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) শিশুর উপর কৃত্রিম শৃংখলা আরোপ সমীচীন নয়। তার ভেতর স্বাভাবিকভাবে শৃংখলাবোধ জাগ্রত হবে।

**৫. প্রয়োগবাদ ঃ** আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য যে দার্শনিক মতবাদটি প্রসিদ্ধ লাভ করেছে তা হচ্ছে প্রয়োগবাদ। প্রয়োগবাদ দর্শনের মূল কথা হচ্ছে–

একমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বিধিবদ্ধ সত্যে উপনীতি হওয়া যায়। সত্য মানুষের তৈরি। খাঁটি বা চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। সত্য পরিবর্তনশীলও কথা ফলের উপর নির্ভর করে। এ মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছেন জন ডিউই।

প্রয়োগবাদের শিক্ষা দর্শন হচ্ছে–

(ক) আধুনিক শিক্ষায় কর্মকেন্দিক পদ্ধতির প্রচলন প্রয়োগবাদের অবদান। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিও সমাজ উভয়ের চাহিদাকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

(খ) শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশেরই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে এ দর্শনে বিবেচনা করা হয়।

(গ) আচরণ ও শিক্ষা লাভের দিক থেকে শিশুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং তার ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

(ঘ) শিক্ষার্থীর শিক্ষা তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল। অভিজ্ঞতার পূর্ণগঠনই শিক্ষার সত্যিকারের রূপ।

(ঙ) বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য, কাজেই সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতির সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিদ্যালয় নিবিড়ভাবে জড়িত।

### (গ) ইসলামি শিক্ষা দর্শন

শিক্ষার স্বরূপ রূপায়নে ইসলামি শিক্ষা দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের যেসব বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে সেগুলি হচ্ছে–



www.pathagar.com

১. ইসলাম সম্পর্কে ধারণা।

২. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব।

৩. মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি।

৪. আবুদ মাবুদের সম্পর্ক।

৫. তৌহিদ ও শিরক।

৬. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

৭. ইসলামের বিদ্যা অর্জন।

**১. ইসলাম সম্পর্কে ধারণা ঃ** ইসলামী মতবাদের চরম সত্যও পরম সত্তা হলেন পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহর উপর বিশ্বাসই ইসলামের মূলনীতি। ইসলামী দর্শন মতে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই। তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, তিনি একমাত্র উপাসনাযোগ্য, তিনি সকলের প্রতিপালক এবং তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

**২. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঃ** আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। আসমান জমিনের সার্বভৌমত্ব তাঁর হাতে। তাঁর সার্বভৌমত্ব আস্থা স্থাপনের অর্থ হচ্ছে, তাঁর আদেশ ও নিষেধ অবনত মস্তকে মেনে নেয়া এবং কথাও কাজে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর বাণীতে উল্লেখ আছে "আমি একাগ্র মনে সরল বিশ্বাস সেই মহান সত্তার দিকে নির্বিষ্ট হলাম, যিনি আকাশ-পাতাল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আর মুশরিকদের সামিল নই।" *(আল-কোরআন)*

**৩. মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি ঃ** আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিনিধি হিসেবে এবং পৃথিবীতে তাঁর হুকুমে দ্বীন কায়েম করতে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আল কোরআনে বলেছেন, "আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বা খলিফা সৃষ্টি করেছি।" তিনি আরো বলেন, "আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি সেই দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করছি তেমাকে যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা, ঈশাকে, তা এই যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে মতভেদ কর না।"*(আল-কোরআন)*

**৪. আবুদ-মাবুদের সম্পর্ক ঃ** চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা প্রকৃতি জগতের প্রকৃতির নিখুঁত বিন্যাস, মহাশূন্যে উদয়-অস্তরত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি এক মহাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই মহাশক্তি হলো স্বর্গ, মর্ত, ও আকাশ-পাতালের স্রস্টা ও পরিচালক আল্লাহ। আল্লাহ হচ্ছেন (মাবুদ) এবং মানুষ হচ্ছে তাঁর দাস (আবুদ)। সুতরাং সেই মহাশক্তির কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা মানুষের ধর্ম। এই হলো ইসলামি দর্শনের মূল কথা।

**৫. তৌহিদ ও শিরক ঃ** আল্লাহর যে শরীক নেই-এই মতবাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকে বলে তৌহিদ। তৌহিদবাদ সকল সুখ-শান্তির উৎস। তৌহিদের বিপরীত



www.pathagar.com

অবস্থা হলো শিরক। তৌহিদের সঙ্গে যেমন ন্যায়পরায়ণতা জড়িত, শিরকের সঙ্গে তেমনি স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থপরতা জড়িত। তৌহিদে বিশ্বাসী হৃদয়ে সকল জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। আল্লাহ সমস্ত গুণের আধার। তার ওই সকল গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্যে মানুষকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

**৬. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান ঃ** ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। অন্যান্য ধর্মের মত কতগুলো রীতি নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়। তাই আল্লাহর নির্দেশিত পথে যে কোন কাজ সমাধা করা ইবাদতের অর্ন্তভুক্ত। একজন মুসলমান নামাজের মোনাজাতে বলে থাকেনঃ হে প্রভু আমাকে ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল দাও। ইসলাম দর্শনে দ্বীনও দুনিয়ার একটি সুখকর সমন্বয় সাধন করতে পেরেছে।

**৭. ইসলামে বিদ্যাঅর্জন ঃ** ইসলাম বিদ্যাঅর্জনের উপর অত্যাধিক জোর দিয়েছে। কেননা বিদ্যা অর্জন আল্লাহকে চেনার একমাত্র উপায়। তাই আল্লাহ সর্বপ্রথম বাণী যা যা তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ করে ছিলেন তাহলো "পাঠ কর, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটরক্ত থেকে। পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" *(আল-কোরআন)*

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, তুলনামূলকভাবে বিশ্বের যেকোন ধর্মের চেয়ে ইসলাম শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে অসংখ্য বাণী লিপিবদ্ধ আছে।

## (ঘ) কয়েকজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ

পৃথিবীতে যেসব জ্ঞানী ও গুণীজন তাদের প্রতিভাকে মানব কল্যাণার্থে ব্যয় করে গেছেন এবং মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গেছেন, রেখে গেছেন তাদের প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তারাই দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ নামে পরিচিত। তারা মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তাদের জ্ঞানও বিদ্যাশক্তি তাদের চির অমর করে রেখেছে। এসব বিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে কতিপয় দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের কথা তুলে ধরা হলো–

### ১। পিথাগোরাস (৫৮২-৫০৭ খ্রীঃ পূর্ব)

পিথাগোরাস প্রাচীন গ্রীসের পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের অন্তগর্ত সামোস দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণে তিনি আজীবন নানা মহাদেশে পরিভ্রমণ করেছেন। পরম ধার্মিক ও মহাজ্ঞানী পিথাগোরাস দক্ষিণ ইটালির ক্রেসেনার একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি মৌখিক অনুশীলন এবং ব্যবহারিক কাজকর্ম দুভাবেই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর মতে, গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নের



www.pathagar.com

উপরই জ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয়। এই ধারণা নিয়ে তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, সংগীত, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সংখ্যাকে সম্পৃক্ত করেই শিক্ষাদানে অভিনবত্ব এনেছিলেন। পিথাগোরাসের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি ছিল প্রাচীন গ্রীসের পণ্ডিতদের মিলন কেন্দ্র।

## ২. সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রীঃ পূর্ব)

বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা-দার্শনিক সক্রেটিস খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭০ সালে এথেন্সে জন্ম গ্রহণ করেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৯ সালে এথেন্সেই মৃত্যুবরণ করেন। যুক্তিসিদ্ধ (Dialectic) মতবাদের প্রবর্তক হিসেবে সক্রেটিসের নাম শিক্ষার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মানুষকে কোন কিছু শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। দার্শনিক শিক্ষাবিদ সক্রেটিস এই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষকে তার বিশ্বাসের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং কতকগুলো সুচতুর প্রশ্নের মাধ্যমে তাকে তার চিন্তাশক্তির বিকাশে সাহায্য করতেন যাতে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু গ্রহণ করতে না হয়। সক্রেটিসের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল জিজ্ঞাসা, যা এই একবিংশ শতকের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে ও একটি বিশেষ কৌশল বা কলা হিসাবে সবদেশে স্বীকৃত। শিশু-কিশোর তরুণের আগ্রহের দ্বীপকে প্রশ্নের সলিতার মুখে উদ্দীপ্ত করে তোলার নৈপুণ্য একজন বিদগ্ধ শিল্পীর কাজ। বক্তৃতা নয়, বাধ্যবাধকতা নয়, নিয়ম নীতির কাঠিন্য নয় প্রশ্নোত্তরের অবকাশ দিয়ে ছাত্রের কল্পনা, ধারণা, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির ক্রমাগত মার্জনার ও অনুশীলনে তার স্বচ্ছ মনের ফলকে যে সত্য তথ্যটি প্রতিবাত হতো শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি সেটি। এই অভিজ্ঞতাই ছাত্রের জীবনে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করতে সাহায্য করত।

## ৩. প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রীঃ পূর্ব)

ভাববাদী শিক্ষাবিদ প্লেটো খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৭ সালে এথেন্সে জন্ম গ্রহণ করেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে এথেন্সেই মারা যান। প্লেটো তাঁর শিক্ষদর্শনে তাঁর শিক্ষক সক্রেটিস কর্তৃক গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্লেটোর শিক্ষা মতবাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বহন করে তাঁর বিখ্যাত বই প্রজাতন্ত্র (The Republic) এবং আইন (The low) গ্রন্থ। প্রজাতন্ত্র তাঁর জীবনের প্রথমদিকে রচিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে কিছু আদর্শ মতবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। প্লেটোর আইন গ্রন্থদ্বয় শেষজীবন পর্যন্ত রচিত। এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছে।

প্লেটো বলেছেন যে, শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি মানসিক প্রশিক্ষণ যেখানে বয়স্ক লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতা হতে অর্জিত সুন্দর জীবন যাপনের অভ্যাস গঠন



www.pathagar.com

করেন এবং সে জ্ঞান পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বিতরণ করে থাকেন। প্লেটো তাঁর, "প্রজাতন্ত্র গ্রন্থে তিন ধরনের শিক্ষার কথা বলেছেন।

১। **প্রাথমিক শিক্ষা ঃ** এ শিক্ষা স্তরের উদ্দেশ্য হবে শিশুর মনে সৌন্দর্য চেতনা এবং নীতিবোধের উন্মেষ ঘটানো। এর বয়সসীমা (৬ বছর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত)।

২। **মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ** চরিত্র গঠনই এ শিক্ষা স্তরের মূল লক্ষ্য হবে। এ পর্যায় ছাত্রদের শৃংখলা জ্ঞান, কর্তব্যবোধ শিক্ষা দেয়া, বুদ্ধি ও চিন্তার মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি এবং জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করা। এ সময় তিনি কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ এবং এ সময় পরপর কয়েকটি পরীক্ষা দিয়ে তাদের সামর্থ্য, অভিরুচি ও অনুরাগের স্তর নির্ধারণ করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে হতো। এর বয়সসীমা (১৮-৩০ বছর পর্যন্ত)।

৩। **উচ্চ শিক্ষা ঃ** জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় জটিল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গবেষণামূলক আলোচনা এবং তাদের সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করা। এসময় পরীক্ষাগুলোতে কৃতকার্য হলে তাকে বলা হত উত্তম শিক্ষক ও উত্তম দার্শনিক। এর বয়সসীমা (৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত)।

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে রুপায়িত করার জন্য প্লেটো তিন ধরনের বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। (১) প্রাথমিক জ্ঞানের উপযোগী প্রতিষ্ঠান। (২) শরীরবিদ্যা, সময় বিদ্যা, সংগীত, সাহিত্য, গণিত, পৌরনীতি, আইন শাস্ত্র, গবেষণা ও অর্থনীতি শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান। এবং (৩) নির্বাচিত ধীমান ছাত্রদের রাষ্ট্রনায়ক তৈরি করার জন্য বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, দর্শন, আইন সংক্রান্ত ব্যবহারিক বিদ্যা, উচ্চতর জ্ঞানও অভিজ্ঞতা দানের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব দানের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বছর পর্যন্ত উত্তম দার্শনিক হবার মতো শিক্ষা দেওয়া হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্লেটো শিক্ষিত সচেতন নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে এক নবতর সমাজ রচনার লক্ষ্যেই শিক্ষানীতির রুপ কল্পটি প্রস্তুত করেছিলেন।

## ৪. এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রীঃ পূর্ব)

বিশ্ব বরেণ্য শিক্ষা দার্শনিক এরিস্টটল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে এবং সেখানেই ৩২২ খ্রীঃ পূর্বে পরলোকগমন করেন।

সক্রেটিস প্লেটো-এরিস্টটল যেন একই মালায় গাঁথা আলোকবৃত্ত। সক্রেটিস জ্যোতিষ্ক, প্লেটো ও এরিস্টটল দুটি-উজ্জল নক্ষত্র। শিক্ষক গোষ্ঠীর পুরোধা সক্রেটিসের সর্বোত্তম ছাত্র প্লেটো এবং শিক্ষাদর্শনের অধিনায়ক প্লেটোর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র এরিস্টটল। সুদীর্ঘ ১২ বছর এরিস্টটল ছিলেন প্লেটোর উৎসাহী ছাত্র এবং একাডেমীর নিষ্ঠাবান সহকর্মী। তারপর তিনি লাইসিয়ামে একটি শিক্ষালয় স্থাপন



www.pathagar.com

করেন। তাঁর ধীমান ও শক্তিধর ছাত্র মহাবীর আলেকজাণ্ডার (৩৫৬-৩২৩ খ্রীঃ পূর্ব) এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

এরিস্টটল তাঁর "পলিটিক্স" নামক গ্রন্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গরুপে বিশ্লেষণ করেন। গ্রীক্সের শিক্ষক ও দার্শনিক চিন্তাধারায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধনে সার্থক এরিস্টটলকে বলা হয় সব জ্ঞানীদের গুরু। তাঁর মতে, শিশুর সুপ্ত বিকাশ সাধনই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। নিজ পারিবারিক পরিবেশে শিশু পাঁচ বছর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করবে। ছয় বছর বয়সেই শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব নিবে রাষ্ট্র এবং এ শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক পর্যায়ে খেলা, গান ও আঁকার মাধ্যমে লেখা পড়ার পাঠ শুরু হবে। শিশু-মানসে রুচি ও প্রবৃত্তির বৈষম্য-অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়েও বৈচিত্র থাকবে এবং শিশুকে তার প্রবণতাও প্রতিভা অনুযায়ী চরিত্র গঠনে সাহায্য করতে হবে। রাষ্ট্রীয় আদর্শকে রুপায়িত করতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সুখী সমাজ গঠন করতে শিক্ষার ভূমিকা যে ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ এ কথা এরিস্টটল বার বার বলেছেন, তাঁর "পলিটিক্স" গ্রন্থে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুন্দর রুপরেখা তুলে ধরেছেন।

৬২ বছরের জীবনকালে এরিস্টটল তাঁর অন্যান্য কাজের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাঁর শিক্ষা-দর্শন বর্তমানেও শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা ধারার উৎস হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ও তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাক্রমের কাঠামো রচনার তিনি যে অবদান রেখে গেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ ও তার প্রভাব বিস্তার লক্ষণীয়।

### ৫. আবু ইবন রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রীঃ)

বিখ্যাত আরব দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ আবু-ইবন রুশদ স্পেনের কর্ডোভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এরিস্টটলের মতবাদে অনুরাগী রুশদ ছিলেন এক প্রখর প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ধর্ম, দর্শন, আইন, সাহিত্য, চিকিৎসা বহু বিদ্যার দক্ষও জ্ঞানী রুশদ এরিস্টটলের রচনাবলীর অনুবাদ ও বিশ্লেষণ করেন। প্লেটোর রিপাবলিকের ব্যাখ্যা ছাড়াও এই বিজ্ঞ মনীষী দর্শন, শিক্ষা, আইন, ব্যাকরণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বেশ-কয়েকটি পুস্তক ও রচনা করেন।

রুশদের মতে, বিশ্ব জগতের সামগ্রিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা। জগৎব্যাপী কার্যকরণের সমন্বয় আছে বলেই বিশ্বজগৎ এত সুশৃংখলার চলছে জীবনকেও এমনি সুশৃংখলায় গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলতেন, নিজেকে জানবার আগ্রহ যার নেই, সে বড়ই দুর্ভাগা। কেন না স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা তার নেই এবং এ জন্য শিক্ষার মর্যাদা সম্পর্কে সে অজ্ঞান। মানুষ অজ্ঞতার জন্যই ধর্মও দর্শনের মধ্যে সৃষ্টি করে বিরোধ। ধর্মের বিষয় সৎ, সত্য পথে চলা। অনুসন্ধিৎসা এবং



www.pathagar.com

সাধনা ছাড়া সত্যের পরিচয় লাভ করা দুঃসাধ্য। দর্শন এই সত্য সন্ধানের পথও পদ্ধতিকে সমান করে দেয়। পাশ্চাত্য দর্শনের তথা শিক্ষা দর্শনের ইতিহাসে রুশদের রচনাবলী নির্দেশক রুপে পরিগণিত।

### ৬. আবু নাসের আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রীঃ)

দর্শন, শিক্ষা ও গণিত সম্পর্কে নিজের মত বিশ্লেষণ করে যিনি সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁর নাম আবু নাসের আল ফারাবী। তিনি ৮৭০ খ্রীঃ ককেশিয়ায় ফারাব শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ফারাবীর মতে, মানুষের আত্মা স্রষ্টার এক মহান দান। বুদ্ধি মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের শ্রেষ্ঠপন্থা। বিশ্বজুড়ে যে ঐক্য সূত্র বিদ্যমান, তার উপলব্ধি করা সাধনা সাপেক্ষ। শিক্ষাই মানুষকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহাত্মা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

### ৭. ইবনে সিনা ৯৮০-১০৩৭ খ্রীঃ)

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং সুচিকিৎসক ইবনে সিনা ইউরোপে আবিসিনা নামে পরিচিত। ইসলামি দর্শনের নীতি বিশ্লেষণে সুপণ্ডিত ইবনে সিনা ছিলেন মহাজ্ঞানী এরিস্টটলের দর্শনসূত্রের অন্যতম প্রধান ভাষ্যকর। তাঁর রচিত দার্শনিক বিশ্বকোষ। "কিতাবুল সিকারা" এরিস্টটলের দর্শন সূত্রের প্রতিফলন খুব বেশি। ইবনে সিনা সত্যানুসন্ধানী ও মুক্তবুদ্ধির ধারক ছিলেন। তাঁর চিন্তা ধারার নির্বাস শিক্ষাতত্ত্বের মৌল ভিত্তি রচনার বিশেষ অবদান রেখেছে।

### ৮. জন লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রীঃ)

ইংরেজ শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জনলক তাঁর একজন প্রিয় বন্ধুর পুত্রকে শিক্ষা সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়ে পত্রগুচ্ছ লিখেছেন, তার থট কনসার্নিং এডুকেশন (Thoughts concerning Education) গ্রন্থটি সেগুলিরই সংকলন। জন লকের মতে, জন্ম লগ্নে শিশুর মন থাকে স্বচ্ছ একটি শ্লেটের মতো। দিনে দিনে তাতে জ্ঞানও অভিজ্ঞতার বিচিত্র রেখা চিত্রিত হয়। সুতরাং শিশু শিক্ষায় পরিবেশ এবং কার্যক্রম হতে হবে নির্মল, সহজ এবং মুক্ত। এজন্য তিনি গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জোর বক্তব্য রেখেছেন। কেননা, শৈশব থেকেই শিশুর লালন পালনের জন্য উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করলে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক চরিত্র সুন্দর সুস্পমঞ্জসরূপে গড়ে উঠে। উপযুক্ত শিক্ষাই চিত্তে একধারে স্বাধীন ভাব-ভাবনা ও প্রয়োজনীয় সংযমে সংমিশ্রণ ঘটাতে পারে এবং ভবিষ্যতে যে কোন ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতির মোকাবেলা করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে।



www.pathagar.com

## ৯. জ্যাঁ জ্যাকস রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রীঃ)

রুশো একজন ফরাসী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে সুপরিচিত। রুশো ১৭১২ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৭৮ সালে মারা যান। রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় "The Social contract" এবং "Emili" প্রগতিশীল শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত করে। এই গ্রন্থদ্বয় রুশোর শিক্ষা সম্পর্কিত ভাবনা-বিস্তার সাক্ষ্য বহন করে।

প্রকৃতির কোলে ফিরে যাও। প্রবাদটি রুশোর নামের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। রুশো কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মূল সূর হচ্ছে, "The Child should be thought by the lows af Nature." অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মানুসারে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। প্রকৃতির নিয়ম শিশুর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কারণ শিশু তার পরিবেশের মাধ্যমেই শিখে। রুশো শিক্ষা সম্পর্কিত তত্ত্বের মূল নীতিগুলো হচ্ছে–

১. শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী। প্রকৃতি বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শিশুর দেহ-মনের স্বাভাবিক শক্তি, সামর্থ, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি।

২. শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রকৃতিগত শক্তিগুলোর সুষম বিকাশের মাধ্যমেই শিক্ষা সংগঠিত হয়, শিক্ষক বা অন্য কোন বহিঃশক্তির চাপে অর্জিত হয় না।

৩. শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নয় বরং শিক্ষার্থী বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ও দেহ-মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন।

৪. শিক্ষা প্রদানের আগে শিক্ষার্থীকে ভালভাবে নিজের স্বতন্ত্র সত্ত্বা সম্পর্কে জানতে হবে।

৫. শারীরিক সক্রিয়তা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ব্যবস্থা শিক্ষ কর্মসূচিতে থাকতে হবে।

৬. পনের বছর পর্যন্ত শিশু কেবল প্রকৃতি থেকে শিক্ষা লাভ করবে।

## ১০. ফেড্রারিক ফ্রোয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২ খ্রীঃ)

ফেড্রারিক ফ্রোয়েবেল ১৭৮২ সালে জার্মানিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৫২ সালে জার্মানিতেই মারা যান। শিক্ষার ইতিহাসে তিনি দার্শনিক শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিত।

শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক হিসাবে ফেড্রারিক ফ্রোয়েবেল অনেক অবদান রেখে গেছেন যার মধ্যে "কিন্ডারগার্টেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্ডারগার্টেন একটি জার্মানি শব্দ যার বাংলা অর্থ "শিশুর বাগান।" বাগানের অগণিত চারার মতই মনে করতেন তিনি শিশুদেরকে। বাগানের চারাগাছকে পূর্ণরূপে আত্মবিকাশের দায়িত্ব মালী পালন করেন। তদ্রুপ শিক্ষককে পরিমিত যত্ন



www.pathagar.com

সহকারে, শিশুদেরকে লালন পালনের দায়িত্ব বহন করতে হবে। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে উপরোক্ত নিয়ম অনুসরণই এই পদ্ধতির মূল কথা।

ফ্রোয়েবেলের শিক্ষামূলক গবেষণা পুস্তক "The Education of man" ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের মূল তত্ত্ব ছিল শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সব পরিকল্পিত উপায়ে বিবর্তনধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাশ রাখা। শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রোয়েবেলের অবদান হচ্ছে–

১। এককের মতবাদই ছিল ফ্রোয়েবেলের মতবাদের মূলভিত্তি। তাঁর মতে, প্রতিটি বস্তু প্রথমত, তার নিজের কাছে এককের প্রতিচ্ছবি এবং একই সঙ্গে বৃহত্তর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের আওতাধীন বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞান, শিল্পকলা, অংকনও ভাষা। পাঠ্যক্রমের আওতাধীন প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে ধর্মীয় মতবাদ জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

৩। শিশুদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় সহযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্যই তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে।

৪। শারীরিক প্রশিক্ষণকে শিক্ষার সামগ্রিক অভিজ্ঞতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ধরা হয়।

৫। তাঁর মতে, খেলা হচ্ছে একটা পবিত্র প্রক্রিয়া বা আধ্যাত্মিক কাজ যা শিশুকে আত্মোন্নতির, দিকে পরিচালিত করে।

৬। শিশু পবিত্র মানস নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে সে অবাঞ্ছিত গুণাবলী অর্জন করে। তাই শিশুর পিতা-মাতা ও শিক্ষকের কাজ হবে পরিবেশের নোংরা প্রভাব হতে শিশুকে মুক্ত রাখা।

## ১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীঃ)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালে পশ্চিম বঙ্গের জোড়াসাঁকো গ্রামের ঠাকুর পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৪১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু কবি হিসেবে বিশ্বে ও শিক্ষাজগতে সমাদর লাভ করেননি, তিনি শিক্ষক ও শিক্ষা-দার্শনিক হিসেবে ও সমাজের কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে গেছেন।

আমাদের বর্তমান স্কুলগুলো সত্যিকারের শিক্ষাদানও আদর্শ মানুষ তৈরির উপযোগী নয়, সে কথা তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলে গেছেন "অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে একটা কথা জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলার জন্য যে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে যার নাম স্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশক্তির শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। অথচ ইহাই স্কুল। ইহার ঘরগুলো নির্মম, ইহার দেয়ালগুলো পাহাড়াওয়ালার মতো। ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই। ইহা



www.pathagar.com

খোপ ওয়ালা একটা বড় বাক্স; কোথাও কোন সজ্জা নাই, ছবি নাই, রং নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষনের লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভাললাগা, মন্দলাগা বলিয়া একটা খুব মানবড় জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে চিন্তা একেবারে নিঃশেষে, নির্বাসিত।"

কবিগুরু শান্তি নিকেতন স্থাপন করেন শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতবাদকে রুপ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কল মাত্র নহে। স্বতঃ উৎসাহিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হবে না।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদের নীতিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতি হচ্ছে :

১. জন্মের প্রথম গ্রন্থ

নিয়ে আসে অলিখিত খাত
দিনে দিনে পূর্ণ হয়
বাণীতে বাণীতে। (শেষ লেখা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, শিশু জন্মের সময় মন থাকে একটি সাদা কাগজের ন্যায় এবং ক্রমান্বয়ে তা শিক্ষার অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

২. বদ্ধ শ্রেণী কক্ষ প্রাণ ধর্মী চিত্তের সহজ বিকাশের জন্য বিরাট বাধা স্বরূপ।

৩. শিশুরা যাতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে তার জন্য পরিমিত উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীরা নিজে চিন্তা করতে শিখবে, সন্ধান কার্য চালাবে এবং কর্তব্য কাজ স্বহস্তে সম্পাদন করবে।

৫. শিক্ষার্থীরা যখন যেটুকু শিখবে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে শিখবে। এর ফলে শিক্ষা তার উপর চেপে বসবে না, শিক্ষার উপরই সে চেপে বসবে।

৬. আনন্দ সহকারে পড়তে পারলে শিশু পড়ার ক্ষমতা তার অজান্তেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার গ্রহণ ক্ষমতা, ধারণা শক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে চলে।

৭. চিন্তাশক্তি ও কল্পনা শক্তি দুটি-ই জীবনযাত্রাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৮. মনের গতি অনুসারে শিক্ষার পথ নির্দেশ করতে না পারলে তা কার্যকরী শিক্ষা হিসাবে অবহিত হতে পারে না।

৯. শিক্ষার একটি গুরুতর বিষয় হচ্ছে শিক্ষার্থীর আশানুরুপ ব্যবহারিক পরিবর্তন।



www.pathagar.com

১০. জীবনের শুরুতে শিক্ষার্থীর মন ও চরিত্রকে গড়ে তুলতে উপদেশের উপর নির্ভর না করে তার জন্য অনুকূল অবস্থা, অনুকূল পরিবেশ ও অনুকূল নিয়ম গড়ে তোলা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।



www.pathagar.com

# বিভিন্ন যুগে শিক্ষাব্যবস্থা

## ভূমিকা

মানব জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে কোন জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে ইতিহাস জানা। কোন জাতির ইতিহাস জানা না থাকলে সে জাতি যেমন উন্নতি লাভ করতে পারে না, তেমনি শিক্ষার ইতিহাস জানা না থাকলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন পূর্ণ হয় না এবং সে সাফল্য লাভ করতে পারে না। এ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও ইতিহাসবিদ সিনকো বলেছেন, "ইতিহাসকে কখনো অস্বীকার করা যায় না, যারা করে তারা নির্বোধ।" ছাত্র জীবনে সফলতা অর্জনের অন্যতম পূর্ব শর্ত হচ্ছে, শিক্ষা বিবর্তনের ইতিহাস জানা। উন্নত বিশ্বের ছাত্র-ছাত্রীরা এ সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞাত হয় অথচ বাংলাদেশে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। কিন্তু শিক্ষার ইতিহাস হচ্ছে শিক্ষাজীবনের অপরিহার্য অংশ। সেই কথা চিন্তা করেই এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের শিক্ষা বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে তুলে ধরা হলো :

## ক. প্রাচীনযুগ

উপাদানের স্বল্পতার কারণে প্রাচীন কালে বাংলায় কোন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল তার বর্ণনা দেওয়া, এমনকি সে সম্পর্কে একটি রুপরেখা প্রণয়ন করা খুবই কঠিন। তবে যেসব তথ্য হাতের কাছে আছে তার উপর ভিত্তি করে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যায়।

প্রাচীনযুগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা, পদ্ধতি ও প্রকৃতি যথার্থভাবে নিরুপণ করা খুবই দুরুহ ব্যাপার। সে যুগে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায় সত্য; তবে প্রাপ্ত সূত্রে হতে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

বৈদিক আর্যরা প্রাচীন বাংলার জনগণকে ভাল চোখে দেখত না। তারা তাদেরকে দস্যু ও ম্লেপ বলে মনে করত। কিন্তু কালের স্রোত ধারার আর্যভাষা ও সংস্কৃতি বাংলায় প্রবেশ করে, খুব সম্ভবত মৌর্য আমল থেকে।



www.pathagar.com

ধারণা করা হয় খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে বাংলার পণ্ডিত সমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। তবে চেষ্টা বোধ হয় কয়েক শতাব্দী আগেই শুরু হয়েছিল এবং বৌদ্ধ সংঘারাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলি ছোট বড় শিক্ষায়তন হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তাই দেখা যায় ফা-হিয়েন তাম্রলিপিতে দু'বছর অবস্থান করে, অধ্যায়ন ও পুঁথি নকল করেছিলেন। সপ্তম শতকে যখন হিউয়েন সাং কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কামরুপ, সমতট, তাম্রলিপি এবং কর্ণসুবর্ণ ভ্রমণে এসেছিলেন তখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার আর ও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি জনগণের জ্ঞান স্পৃহা ও জ্ঞান চর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সময়ে কজঙ্গলে ৬/৭টি বৌদ্ধ বিহারে তিনশর উপর বৌদ্ধ শ্রমণ; পুণ্ড্রবর্ধনের ২০টি বিহারে তিন হাজারের উপর শ্রমণ; সমতটে ৩০টি বিহারে শ্রমণ সংখ্যা দু'হাজারের উপরে; কর্ণসুবর্ণে ১০টি বিহারে একই সংখ্যক শ্রমণ ছিল। পুণ্ডবর্ধনের পো-সি-পো বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের রক্ত মৃত্তিকা মহাবিহার যে খুবই প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলে হিউয়েন সাং-এর সাক্ষ্যই আর প্রমাণ।

নালন্দা মহাবিহার এর সঙ্গে ষষ্ঠ, সপ্তম শতাব্দীর বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ মহাবিহারের মহাচার্য শীলভদ্র ছিলেন বাঙ্গালি। তিনি ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের সন্তান এবং হিউয়েন সাং এর গুরু। তিনি সমস্ত শাস্ত্রে ও সূত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সময়ে নালন্দা মহাবিহারের শ্রমণ সংখ্যা ছিল ১০ হাজার।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার সংঘারামগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। তবে এখানে যে শুধু বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রই পাঠ করা হতো তা নয়, বরং ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য সংগীত ও চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও বৌদ্ধ শ্রমণদের অধিতব্য বিষয়ের অন্তগর্ত ছিল। এই বিহারগুলিতে বাস করতেন ব্রাহ্মণ আচার্য উপাধ্যার এবং অগণিত দেবপূজক দেবপূজকগণ যে শুধু ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্রে চর্চা করতেন তা নয়, তারা নানা পার্থিব, দৈনন্দিন সমস্যাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা ও করতেন। এভাবে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ জৈন ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আশ্রয় করে আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা দীক্ষার বীজ বপন করা হয় এবং শতাব্দীকালের মধ্যেই তা সুফল বয়ে আনে। সপ্তম শতাব্দীর লিপিগুলির অলঙ্কারময় কাব্যরীতিই তার প্রমাণ।

ব্যাকরণ চর্চায়, বাংলাদেশ অতি প্রাচীনকালেই প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ইৎসিং যেসব বিদ্যা অনুশীলন করার জন্য তাম্রালিপ্তি এনেছিলেন তার মধ্যে শব্দ বিদ্যা অন্যতম। প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বৈয়াকরণিক চন্দ্র গোমী চান্দ্রব্যাকরণ পদ্ধতির স্রষ্টা। তিনি সপ্তম শতাব্দী বা তার আগে কোন এক সময়ের লোক। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন ও তাঁর জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রীতে। তিনি যে শুধু বৈয়াকরণিক ছিলেন তা নয়, তিনি তর্কবিদ্যায় ও পারদর্শী ছিলেন।



www.pathagar.com

প্রাচনিকালে ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্র ছাড়া দর্শনের আলোচনায় ও বাংলাদেশ প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। আগমশাস্ত্র গ্রহ গৌড় পাদকারিকা এ যুগেরই লেখা। কৌটিল্য ও গ্রীক ঐতিহাসিকবর্গ হতে শুরু করে হিউয়েন সাং পর্যন্ত সকলেই প্রাচ্য দেশকে হাতির লীলা ভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। তাই হাতির চিকিৎসা সম্বন্ধে আলাদা একটি শাস্ত্রই গড়ে উঠেছিল এতদ অঞ্চলে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হত্যায়ুর্বেদ (গজ চিকিৎসা) খ্যাতি লাভ করে।

সপ্তম শতাব্দীতে যে অলঙ্কৃত কাব্যরীতির সূচনা হয়েছিল, তার পরিপূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয় পাল আমলের গোড়ার দিকেই। সমসাময়িক লিপিমালা ও চতুর্ভুজের হরিচরিত কাব্যে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে বেদ, আগম, নীতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, মীমাংসা, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সব কিছুরই চর্চা হত। এসব বিচিত্র বিদ্যার চর্চা যে শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও বিদ্বজ্জন সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, মন্ত্রী, সেনানায়ক প্রভৃতি রাজপুরুষেরাও এ সব শাস্ত্র অনুশীলন করতেন। কিভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রের চর্চা হতো সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিজেদের গৃহে কিংবা বড় বড় মন্দিরকে আশ্রয় করে ছোট বড় চতুষ্পাঠী গড়ে তুলতেন এবং সাধ্যানুযায়ী বিদ্যার্থী গ্রহণ করতেন। বিদ্যার্থীরা এক বা একাধিক শাস্ত্র একজনের নিকট শিক্ষা শেষ করে অন্য শাস্ত্র পাঠ করার জন্য অন্য আচার্যের কাছে যেতেন। কোন বিশেষ শাস্ত্রে কেউ পারদর্শী হতে চাইলে তার জন্য বিশেষজ্ঞ আচার্য পাওয়া যেত। বাঙালি ছাত্ররা অনেক সময় পড়াশোনার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেতেন। ধর্মপ্রচার কিংবা বিদ্যাদানের জন্য বাঙালি আচার্যগণ অনেক সময় বাংলার বাইরে যেতেন। অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা যারা রাজা, মহারাজা ও সামন্ত মহা সামন্তগণ তাদের অর্থদান ভূমিদান করতেন। পণ্ডিত, কবি আচার্য প্রভৃতিদেরকে মাঝে মাঝে তারা পুরস্কৃত করতেন।

এ সময়ে পণ্ডিতগণ সংস্কৃতি ভাষাতেই তাদের গ্রন্থাদি রচনা করতেন। কিন্তু এ ভাষা সর্ব সাধারণের ছিল না বলে পালযুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার শিক্ষিত উচ্চ স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সেনযুগে তো সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাচর্চা, কাব্যচর্চা; জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার সুবর্ণ যুগ। তাই এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ না করলেও শিক্ষার প্রসারই বিভিন্ন শাস্ত্র চর্চার পথ সুগম করেছিল। মধ্যযুগের টোল পাঠশালারই কোন আদি সংস্করণ প্রাচীনযুগে বিদ্যমান ছিল। তবে গুরুগৃহে, আশ্রমে বা বৌদ্ধ বিহারেই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম চর্চার, পাশাপাশি পার্থিব বিষয়াদির যে চর্চা হতো; তা প্রাচীন যুগের প্রাপ্ত গ্রন্থরাজি থেকেই প্রমাণিত হয়। তবে এসব গ্রন্থাদিতে শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য নেই বললেই চলে।



www.pathagar.com

**খ. মধ্যযুগ**

বাংলার মুসলমান সুলতানগণ তাঁদের ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ সম্পন্ন করার জন্য প্রাথমিক বা উচ্চতর সব রকম শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ প্রদান করতেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শাসক, সুফী, উলামা, অভিজাতবর্গ, গোষ্ঠীপ্রদান এবং জনহীতৈষী ব্যক্তিবর্গ সকলেরই অবদান রয়েছে। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলি ইসলামি সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতো। সে সময় ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন কাজে নির্দেশনা দিতেন। শাসকগণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য এসব ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ভূমিদান করতেন। অবস্থাপন্ন লোকেরা এঁদেরকে গৃহশিক্ষক নিয়োজিত করার মাধ্যমে তাদের এলাকার অভ্যন্তরীণ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতেন।

তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মীয় রীতি নীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। সে কারণে দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়-হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তাদের স্ব-স্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী পৃথক দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মকতব ও মাদ্রাসা এবং হিন্দুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি পাঠশালা নামে পরিচিত ছিল। মুসলিমদের অনেক প্রতিষ্ঠানে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আবার অনেকগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আরবি ভাষাকে উৎসাহ করা হতো। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আরবি শিক্ষার পাশাপাশি ব্যাকরণ, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ও আইন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা দেওয়া হতো। তাই, স্বদেশী ভাষার এ বিদ্যাগুলিতে কদাচিৎ মুসলমানগণ শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মধ্যযুগে রাষ্ট্রভাষা ছিল ফরাসি। তাই জীবিকা নির্বাহের তাগিদে হিন্দু মুসলমান উভয় ফারসি ভাষা শিখতেন।

গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁ, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং রংপুরে শিক্ষা কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল। এসব স্থানে দেশ বিদেশী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুসলমান শাসকগণ স্থানীয় প্রতিভাবানদের সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে ও প্রথিতযশা ব্যক্তিদেরকে তাদের দরবারে আনার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করতেন না। পাঠশালার অনুকরণে মকতবসমূহ গড়ে উঠত যেখানে মুসলিম ছাত্রদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হতো।

মধ্যযুগে হিন্দুদের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। এখানে বিভিন্ন অঞ্চল হতে শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটত। নবদ্বীপ ব্যতীত সপ্তগ্রাম, সিলেট এবং চট্টগ্রামে ও সংস্কৃতি ও ফারসি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো। ছাত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ তাদের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য এসব স্থানে সমবেত হতেন।

এভাবে মধ্যযুগীয় বাংলার যে সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল, তা মুসলিম শাসনের পর থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে।



www.pathagar.com

## গ. উপনিবেশিক যুগ

ইংলিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকে তাদের দায়িত্ব বা আইনগত বাধ্যবাধকতার অংশ হিসাবে মনে করত না।

১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ নবায়নকালে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক একলক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হলে এ ধারার মধ্যে একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। এর ফলে শিক্ষা সংক্রান্ত অনুদান বিতরণের জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮২৩ সালে কলকাতার একটি জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন গঠিত হয়। কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্তে প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে মতামত প্রদান করে এবং সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষার জন্য এর তহবিল ব্যয় করে। ইংরেজি গ্রন্থসমূহ প্রাচ্য ভাষায় অনুবাদ করার জন্য এ তহবিলের একটি অংশ ব্যয় হয় এবং ইংরেজি ভাষার গ্রন্থ রচনা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয়।

এ সময় শিক্ষা খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছ থেকে এক নতুন অনুপ্রেরণা লাভ করে। প্রাথমিক মিশনারিদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের শীঘ্রই দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তোলে যে, ধর্মান্তরিত করণের গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসাবে অবশ্যই স্কুল চালু করতে হবে। ড্যানিশ মিশনারিগণ সত্যিই ভাগ্যবান ছিলেন (১৭০৬-৯২)। কারণ, তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদয় তত্ত্বধান ও সহানুভূতিপূর্ণ সহায়তা লাভ করেছিলেন। বাংলায় শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল এবং তারা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন, যদি না শ্রীরামপুর ও চুচঁড়ার ওলন্দাজগণ তাদেরকে রক্ষা না করতেন। এদের কার্যকলাপ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ে পাঠদান, একটি বিস্তারিত পাঠ্যক্রম এবং সুস্পষ্ট শ্রেণী প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করে। দেশীয় বিভিন্ন ভাষায় বই পুস্তক ছাপিয়ে মিশনারিগণ ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নয়নের প্রেরণা যোগায়। দেশীয় ভাষাসমূহ চর্চার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিষয়সমূহের শিক্ষাদান চলতে থাকে। এভাবেই ভারতে ইংরেজি শিক্ষার পথ সুগম হয়।

মিশনারিগণ ছাড়াও রাজা রামমোহন রায় এর মতো কিছু জ্ঞানদীপ্ত ভারতীয় ছিলেন যাঁরা উপলব্ধি করে ছিলেন যে, ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষাদিতেই হবে। গভর্নর জেনারেলকে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক স্মারক লিপিতে তিনি জোরালো সুপারিশ করেন যে, কলকাতার সংস্কত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাতিল করতে হবে এবং ব্রিটিশ সরকারের উচিত গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন, অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা এবং অন্যান্য উপকারী বিজ্ঞান বিষয়সমূহ নিয়ে অধিকতর উদার ও জ্ঞান দীপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।



www.pathagar.com

জেনারেল কমিটির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থীদের উত্তপ্ত বিতর্কই বিষয়টির প্রকৃতিতে একটি পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়। অধিকতর সংস্কার মনোভাব তরুণ সদস্যগণ প্রাচ্য শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার নীতি সম্পর্কে আপত্তি জানান এবং ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত ম্যাকলের বিবরণী দ্বারা-ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে এ বিতর্ক সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর সুপারিশ মালা বেন্টিঙ্ক এর অনুমোদন লাভ করে। ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের পেছনে অন্যান্য আরও কয়েকটি কারণ বেশ সহায়ক ছিল। উদাহরণস্বরূপ ছাপাখানা স্বাধীনতা আইন (১৮৩৫) ইংরেজি ভাষায় বইয়ের মুদ্রণ, প্রকাশনা ও প্রাপ্যতাকে উৎসাহিত করে এবং এভাবে পরোক্ষভাবে শিক্ষা প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। কয়েক বছর পরে সরকারি দলিল পত্রের ভাষা হিসাবে ফারসির বিলুপ্তি এবং এর পরিবর্তে ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষার প্রবর্তন ও উক্ত প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। চূড়ান্তভাবে, সকল সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজি জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে ১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবর হার্ডিঞ্জ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা ভারতে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদাকে জোরদার করে তোলে।

১৮৫৪ সালে চার্লস উড "এডুকেশন ডেসপ্যাচ" প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনার জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি, ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও "গ্রান্টস-ইন-এইড" প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব দেয় এবং এ প্রতিবেদন সরকারের ভবিষ্যত শিক্ষা নীতির মূল উপাদানের ভূমিকা পালন করা হতে দূরে ছিল। এ সময়ে তাদের কার্যক্রম পরীক্ষা চালনা, অধিভুক্তির জন্য অনুমোদন এবং ডিগ্রী ও সনদপত্র প্রদান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা, কলেজ শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণে তেমন সুফল বয়ে না আনলেও নতুন শিক্ষিতগণ বিশেষ পাণ্ডত্য প্রদর্শন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলা ও অযত্নের শিকার হয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা যথার্থ তত্ত্বাবধানের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেসরকারি উদ্যোগের অবাধ স্বাধীনতায় অপরিকল্পিতভাবে বহু উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষার কেন্দ্র না হয়ে শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানে (Coaching Institutions) পরিণত হয়েছে। সরকার অবাধ নীতি (Laissez faire) গ্রহণ করায় এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ছিল অতি সামান্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ারের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কতিপয় মুসলিম সংস্থা এবং অন্যান্য উপদলসমূহ ব্রিটিশদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তারা এর পরিবর্তে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় ভাষাসমূহ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক আন্তরিক প্রচেষ্টার দাবি জানায়। ১৮৯৮ সালে ভাই সময়ের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য লর্ড কার্জন যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি অনতিবিলম্বে



www.pathagar.com

জনগণের অনুভূতি উপলব্ধি করেন এবং দেশে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ পরীক্ষার পর কার্জন দুর্বল দিকগুলি সুদৃঢ় করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলির প্রতি প্রদেশসমূহের উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংরক্ষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

দেশে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের পক্ষে কার্জন ১৯০২ সালে "ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ কমিশন সুপারিশ করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের আকার ছোট করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলি কেবল পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে নয়, শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবেও কাজ করবে। উচ্চ শিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিভুক্ত, কলেজসমূহে মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য চাপ প্রদান করবে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ এর পর বাংলায় এক প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্বভাবতই এই সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কার্জনের শিক্ষা সংস্কার এমন এক সময়ে শুরু হয়, যখন একে অবশ্যম্ভাবীরূপে শিক্ষার আমলাতান্ত্রিকীকরণের সাথে সমার্থক বিবেচনা করা হয়। পাঁচ বছরের আদম্য প্রচেষ্টার পর ও কার্জন জনগণকে উজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হন।

কার্জন এ উত্তরাধিকারিগণ মূল উদ্দেশ্যকে নির্বিঘ্ন রেখে শিক্ষানীতির কিছুটা সংশোধন করেন। কার্জনের সংস্কারের প্রতি বিরুপ জনমত সত্ত্বে ও তাঁর শাসনামলে শিক্ষার উন্নতি উল্লেখযোগ্যভাবে সাধিত হয়।

১৯১০ এবং ১৯১৩ এর মধ্যে সরকারকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষানীতি গ্রহণ করার জন্য সাহসিকতার সাথে জোর প্রচেষ্টা চালান। বোম্বাই আইন পরিষদ পৌর এলাকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য বিটল ভাই জে-প্যাটেল এর প্রস্তাবিত বিল গ্রহণে করে, যা পরিণামে ১৯১৮ সালে বোম্বাই প্রাথমিক শিক্ষা আইনে পরিণত হয় এবং তা পরবর্তী সময়ে প্রণীত আইনের আদর্শ হিসেবে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কাজ করেছিল।

১৯১৯ সালের আইন শিক্ষা হস্তান্তরিত বিষয়ে পরিণত হয় এবং প্রায় সম্পূর্ণভাবে এর দায়িত্ব প্রদেশগুলির উপর অর্পিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশে, শিক্ষানীতি ও প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাদেশিক আইন পরিষদ এবং চূড়ান্তভাবে জনগণের নিকট দায়ী শিক্ষামন্ত্রীর উপর অর্পিত হয়। ইউরোপীয় রীতির শিক্ষা সংরক্ষিত বিষয় হিসাবে রাখা হলেও এটি ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রাদেশিক শিক্ষা মন্ত্রীদের অবস্থান আরো জোরদার করে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, বয়স্ক শিক্ষার প্রবর্তন, পেশাভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং স্ত্রী শিক্ষা ও অপরাপর অসুবিধা ভোগী শ্রেণীর শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ প্রভৃতি প্রাদেশিক সরকারসমূহের উন্নয়ন কর্মসূচীর



www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাদেশিক সরকারসমূহ কর্তৃক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্রণয়ন ছিল ১৯২১ এবং ১৯৪৭ এর মধ্যবর্তী সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক বৈশিষ্ট্য। এই আইনসমূহ স্থানীয় কতৃপক্ষকে তাদের নিজ নিজ প্রক্রিয়ার ভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ক্ষমতা প্রদান করে।

(১৯১৬-১৭ হতে ১৯৪৬-৪৭) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এসময়ে সমগ্র একক ও অধিভুক্ত ধরনের ১৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচির অংশবিশেষ। নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক অঙ্গের গণতান্ত্রয়ন ঘটে। নতুন নতুন অনুষদ, পাঠ্যক্রম ও গবেষণা প্রকল্পগুলি চালু হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে মহাবিদ্যালয় এবং তালিকাভুক্ত ছাত্রদের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ছাত্রদের শারীরিক শিক্ষা এবং চিত্তবিনোদনকারী কর্মকাণ্ডের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। আন্তবিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদ গঠন এবং আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকলাপের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাঙ্গনের জীবনে নতুন গতি সংযোজিত হয়।

### ঘ. ১৯৪৭ পরবর্তী থেকে স্বাধীনতা পূর্বযুগ

ব্রিটিশ শাসন-থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে এবং পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম লাভ করে যথাক্রমে ১৪ ও ১৫ ই. আগস্ট, ১৯৪৭। এই সালটি এক জল বিভাজিকা, যেমন রাজনৈতিকভাবে তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও। এরপর পূর্বপাকিস্তান পরবর্তীতে বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা কার্যক্রম যে পথে অগ্রসর হয়, তা ভারতীয় ধারা থেকে স্বতন্ত্র।

ব্রিটিশ শাসন রেখে গিয়েছিল একটি উত্তরাধিকার। পশ্চিমি ধারায় ১৮৩৫ এর ভারতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে সকলের প্রস্তাবানুযায়ী (Mecaulay's minute, 1835) শিক্ষার মাধ্যম স্থির হয়েছিল ইংরেজি, আর শিক্ষার বিষয়গুলি এসেছিল পশ্চিমের উদারনৈতিক শিক্ষার বিবিধ বিদ্যা থেকে। শিক্ষার গৃহীত হয়েছিল ধর্ম নিরেপেক্ষতা ও ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমাধিকারের নীতি। সনাতন প্রাচ্যবিদ্যা ভিত্তিক শিক্ষার জন্য সরকার কোন দায়-দায়িত্ব বহন করবে না, এদের দায়িত্ব এরাই বহন ও পালন করবে। সরকারের সর্বশেষ দৃষ্টি উচ্চ শিক্ষার উপর, ভাষা হয়েছিল, সুসংগঠিত। উচ্চ শিক্ষার প্রভাব পড়বে নিম্নতর মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরসমূহে।



www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণত ভাবে সেকালে নির্দেশিত ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন কমিটি কমিশন দ্বারা সমর্পিত ব্রিটিশ নীতির প্রতিফলনই দেখা যায়। সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট (১৯৪৪), যা পুরোপুরি সরকারি ব্যবস্থাপনার এক নতুন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিল, ঐ সময়ে পাকিস্তানের অংশে পরিণত বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হলো না। একে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছিল ভারত, পাকিস্তান দেয়নি। ইতোমধ্যে শিক্ষা পরিণত হয়েছে প্রাদেশিক বিষয়ে, করাচি, পরে ইসলামাবাদের কেন্দ্রীয় সরকার দূর থেকে নজরদারি করছে। মাঝে-মধ্যে যে হস্তক্ষেপ করেছে তার মধ্যে সদিচ্ছায় প্রকাশ যেমন ছিল, আবার অজ্ঞতা-প্রসূত ও কুদল প্রদায়ী হস্তক্ষেপ ও কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটেছে।

স্বাধীনতা নামের পর পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক সরকার স্কুল পর্যায়ে একটি নতুন পাঠ্যক্রম প্রস্তুতির লক্ষ্যে প্রবীণ রাজনীতিক ও ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মাওলানা আব্দুরাম খান এর একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে। কমিটির সুপারিশকৃত প্রাথমিক শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে। ধর্মশিক্ষা থাকবে তবে তা হবে মাতৃভাষা বাংলা ভিত্তিক। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ ছিল এক কথায় দুঃখজনক। দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ১৯২০ সালের আইনে যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আসছিল, তা কেড়ে নেওয়া হলো। সরকারকে দেওয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা। এর মধ্যে উপাচার্যের নিয়োগও ছিল এক নতুন ও ব্যাপক ক্ষমতা, যা আর ও দুঃখজনক। বহু-সংখ্যক কলেজ, কিছু সরকারি, অধিকাংশ বেসরকারি, সবই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিল বিশৃংখলা।

১৯৪৭ সালে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিস্থিতি এরকম উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ সরকারি অর্থানুকূলে পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিচের স্তরে, কলেজসমূহ ও প্রাথমিক মাধ্যমিক স্কুলসমূহ নিয়ে একটি বেসরকারি সেক্টর। এর ফলে শিক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সরকারের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সরকার যেভাবে এই চাহিদায় সাড়া দিয়েছে, তা কখনও যদিও বা সঠিক হয়েছে, অন্য সময়ে তা আবার হয়নি। কখন ও লক্ষ্যমাত্রা বেঁচে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে কিন্তু সকল ব্যর্থতার পরও এই প্রদেশে, পরবর্তীকালের বাংলাদেশে রাষ্ট্রে যা ঘটেছে, তা হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ধারাবাহিক অগ্রগতি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পূর্ব খণ্ডে, পূর্ব পাকিস্তানে যে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যাত্রা শুরু, তার আদিপর্ব ছিল দূর অতীতে, উনিশ শতকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত সকল কলেজে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত পাঠক্রম অনুসৃত হয়েছে। ছাত্ররা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত পরীক্ষার বসেছে এবং তার দেওয়া ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানায় যে একটি



www.pathagar.com

মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পড়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল ঢাকা পৌরসভার সীমানার মধ্যে। এর বাইরে সারা দেশের সম্পূর্ণ উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাই যুক্ত ছিল যে বৃহত্তর ব্যবস্থার সঙ্গে তার শীর্ষ অবস্থানে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দেশ বিভাগের কারণে এই অধিভুক্তির দায়িত্ব পালনকারির, ব্যাপক ভূমিকা বর্তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। ঢাকা সমস্যা ছিল অনেক। জন্ম থেকেই ঢাকা একটি এককেন্দ্রিক ও শিক্ষাপ্রদায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচয় দিয়ে চলেছে। এর দূরবর্তী মডেল ছিল অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ। এর আবাসিক হলগুলি ছিল অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের কলেজের অনুকৃতি। এর ৩ বছর ব্যাপী অনার্স কোর্স ও ঐ দুটি মডেল থেকে ধার করা। এর টিউটোরিয়াল ব্যবস্থাও ছিল ওদের প্রচলিত টিউটোরিয়ালের ছকে তৈরি। সংক্ষেপে, শিক্ষাগত ও কাঠামোগত, উভয়তেই, অর্ধশতাধিক বছর পূর্বেকার লন্ডনের মডেলের গঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকার পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। এখন ঢাকার সমস্যা হলো দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা। বাস্তব বিবেচনায় কলেজগুলিকে তাদের পূর্ব প্রচলিত কোর্স নিয়ে চলতে দেওয়া ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আর কোন বিকল্প পন্থা ছিল না। কলেজে বজায় রইল ২ বছর মেয়াদী পাস ও অনার্স কোর্স। বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল রইল ৩ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৫৪ সালে, রাজশাহী শহরে; তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রামে, শহর থেকে কিছুটা দূরে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয় থাকা দৃষ্টান্তে ৩ বছরের অনার্স ও ১ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স গ্রহণ করে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ই কলকাতার ২ বছররের অনার্সকে ৩ বছররে উন্নীত করে অন্তত অনার্স ধারাকে এক জায়গায় মিলাতে সচেষ্ট হয় যার ফলে দারুণ চাপ পড়ে সেই কলেজগুলির উপর, যারা দীর্ঘকাল কলকাতার অধীনে ও পরবর্তীতে কিছুকাল ঢাকার অধীনে ২ বছরের অনার্স কোর্স চালু রেখেছিল। এই চাপের কারণে কোন কলেজ অনার্স কোর্স বন্ধ করে দেয়, যাত্রা চালু রাখে তারা বেসামাল হয়ে পড়ে, তবে হাল ছাড়ে না।

পাকিস্তান পর্বের (১৯৪৭-৭০) শেষের দিকে প্রদেশে আর ও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে, ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১) ঢাকায় প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) (১৯৬২) এটি সম্পূর্ণ নতুন নয়; পূর্বতন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নতুন রুপ; ঢাকার অধুরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭০)।

**আইয়ুব শাসনের দশকে দুটি কমিশন ঃ** কমিশন অব ন্যাশনাল এডুকেশন (১৯৫৯) ও কমিশন অনস্টুডেন্ট প্রবলেমস এ্যাণ্ড ওয়েল ফেয়ার (১৯৬৪-৬৬), বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছিল। প্রথমটি ছিল সামরিক শাসন-সুলভ সংস্কার চিন্তাভাবনা উৎসাহের ফলশ্রুতি। শরীফ কমিশন (CNE-এর



www.pathagar.com

সর্বাধিক প্রচলিত নাম) রিপোর্টে শিক্ষার জন্য বরাদ্ধ ছিল ৩৬ পৃষ্ঠা। আর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মাত্র ৬ পৃষ্ঠা।

পূর্ব পাকিস্তানে বহুলভাবে নিন্দিত হলেও CNE উচ্চ শিক্ষার এই বিষয়গুলির উপর কিছু প্রতিদানযোগ্য কথা বলেছে ও শিক্ষার একটি বিশিষ্ট পর্যায় পরিচয়ে উচ্চশিক্ষা, যা ইন্টার মিডিয়েটের ঝামেলামুক্ত; ডিগ্রীপাস ও অনার্সের মেয়াদ ৩ বছরের বর্ধিতকরণ; ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও সে উদ্দেশ্যে প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব মডান ল্যাংগুয়েজস গঠন; পরীক্ষা ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ; গবেষণা; শিক্ষকের কাজ ও শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ ও পদোন্নয়ন; ছাত্র কল্যাণ ও শৃংখলা, বিশ্ববিদ্যালয় উপযোগী প্রশাসনিক কাঠামো। এরই পরিণতি হিসাবে আসে ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্সসমূহ (১৯৬১) ও ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্বাভাস।

CNE রিপোর্টটি সুলিখিত। এর একটা অতি ঢালাও মন্তব্যের প্রবণতা, মন্তব্যের সমর্থনে তথ্য উপাত্ত পরিবেশনে ব্যর্থতা। এটি প্রকাশের পর এর বেশ কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল; (i) ডিগ্রী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট অংশ বিচ্ছিন্ন করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে প্রক্রিয়াটি শুরু হয় সরকারি কলেজ দিয়ে; (ii) ৩ বছর মেয়াদী পাস কোর্স প্রবর্তিত হয়, যার মধ্যে ভাষা শিক্ষা গুরুত্বপায়; (iii) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় আইন রহিত করে সে স্থানে নতুন অর্ডিন্যান্স প্রবর্তিত হয় (১৯৬১)।

সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-তে, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে এক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষটি মাত্র ১৭দিন স্থায়ী হলেও এর ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল কেঁপে উঠে। তাসখন্দ চুক্তি সাক্ষর ও যুদ্ধ বিরতির পর সারা দেশে এক রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুই খণ্ডেই ব্যাপক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পতন ত্বরান্বিত হয়। ফলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব হয়। জেনারেল ইয়াহিয়ারও কিছুদিনের জন্য ফিরে আসে রাজনৈতিক অস্থিরতায়। একজনের এক ভোট, এই ভিত্তিতে দেশ যখন অপেক্ষা করছে সাধারণ নির্বাচনের, তখনই এয়ার ভাইস-মার্শাল নূরখানকে দেয়া হলো- একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব।

নয়া শিক্ষানীতি (The New Educational Palicy, 1969) ছিল সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট, ইতিবাচক চিন্তায় সমৃদ্ধ এরই মধ্যে ছিল একটি সংস্কারমূলক বিশ্ববিদ্যালয় আইনের রুপরেখা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষকদের পূর্ণ অংশগ্রহণ সিনেটের পুনর্বাসন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন যে NEP কেবল আভাসে চেয়েছিল ও CSPW/ হামিদুর রহমান কমিশন পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল)-এর সকলই ঠাঁই পেল NEP-র সুপারিশ মালায়। রিপোর্টটি মূল্যবান এ জন্য যে, এর সূর ইতিবাচক এবং এর মধ্যেই ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পূর্বাভাস রয়েছে। এই রিপোর্টটির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বেই পাকিস্তানের দুই অংশ যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ল।



www.pathagar.com

## ঙ. স্বাধীনতাত্তোর থেকে বর্তমান পর্যন্ত

পাকিস্তানের সাথে বাঙালির যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার যেসব কারণ নিহিত ছিল, তার মধ্যে প্রধান কারণ ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ। ফলে যখন ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে দেখা দিল, তখন যাত্রা আরম্ভে পেল এর বিধস্ত অর্থনীতি ও এক বিপর্যস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা।

স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষার প্রশ্নে সূচনা পর্ব ছিল উৎসাহজনক। ওই সময়ে বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত জাতীয়করণ আদেশের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের জন্য সরকার অপেক্ষা করেননি। বিশ্ববিদ্যালয় মহলের একাডেমিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিল সরকার। ১৯৬১-র ঘৃর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স এর জায়গায় এলো এক গুচ্ছ নতুন আইন, যেগুলি ছিল ঢাকা, রাজশাহী চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত। একই সময়ে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার, ১৯৭৩-এর মাধ্যমে ঘোষিত হলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের জন্ম কথা। এ সময়ে আরও গঠিত হয় ড. কুদরাত ই-খুদার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন। কমিশনের রিপোর্ট (মে, ১৯৭৪) এর দেশের শিক্ষা ভাবনার ইতিহাসে একটি মাইল ফলক। এর মধ্যে আছে সকল মাত্রায় পুনর্ঘটন পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষায় বিষয়ে একটি স্বল্প মেয়াদী ও একটি দীর্ঘ মেয়াদী দৃশ্যপট। এর সকল প্রত্যাশা ও সকল ভবিষ্যৎ ভাবনা সত্যে পরিণত হয়নি।

এই রিপোর্ট এর পুঙ্খনুপুঙ্খতা সত্ত্বেও, উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্নে বিস্ময়করভাবে নীরব। অ্যাক্টের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো অনেকটা সাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অনুসরণে এবং মঞ্জুরী কমিশনের যাত্রা আরম্ভ হলো, এই স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা বিধান-করবে, এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

এরপর বেশ কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়নি। ১৯৮৫ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা, রাজশাহী, ও চট্টগ্রাম-এর সঙ্গে অধিভুক্ত কলেজগুলিও সংখ্যায় ও আকার আয়তনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উভয় ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির ছিল দুটি দিক ইতিবাচক ও নেতিবাচক। ইতিবাচক, কারণ এর মধ্যেই প্রকাশ পায় উচ্চশিক্ষা বিষয়ে জাতির আকাঙ্ক্ষা, নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে যা বেগ সঞ্চার করেছিল। এর ফলে আবার বহু সদ্যজাত কলেজকে স্বীকৃতিদানের চাপ সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর; এগুলি ছিল শিক্ষক ও সরঞ্জাম, উভয় দিক দিয়েই দুর্বল, সেহেতু অ্যাকাডেমিক চাহিদা পূরণে অযোগ্য। এটা নেতিবাচক দিক।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকের শুরুতেই সমস্যাটি সনাক্ত করেছিল শিক্ষা কমিশন। কমিশন শিক্ষাপ্রদায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কলেজ অধিভুক্তির দায়মুক্ত করার কথা ভেবেছিল। কমিশনের প্রস্তাব ছিল ৪টি কেবলমাত্র অধিভুক্তির



www.pathagar.com

দায়িত্বপালনকারী (অ্যাফিলিয়েটিং) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, যারা কলেজসমূহের ব্যাপারে, দায়বদ্ধ থাকবে। এ প্রস্তাব কার্যকর হতে ১৯৯২তে এসে যায়, ওই বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পর্যন্ত। সত্তর ও আশি দশকে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটে প্রাথমিকও মাধ্যমিকের তুলনায় অনেক বেশি। এটা হলো প্রকৃত ও সংখ্যা তাত্ত্বিক হিসাব। কিন্তু পরিসংখ্যানই এ ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়।

স্বাধীনতার পর সরকারি পর্যায়ে আরও ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া (১৯৮৫); শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (১৯৯০); খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯০); বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (১৯৯২) ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়; গাজীপুর (১৯৯৩)।

১৯৮০ দশকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়। বিবাদমান দলগুলির মধ্যে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ ও সংঘাত, ঘন ঘন অনির্ধারিত বন্ধ ও তজ্জনিত সেশনজট, এ পরিস্থিতির অবসান হবে, তেমন ভরসা মিলছিল না। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা, যারা পেরেছে ছেলে মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে অধিক সংখ্যাক এর গিয়েছে ভারত ও আমেরিকায়।

অবস্থা যখন এরকম, তখন দেশের মধ্যেই এর বিকল্প ব্যবস্থার কথা অনেকেই ভাবতে থাকেন। উদ্দেশ্য, এমন এক উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা যা হবে প্রচলিত উপনিবেশিক সময়ে প্রবর্তিত ব্রিটিশ মডেলের। যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার প্রচলিত পদ্ধতির অনুরূপ। মডেলের পরিবর্তনেই এর শেষ মূল ধারায় উচ্চ শিক্ষা, যা ছিল গণমুখী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নততর ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতি ছিল। এগুলি উচ্চ হারে বেতন দাবী করেছে, তবে ক্ষতিপূরণ করেছে নির্দিষ্ট সময় ফল দিয়ে। এর শিক্ষাক্রম ভিত্তি ছিল সংকীর্ণ। বর্তমানে দেশে ১৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোর্সগুলি চালু রয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেই এর এক পেশে চরিত্র ধরা পড়বে; কিন্তু বাণিজ্যিক কোর্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইংরেজি, পরিবেশ বিদ্যা ইত্যাদি। সংক্ষেপে, এ যাবৎ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য বাজারের কিছু উচ্চ বেতনের দাবিদার তরুণ কর্মকর্তা তৈরির জন্য শিক্ষা। যে সংকীর্ণ কর্মসূচী নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলছে, তার মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী হলে এদেশের জন্য তা ক্ষতিকর হবে।

ইতোমধ্যে প্রায় এক দশকের কার্যক্রমের পর বলা যায় যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রভাব পড়েছে মূল ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। এর একটি দৃষ্টান্ত কোর্সের দিকে ঝুঁকেছে। এ মুহূর্তে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গোষ্ঠীর অবস্থান হলো, একটি প্রধান ব্যবস্থার প্রান্তবর্তী একটি অপ্রধান ব্যবস্থা। ইচ্ছার হোক বা অবস্থার গতিতেই হোক, এগুলি এখন ও নিজেদের মধ্যেই নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে। মঞ্জুরী কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ এদেরকে সদস্যভুক্ত করেনি। কৌতূহলের বিষয় এই যে, U.G.C-এর অনুমোদন ক্রমেই এগুলি প্রতিষ্ঠিত



www.pathagar.com

হয়েছে, ও U.G.C-এর আরোপিত কয়েকটি মৌলিক নিয়ম মেনে চলা এদের জন্য বাধ্যতামূলক। ১৯৯২-এর ব্যতিক্রমী পরীক্ষামূলক কাজের প্রশ্নে অত্যন্ত সতর্ক। কিন্তু নতুনের প্রবর্তনীয় ও পরীক্ষামূলক কার্যক্রম ব্যতিরেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর নামে অপলাপ মাত্র।

## উপসংহার

একটা শিক্ষাব্যবস্থা পর্যায় ক্রমিকভাবে গড়ে উঠেছে, যার সূত্রপাত হয়েছিল পরাধীনতার কালে। শতাব্দীকাল এর অবয়বে ছিল বৈদেশিকতার ছাপ। ধীরে ধীরে স্বজাতীয় ও প্রাচ্যদেশীয় উপাদানসমূহ স্থান পেয়েছে এর শিক্ষাক্রমে। ইংরেজি আধিপত্যের জায়গায় জনগণের ভাষা বাংলার ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ইংরেজির আবশ্যকতা ও স্বীকৃত হয়ে আছে। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো জাতীয় শিক্ষার সঠিক দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রের সম্মতি। সরকারি সেক্টরের পাশাপাশি একটি বেসরকারি সেক্টর এখন ও আছে, বিশেষত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে। কিন্তু এ স্তরে ও সরকারের অংশিদারিত্ব বেড়ে চলেছে এবং ক্রমেই অধিকতার অর্থবহ হয়েছে। উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এটা এবং আর ও কিছু নতুনত্ব থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ব্যবস্থাটি কোন ক্রমেই সুস্থ নয়। এক অন্তঃশীল গতিশীলতা কাজ করে চলেছে, যার প্রকাশ ঘটেছে শুধু ভাবের ও চিন্তার স্তরে নয়, সংস্কার ও পরীক্ষামূলক কাজের স্তরে ও। এ মূহুর্তে এ এক সাধারণ প্রত্যয় যে, একটি স্বাধীন জাতির স্বার্থকতা অর্জনের একমাত্র পথ শিক্ষা।



www.pathagar.com

# উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

**সুলতানী আমল থেকে মুঘল আমল**

প্রাচীন কাল থেকে উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকা সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। বিশাল এই উপমহাদেশের উর্বর পলিমাটি, বসবাসের জন্য মনোরম পরিবেশ, জলবায়ু ইত্যাদি বিদেশীদের আকৃষ্ট করেছে বারবার। একসময় তারা মরিয়া হয়ে উঠে সম্পদরাজী এই উপমহাদেশে প্রবেশের জন্য। একসময় তারা সুযোগ পেল উপমহাদেশের মাটিতে পা ফেলার। তখনি তারা ছলে বলে কৌশরে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে জেঁকে বসেছে উপমহাদেশের মাটিতে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের সময় (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিঃ) কতিপয় মুসলমান উপমহাদেশে প্রবেশের সুযোগ পায় একটি অভিযানের মাধ্যমে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত করার পর মুসলমানগণ উপমহাদেশের একাংশে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নেয়। এরপর মুসলমান সুলতানগণ প্রায় পাঁচশত চল্লিশ বৎসর উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রাধান্য বজায় রেখে শাসন কার্য চালিয়ে গেছেন।

সুলতানী আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ধর্মভিত্তিক। তখন বিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হয়েছিল মসজিদ বা মন্দির সংলগ্ন। তখন দেশীয় শিক্ষা পরিচালিত হতো পাঠশালায় কিংবা টোলে। পক্ষান্তরে মাদ্রাসা তথা ইসলাম শিক্ষা পরিচালিত হতো মক্তবে ও মাদ্রাসায়। রাজকীয় কিংবা অভিজাত ব্যক্তিবর্গ তখন শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করতো। তাঁরা প্রয়োজনীয় জমি ও মুক্ত হস্তে দান করত। সুলতানী আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রফেসর এ কে এম মোজাম্মেল হক 'শিক্ষার ভিত্তি' গ্রন্থে লিখেছেন :

"সুলতানগণ নিজেদের সভায় পণ্ডিত, কবি প্রভৃতিদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে বৃত্তি ও জায়গীর দান করেছিলেন। সুলতানী আমলে কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁদের অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। মিনহাজউদ্দীন সিরাজ "তাবাকাত-ই-নাসিরী," জিয়াউদ্দীন বারাণী "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী," সামস-ই-



www.pathagar.com

সিরাজ আকিফ "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী" রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তাঁদের এসব ঐতিহাসিক গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। এ আমলের ইতিহাস রচনা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে। এ ছাড়াও সুলতানগণ অনুবাদ সাহিত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সুলতান সিকান্দার লোদীর পৃষ্ঠপোষকতায় ভেষজ শাস্ত্রের একটি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়েছিল। আলবেরুনীর মত মুসলিম মনীষী সংস্কৃতিতে শিক্ষা লাভ করে অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হলে জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়।"

সুলতানী আমলে যে সকল সুলতানগণ শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অবদান পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে তুলে ধরছি :

**সুলতান মাহমুদ (১০০০-১০২৬)**

আফগানিস্তানের গজনীর সুলতান মাহমুদের কয়েকবার আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের হিন্দু রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁর রাজধানী গজনী ছিল। ইসলামি সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র। অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবিরের মতে, "ইতিহাসে মাহমুদের স্থায়ী আসন তাঁর শিল্পকলা এবং জ্ঞান চর্চার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চিহ্নিত হয়েছে।" ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য তিনি আহরণ করেন সত্য কিন্তু তা বহুলাংশে নিয়োজিত হয় গজনীকে পৃথিবীর অতুলনীয় ও সমৃদ্ধশালী স্বপ্নপুরীতে পরিণত করবার প্রচেষ্টায়। তাঁর দরবার ছিল তৎকালীন জ্ঞানী ও গুণীদের প্রধান মিলন কেন্দ্র।

সুলতান মাহমুদ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ দরবারে সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও স্থাপত্যের সমাবেশ ঘটে। সুলতান মাহমুদের দরবারে কমপক্ষে চারশত কবি কাব্য সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। স্তুতিগাঁথা ব্যতীত স্বকীয়তার চাপ মণ্ডিত অসংখ্য কাসিদাও রচিত হয়। রাজকার্যে ও যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকলেও সুলতান কাসিদা শুনতে পছন্দ করতেন। রায়ের একজন প্রখ্যাত কবিকে একটি কাসিদার জন্য তিনি চৌদ্দ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। অপরাপর কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফারুখি; মনুশিহর আস্‌জাদী।

কিন্তু সুলতান মাহমুদের দরবারে ফেরদৌসী ছিলেন অন্যান্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর অনবদ্য কাব্য রচনা দরবারে বিস্ময় সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য কবিদের রচনাবলীর কদর কমে যায়। মহাকবি ফেদৌসীর কালজয়ী সৃষ্টি 'শাহনামা' (রাজা বাদশাদের ইতিহাস) তাঁকে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করে এবং তিনি রাজ দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করেন। কথিত আছে যে, সুলতান মাহমুদ কবিকে এই অমর কাব্য রচনার প্রাক্কালে ষাট হাজার স্বর্ণ



www.pathagar.com

মুদ্রার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু "শাহনামা" রচিত হওয়ার পর আয়ায নামক একজন প্রিয়পাত্রের প্ররোচনায় সময়মত তাঁর প্রাপ্য অর্থ দেননি এবং কবিকে ষাট হাজার স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করা হয়। বেদনা ভারাক্রান্ত মনে এহেন আচরণের জন্য সুলতানের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি একটি বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনা করেন। সুলতান কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যখন ষাট হাজার স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করলেন, তখন তাঁর মৃতদেহ দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

সুলতান মাহমুদের দরবারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন আবু রায়হান আল বেরুণী। ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ খাওয়ারিজম দখর করে আল বেরুণীকে গজনীতে নিয়ে আসেন। অংকশাস্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা, দর্শন ও ইতিহাসে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। জ্যোতিবিদ্যার ওপর লিখিত 'তাহফিম' এবং সুলতান মাহমুদের পুত্র মাসুদকে উৎস্বর্গকৃত পুস্তক 'কানুন আল মাসুদী' তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। তাঁর অসামান্য খ্যাতির মূলে ছিল ভারত বর্ষের রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, দর্শন, সাহিত্য, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি। ভারতে অবস্থান করে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এবং তৎকালীন হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির ওপর 'কিতাব আল হিন্দু' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি তদানীন্তন হিন্দু সমাজের সতীদাহ প্রথা, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিবাহ, পৌত্তলিকতা, রাজনৈতিক কোন্দল ও বিশৃঙ্খলা অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। উপনিবেষদের দর্শনও তাঁকে আকৃষ্ট করে। তাঁকে নিঃসন্দেহে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে বিবেচনা করা যায়।

সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি গজনীতে এসে জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক বায়হাকী ও উত্বী দার্শনিক ফারাবী। উত্বী ও বায়হাকীর রচনাবলীতে সুলতান মাহমুদের রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর নির্ভুল এবং চাক্ষুস বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক লেনপুল বায়হাকীকে "The orental Mr. Pepys" অভিহিত করেন।

সুলতান মাহমুদ যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতদের সমবেত করে গজনীকে একটি সুসমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন। গজনী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসরণে পরবর্তীকালে সেলজুক আমলে বাগদাদে সুপ্রসিদ্ধ নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গজনীর জাদুঘরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষিত ছিল। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিচারে গজনীর সুলতান মাহমুদ একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ন্যায় পরায়ণ, সুবিচারক, প্রীতিভাজন, বিদ্যোৎসাহী ও ক্ষণজন্মা সৈনিক ছিলেন। হাবীব যথার্থ বলেন, "উত্তর সূরীদের নিকট তিনি সত্যিই ছিলেন কিংবদন্তীর রাজকুমার।"



www.pathagar.com

## শাহাবুদদীন মুহম্মদ গোরী (১১৭৪-১২০৬ খ্রিঃ)

শাহাবুদদীন মুহম্মদ গোরী ছিলেন ভারতে মুসলিম শক্তি ও সাম্রাজ্যের স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রদূত স্বরূপ। সুলতান শাহাবুদ্‌দীন মুহম্মদ গোরী বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন দক্ষ সেনাপতি, রাজনৈতিক সংগঠক, স্বাধীনচেতা এক দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক এবং বিদ্যোৎসাহী, শিল্পী ও সাহিত্য অনুরাগী ব্যক্তিত্ব। তিনি জ্ঞানী গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

ফখরুদ্দীন রাজীর মতো দার্শনিক ও পণ্ডিত এবং নিজামী উরজীর মতো ক্ল্যাসিকাল কবি তাঁর দরবারে শোভা বর্ধন করতেন। ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ নামে একজন বিখ্যাত কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

তিনি শিল্প ও সাহিত্যের প্রশংসা করতেন। তিনি ইসলামি শিক্ষা, আইন ও ধর্ম-শাস্ত্র আলোচনার জন্য আজমীরসহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মাদ্রাসা স্থাপন করেন। একমাত্র ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি দিল্লীতে ১১৯২-৯৩ সনে বিখ্যাত 'কুয়াতুল-ইসলাম' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। বহু তুর্কী কৃতদাসকে তিনি লেখাপড়া, যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্য পরিচালনার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত ক্রীতদাসগণই পরবর্তীকালে দিল্লীর যোগ্য সুলতানরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে সুলতান কুতবুদ্‌দীন আইবক, ইলতুৎমিশ ও গিয়াসুদ্‌দীন বলবনের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক এস, এম, জাফরের মতে, "ভারতীয় রাজা বাদশাহের মধ্য মুহম্মদ গোরীই সর্বপ্রথম শিক্ষা বিস্তারকে নিজ দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তাই ভারতে ইসলামিক শিক্ষার বুনিয়াদ স্থাপনে মুহম্মদ গোরীর স্থান অনস্বীকার্য।"

তিনি ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য আজমীরে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি আজমীরের আড়াই দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদ, দিল্লীর কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ তৈরি করে মুসলিম স্থাপত্য ও ঐতিহ্যের নিদর্শন রেখে গেছেন। মসজিদ ভিত্তিক মক্তব ও মাদ্রাসার মাধ্যমে তাঁর সময়ে শিক্ষাদান প্রচলিত ছিল।

## সুলতান কুতবুদ্‌দীন আইবক (১২০৬-১২১০ খ্রিঃ)

বিদ্যা, বুদ্ধি, সমরকুশলতা ও দূরদর্শিতার দিক দিয়া বিচার করলে কুতবুদ্‌দীন ছিলেন উত্তর ভারতে বিজয়ী মুহাম্মদ গোরীর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য অনুচর। তিনি স্বীর প্রতিভা আর কর্মদক্ষতার ফলে অল্পদিনের মধ্যে মুহম্মদ গোরীর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সেনাপতির পদ অলংকৃত করেন। ভারতের মুসলিম ইতিহাসে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন কোন সন্দেহ নেই যে মুহম্মদ গোরীর ভারত অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়া প্রভুর বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

সুলতান মুহম্মদ গোরী মৃত্যুর পর ১২০৬ খ্রিঃ তাঁর ক্রীতদাস সেনাপতি ও জামাতা কুতবুদ্‌দীন আইবক দিল্লীর প্রথম আইনানুগ স্বাধীন সুলতানরূপে সিংহাসনে বসেন ও তথাকথিত দাসবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।



www.pathagar.com

কুতবুদ্‌দীন ছিলেন জ্ঞানী গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তি। আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি বিদ্যানুরাগী ও সাহিত্য রসিক সুলতান ছিলেন।

কুতবুদ্‌দীন ছিলেন ইতিহাসের দ্বিতীয় হাতেম। তাঁর দানশীলতার জন্য তাঁকে লাখো বক্‌স বা লক্ষ টাকা দানকারী বলা হতো। ঐতিহাসিক হাসান নিজামী ও পণ্ডিত মোদাব্বির তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

কুতবুদ্‌দীন অত্যন্ত ধর্মানুরাগী ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাই মসজিদেই ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইসলামের সেবা ও প্রচারের জন্য তিনি দিল্লীতে "কুয়াতুল-ইসলাম' নামে একটি মনোরম মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত আজমীরের মসজিদকে আড়াই দিন-কা-ঝোঁপড়া বলা হতো। মসজিদ সংলগ্ন মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকা ছিল সে যুগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

মক্তব ছিল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সূরা, কেরাত, অক্ষরজ্ঞান ও কিছু লিখন-পঠন শিক্ষা দেয়া হতো। আর মাদ্রাসা ছিল উচ্চ শিক্ষা স্তরের প্রতিষ্ঠান যেখানে কোরআন, হাদিস, ফেকাহ্‌, উসুল, সাহিত্য ও দর্শন শেখানো হতো। রাজ প্রসাদেরও ব্যক্তিগত বিদ্যালয় ছিল। তিনি ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে নতুন যুগের সূচনা করেন। দিল্লীর 'কুতুবমিনার' তাঁরই অক্ষয় কীর্তি। বিখ্যাত সূফী কুতবুদ্‌দীন বখ্‌ইতয়ার কাকির মাজারে তাঁর নাম অনুসারে এই মিনার স্থাপিত হয়। আজান দেয়ার জন্য উচ্চ স্তম্ভকে মিনার বলা হয়। তাঁর নির্মিত 'আড়াই দিন-কা ঝোঁপড়া' মসজিদটি সত্যিই মনোমুগ্ধ-স্থাপত্যের নিদর্শন। মিনারের নির্মাণ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। ১২১০ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁরই প্রচেষ্টা ও সাধনায় মুহম্মদ গোরীর স্বপ্ন সাধ বাস্তবে রূপায়িত হয়। শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজকীয় অর্থানুকূল্য ও ভূমিদানের ব্যবস্থাও তাঁর সময়ে শুরু হয়। ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেন, 'আইবক ছিলেন মহানুভব সুলতান। ভারতের ভূমিতে ইসলামি শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।'

## সুলতান ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রিঃ)

সুলতান কুতবুদ্‌দীনের ক্রীতদাস ও জামাতা শ্যালতামাশ, ইতিহাসে যিনি ইলতুৎমিশ নামেই পরিচিত, ১২১১ খ্রিঃ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজের মতে, 'তাঁর মত ধর্মপ্রাণ, বিদ্বান, দানশীল এবং দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নৃপতি খুব কমই ছিল।'

তিনি বিদ্যোৎসাহী, শিল্পানুরাগী ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। তিনি শিক্ষা প্রসারে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের ইসলামি শিক্ষা দেয়ার জন্য বহু মক্তব, মাদ্রাসা, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ফলে, রাজধানী দিল্লী ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মস্তবড় কেন্দ্রে পরিণত হয়।



www.pathagar.com

তাঁর দরবারে প্রসিদ্ধ আমীর খসরু ও ফখ্রুলমূলক ওসমানীর আগমন ঘটে। এছাড়াও বিখ্যাত দার্শনিক আমীর কুহানীও তাঁর আনুকূল্য লাভ করেন। ফলে তাঁর সময়ে শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটতে থাকে।

স্থাপত্য শিল্পেও তাঁর অবদান কম নহে। তিনি সুলতান কুতবুদ্‌দীন আইবক কর্তৃক নির্মিত 'কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ' ও আজমীরের 'আড়াই-দিন-কা-ঝোঁপড়া' মসজিদের সংস্কারসাধন ও সম্প্রসারণ করেন। তিনি দরবেশ বখ্‌ইতয়ার কাকীর মাজারে কুতবুদ্‌দীন কর্তৃক নির্মিত মিনারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন এবং তাঁর মাজারের পাশে একটি ফোয়ারা নির্মাণ করেন। ইহা ইতিহাসে 'শামসী ফোয়ারা' নামে খ্যাত।

তিনি মৃত্যুর পূর্বেই নিজের সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন। আগ্রার জমকাল মসজিদটি তাঁর অপূর্ব শিল্পী মনের পরিচয় বহন করে। ভারতীয় মুদ্রার সংস্কার ও আরবীয় মুদ্রা প্রচলন তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

## সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রিঃ)

ভারতের মুসলিম রাজেত্বের ইতিহাসে রাজিয়াই ছিলেন একমাত্র নারী যিনি দিল্লীর সিংহাসন আরোহন করিয়াছিলেন। রাজিয়া তাঁহার অল্পকাল রাজত্বের মধ্যে শাসন কার্যে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাহা ইতিহাসে বিরল। তিনি ন্যায়, সততা, সুবিচার ও সুদক্ষ শাসনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ইলতুৎমিশের পুত্র কন্যাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষায় রাজিয়ার সমকক্ষ কেউ ছিল না। তাই ১২৩৬ খ্রিঃ সুলতান ইলতুৎমিশ তাঁর অযোগ্য পুত্রদের উত্তরাধিকারী মনোনীত না করে তাঁর সুযোগ্য কন্যাকে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী করে যান। রাজিয়াও তাঁর পিতার মত শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁর আমলে দিল্লীর সমৃদ্ধশালী মুইজী মাদ্রাসা যথেষ্ট খ্যাতি সম্পন্ন ছিল। এই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত উন্নত মানের শিক্ষা দীক্ষা ও গবেষণা কার্য পরিচালিত হত। সুলতানা রাজিয়ার সাড়ে তিন বৎসরের রাজত্বকালের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কবি, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মক্তব, মাদ্রাসায় প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দিয়ে গেছেন।

## সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রিঃ)

নাসিরউদ্দীন মাহমুদ ধর্মভীরু, অমায়িক ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহার নম্রতা ও অমায়িকতার সুযোগে অভিজাত সম্প্রদায়ই তৎকালীন ভারতের প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি ছিলেন নামে মাত্র সুলতান। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সুদক্ষ মন্ত্রী গিয়াসউদ্দীন বলবন ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। বলবন সুদক্ষ সেনাপতি ও অভিজ্ঞ



www.pathagar.com

রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে সুলতান নাসিরউদ্দীনের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। নাসিরউদ্দীন বলবনকে 'উলুঘ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন।

নাসিরউদ্দীনের দয়া-দাক্ষিণ্য, উদারতা ও ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে সমসাময়িক ইতিহাসবিদ্‌গণের রচনায় যথেষ্ট প্রশংসাবাদ রহিয়াছে। তিনি সুলতান হইয়াও দরবেশের ন্যায় জীবনাযাপন করিতেন এবং অবসর সময়ে কোরআন শরীফ নকল করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। মিন্‌হাজ সুলতানের অধীনে এক উচ্চ রাজ-কর্মচারীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিন্‌হাজ তাঁহার রচিত তবকাত-ই-নাসিরী নাকম ঐতিহাসিক গ্রন্থটি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সুলতান নাসিরউদ্দীনের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ব্যক্তিগত উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মভীরুতা তাঁহার যথেস্ট পরিমাণে থাকিলেও দেশের শাসনকার্যে নাসিরউদ্দীন খুব সক্ষম ছিলেন না। তাই মন্ত্রী বলবনের উপর তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইত। বলবন অবশ্য শাসনকার্যের দায়িত্ব পালনে চরম দক্ষতা, পটুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বলবন আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি স্থাপন, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি দেশের সকল জায়গায় কেন্দ্রীয় শাসনের প্রাধান্য বিস্তার এবং বলবৎ রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি দোয়াব অঞ্চলে দেশদ্রোহী রাজা, জমিদার ও হিন্দু সর্দারগণকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিলেন এবং মেওয়াটিদের ক্ষমতা খর্ব করিলেন।

সুলতান ইলতুৎমিশের কণিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ মুসলিম ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। সুলতানা রাজিয়ার পরে রাজনৈতিক অস্থিরতার এক পর্যায়ে ১২৪৬ খ্রিঃ নাসিরুদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন ও দরবেশের মত জীবন যাপন করতেন। তাঁর সাদাসিধা জীবন যাপনের কারণে তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয়, আদর্শ ও অনুকরণীয়। তিনি নিজে একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন, তিতি শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল এবং তিনি সরাসরি বিদ্বান ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করতেন। তাঁর রাজ দরবার কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও প্রতিভাবানদের মিলনকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। যেসব ব্যক্তি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ। তাঁর লিখিত পুস্তকের নাম 'তবকাত-ই-নাসিরি'। লেখক বইটিকে সুলতান নাসিরুদ্দীনের নামে উৎসর্গ করেন।

### গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৬ খ্রিঃ)

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে দিল্লী খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করে। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন তাঁর পূর্বসূরীদের মত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর সময়ে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে মধ্য এশিয়ার শিক্ষা ও



www.pathagar.com

সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই সব শিল্পী সাহিত্যিক প্রাণ ভয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে আসে। সুলতান তাঁদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে তাঁর রাজদরবার সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র পরিণত হয়। যে সব সম্মানিত ব্যক্তি তাঁর দরবারের গৌরব বৃদ্ধি করে ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমির খসরু, শেখ ওসমান তিরমিজি, শেখ বদরুদ্দিন আরিফ, আমীর হাসান, সৈয়দ মাওলা, বাহাউদ্দিন ও কুতবুদ্দীন বখতিয়ার প্রমুখ।

উদারপন্থী সুলতান বলবন তাঁর অনুগতদের পরামর্শ দিতে গিয়ে বলতেন, "প্রতিভাবান, শিক্ষিত ও সাহসী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে দয়া ও বদান্যতার সাহায্যে তাঁদের পোষণ করুন। তাঁরা যাতে আপনাদের রাজসভা ও রাজমন্ত্রের সত্যাসত্য প্রতিপাদন করতে পারেন সে সুযোগ সৃষ্টি করুন।"

সুলতান বলবনের মত তাঁর সুযোগ্য পুত্রগণও বিদ্যানুরাগী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন। তাঁর পুত্র মুহম্মদ শিক্ষিত পণ্ডিতদের নিয়ে দর্শন বিষয়ক আলোচনা করতে পারতেন। আর এভাবে তাঁর নেতৃত্বে একটি সাহিত্য সমাজ গুড়ে ওঠে। এটি অল্পকালের ভেতর শিক্ষার জন্য একটি মূল্যবান মাধ্যমে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বারনী মন্তব্য করেন, "তরুণ যুবরাজের দরবার প্রায়ই সে যুগের শিক্ষিত, মার্জিত ও মেধাবী ব্যক্তিতে ভরে থাকতো। তাঁর প্রাসাদ কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিকদের সভায় পরিণত হয়েছিল। আমীর খসরু এসব সভায় সভাপতির পদ অলংকৃত করতেন। এখানে বিখ্যাত কবিদের কাব্য প্রতিভা ও মেধা নিয়ে আলোচনা চলতো। নিয়মিতভাবে 'শাহনামা' 'দিওয়ানে সেনাই' ও 'দিওয়ানে খাকানি' থেকে আবৃত্তি করা হত।"

বলবনের দ্বিতীয় পুত্র বুগরাখান নাট্যামোদী ছিলেন। তাঁর সমিতির সভ্যদের মধ্যে বহু সঙ্গীতজ্ঞ, নর্তকী, অভিনেতা ও গল্পকার ছিলেন। সভ্যরা প্রায়ই যুবরাজের প্রাসাদে মিলিত হতেন। সুলতান পরিবারের অনুকরণে আমীর ওমরাহ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানগণ এই সময় এ ধরনের বহু সংখ্যক সমিতি গঠন করেন। সমিতিগুলো শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অবস্থা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ফলে বিশ্বের নানা স্থান থেকে বহু পরিব্রাজক, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও অন্যান্য পেশার শিল্পীরা তাদের শিল্প চর্চার জন্য ভারতে আসেন।

### মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিঃ)

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তিনি শুধু জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন নি, সে যুগের বিদ্বান ব্যক্তিদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থাও তিনি প্রবর্তন করেন। কবি আমীর খসরু তাঁর দরবারে অবস্থান করতেন এবংস রকার থেকে মাসিক এক হাজার



www.pathagar.com

'টঙ্কা' পেতেন। তোঘলাকাবাদ থেকে মাইল খানিক দূরে পাহাড় শীর্ষে অবস্থিত 'নায়িকা-কিলে' নামক দূর্গটি নাকি প্রকৃতপক্ষে একটি কলেজ, যা তাঁর দ্বারা প্রথম নির্মিত।

তোঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলক ছিলেন মধ্যযুগীয় সুলতানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। কলা ও বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তিনি ব্যাপক জ্ঞান রাখতেন। তিনি গভীর অধ্যয়নে রত থাকতেন ও বিখ্যাত পণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্ক করতে ভালবাসতেন।

ঐতিহাসিক বারনির মতে, "মুহম্মদ বিন তুঘলক এত বড় পণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁকে খোদার অদ্ভুত সৃষ্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না এবং এরিস্টটলের মতো মহাপণ্ডিতেরাও হয়তো তাঁর কাছে হার মানতেন।" শিক্ষার জন্য তাঁর দান ছিল সীমাহীন। তাঁর বদান্যতায় দিল্লীতে বহু মক্তব, মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপিত হয়। দিল্লী হতে সাতশত মাইল দূরে দৌলতাবাদে তিনি শিক্ষা সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেন। মওলানা শিহাব উদ্দীন দৌলতাবাদী, সাইদ আলী হামদানী, মওলানা ইবনে তাজ মুলতানী, মওলানা হারস সিরাজ উদ্দীন মুহম্মদ বিন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। মরক্কো দেশীয় পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তাঁর দরবারে নয় বছর কাজী হিসাবে কাজ করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁকে সুলতানদের মধ্যে সর্বাধিক বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেন। তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর দক্ষতা ছিল। কোরআন, সুন্নাহ, তর্কশাস্ত্র, গ্রীক ও মুসলিম দর্শন, গণিত, শরীর বিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন।

এ ছাড়া মুহম্মদ বিন তুঘলক কৃষি, ডাক ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধন করেন। তাঁর সময়ে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের একটি নূতন ধারা প্রবর্তিত হয়। আদিয়াবাদ দূর্গ ও জাহান ফকরায় স্থাপিত বেগমপুরী মসজিদ সুলতানের স্থাপত্য কীর্তির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

### ফিরোজশাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রিঃ)

ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ সালে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের উত্তরাধিকারী হিসেবে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে অবদান তিনি রেখেছেন তার তুলনা বিরণ। নিজে বিদ্বান ছিলেন তাই বিদ্বান ব্যক্তিদের কদর বুঝতেন। ইতিহাসের একজন উৎসাহী ছাত্র হিসাবে তিনি 'ফতুহাতে-ফিরোজশাহী' নামে তাঁর নিজের রাজত্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি শিক্ষা প্রসারের জন্য অকাতরে দান করতেন। তিনি পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের কাব্যের জন্য বৃত্তি ও অর্থ সাহায্য দিতেন। তাঁর দরবারে যে সব খ্যাতিমান ঐতিহাসিক তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সিরাজ



www.pathagar.com

আরিফ ও জিয়াউদ্দীন বারনী অন্যতম। 'মসনবীর' লেখক জালালুদ্দিন রুমী, মওলানা আলিম আনন্দপতি, কাজি আব্দুল কাদির ও আজিজুদ্দীন খালিদ খানির মত খ্যাতিমান ব্যক্তিরা ফিরোজ সাহেব দরবারে নিয়মিত শোভাবর্ধনসহ জ্ঞান চর্চার সুযোগ পেতেন। তাঁরা ধর্মতত্ত্ব, ইসলামি আইন, ইতিহাস, ভূগোল ও দর্শন বিষয়ে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অসাধারণ অগ্রগতির কারণ এই যে, সুলতান নিজে একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন এবং শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট শিক্ষকদের তাঁর রাজত্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিতেন। ঐতিহাসিকগণ শিক্ষা বিভাগের সংস্কারের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপকে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এতে শিক্ষা যেমন ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি এর দ্বারা দক্ষ শিক্ষকও সৃষ্টি হয়েছে।

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক তাঁর সময়ে প্রায় ত্রিশটির মতো মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাতে বেতনভোগী দক্ষ অধ্যাপক নিয়োগ করেন। এ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফিরোজ শাহী মাদ্রাসার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই মাদ্রাসার সাথেই সংযুক্ত ছিল মসজিদ ও জলাধার। মাদ্রাসাটি সম্পূর্ণ আবাসিক হওয়ায় শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ পাশাপাশি একত্রে বাস করতে পারতেন। ফলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি সুযোগ হত। এখানে শিক্ষাদান সঠিক এবং পূর্ণভাবে চলতো। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বৃত্তি পেত। হযরত মাওলানা রুমী ছিলেন এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

সুলতান ফিরোজ শাহের সময় রাজকোষ হতে শিক্ষা খাতে অর্থ ব্যয় করা হতো। ক্রীতদাসের শিক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। এদের ভাল মন্দ তদারক করার জন্য যেমন আলাদা কর্মকর্তা ও বিভাগ ছিলো তেমনি তাদের পেনসন ও এককালীন নগদ অর্থ দেওয়ার জন্য ছিলো আলাদা কোষাগার। এক সময় এর দ্বারা প্রায় আঠার হাজারের মতো ক্রীতদাস প্রকৃত শিক্ষা পেয়ে বিদ্বান, ব্যবসায়ী ও কারিগরে পরিণত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপি এবং কোরআন লিখনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এরা করতে পারত। ফিরোজ শাহের উৎসাহে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মক্তব এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি জীর্ণ মাদ্রাসাগুলোরও সংস্কার সাধন করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ জ্যোৎস্না বিকাশ চৌধুরী উল্লেখ করেন, "ফিরোজ শাহের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছিল এক নবতর অধ্যায়।"

**সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ**

হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তাঁর রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়।



www.pathagar.com

**ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল ঃ** ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ আলী মুবারককে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

**রাজ্যবিস্তার ঃ** সিংহাসনে আরোহণ করার পর ইলিয়াস শাহ রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। উত্তর ও পশ্চিম বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়াতে নিজের শক্তি সুদৃঢ় করে ইলিয়াস শাহ প্রথমে ত্রিহুত এবং নেপাল জয় করেন। তিনি চম্পারণ ও গোরখপুরও জয় করেন এবং বারানসী পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। তিনি শক্তি বৃদ্ধি করে স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কণ করেন। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে ফখরউদ্দীনের পুত্রকে পরাজিত করে তিনি সোনারগাঁওকে স্বীয় সাম্রাজ্যভূত করে নেয়। এভাবে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের একজন অধিপতি হলেন।

**ফিরুয তুঘলকের বঙ্গ অভিযান ঃ** মুহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর ফিরুয তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইলিয়াস শাহের কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। ফিরুয তুঘলকের অভিযানের কথা জানতে পেরে ইলিয়াস শাহ তাঁর দুর্ভেদ্য একডালা দূর্গে আশ্রয় নিলেন। ফিরুয তুঘলক রাজধানী পাণ্ডুয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ইলিয়াস শাহের পুত্রকে বন্দী করবার পর একডালা দূর্গ অবরোধ করলেন।

**একডালা দূর্গের অবরোধ প্রত্যাহার ঃ** বাইশ দিন দিল্লীর সৈন্যবাহিনী একডালা দূর্গ অবরোধ করে রইল। কিন্তু ইহা অধিকার করতে পারল না। অবশেষে ফিরুয তুঘলক অবরোধ প্রত্যাহার করে দিল্লীতে ফিরে গেলেন।

**কামরূপ বিজয় ঃ** কামরূপ বিজয় ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালের অন্যতম প্রধান ঘটনা। ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং ঐ বছরেই তিনি উহা অধিকার করেন। কামরূপ বিজয়ের পরেই ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয়।

**ইলিয়াস শাহের কৃতিত্ব ঃ** বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে ইলিয়াস শাহ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েরেছন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান যিনি সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করে যুক্ত বাংলার অধিশ্বর হয়েছিলেন। এ কারণেই ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আকিফ তাঁকে 'শাহ-ই-বাংলা' খেতাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে তিনি নিঃসন্দেহে একজন কীর্তিমান পুরুষ।

**রাজ্যের বিস্তৃতি ঃ** সামান্য অবস্থা হতে স্বীয় যোগ্যতার বলে ইলিয়াস শাহ বাংলার সিংহাস অধিকার করেছিলেন। তিনি শুধু সিংহাসনে আরোহণ করেই ক্ষান্ত হননি। ত্রিপুরা, নেপাল, উড়িষ্যা, চম্পরণ, গোরখপুব, কাশী কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে রাজ্যসীমাও বিস্তৃত করেন।

**রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ঃ** ইলিয়াস শাহ ছিলেন একজন সাহসী ও উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তিনি কারও কাছে মাথা নত করেন নি। সুদীর্ঘ ১৫–১৬ বছর তিনি বিক্রমের সহিত বঙ্গদেশে তাঁর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। ফিরুয



www.pathagar.com

শাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। দিল্লীর সহিত সদ্ভাব রক্ষা করে তিনি বাংলায় রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করেছিলেন।

**শাসন দক্ষতা ঃ** শাসক হিসেবে ইলিয়াস শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও জনপ্রিয়। তাঁর শাসনামলে বাংলার শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্রের জন্য ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। তাঁর আমলে স্থাপত্যশিল্প ও সংস্কৃতি যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।

**ধর্মনিষ্ঠা ঃ** ইলিয়াস শাহ একজন ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি ফকির ও দরবেশগণকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। পীর সিরাজউদ্দীন ও শেখ বিয়াবানী তাঁর রাজত্বকালে এদেশে আসেন এবং তাঁর দরবার অলঙ্কৃত করেন। পীর সিরাজউদ্দীনের শিষ্য আলাউল হকের সম্মানার্থে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা ইলিয়াস শাহকে মধ্যযুগের মুসলিম বাংলার ইতিহাসে প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক বলা হয়। তিনি বাংলা ভাষাভাষীদের সমন্বয়ে দুই ভূখণ্ডকে একত্রিত করে বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই বাঙালিরা সর্বপ্রথম একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় হতেই রাজ্যের সকল অঞ্চলের অধিবাসী বাঙালি বলে পরিচিত হয় এবং বঙ্গের বাহিরের দেশগুলিও তাদিগকে বাঙালি বলে অভিহিত করে।

## গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ (১৩৯৩-১৪১০ খ্রিঃ)

বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন সিকান্দার শাহের সুযোগ্য পুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ। ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার শাহ নিহত হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশের মসনদে বসেন। তিনি দক্ষ শাসক, বিদ্যোৎসাহী এবং প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা শান্তি ও সংহতি বজায় রাখা ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্ভবত তিনি পিতার আমলে অধিকৃত কামপে অভিযান করে স্বীয় কৃতিত্ব কায়েম করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্বকালে শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য ফারসি কবি এবং একবার তাঁর রচিত একটি গজলের শেষ অংশ পূরণের জন্য পারস্যের কবি হাফিজের নিকট পাঠান। তিনি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু হাফিজ নিজের অক্ষমতা জানিয়ে গজলটির শেষ দুটি ছত্র পূরণ করে পাঠান। পারস্যের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বে চীন সম্রাট ইয়াংলু ১৪০৮ খ্রিস্টাব্দে



www.pathagar.com

একটি দল চীনে প্রেরণ করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মভীরু ছিলেন। তাঁর আমলে প্রথম বাঙ্গালি মুসলমান কবি শাহ সগীর 'ইউসুফ জুলেখা' কাব্য প্রণয়ন করেন। সম্ভবত তিনিই কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনায় উৎসাহিত করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সমঝোতা রক্ষার প্রয়াস পান। তাঁর ন্যায়পরায়ণতার বহু নজীর আছে। একবার তিনি স্বয়ং আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি মাদ্রাসা, মসজিদ ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক সূফী নূর-কুতুব-উল আলমের সমাধি নির্মাণ করেন। ইহা ছাড়া মক্কা-মদীনায় তিনি অর্থ বিলির ব্যবস্থা করেন এবংমক্কায় মাদ্রাসা ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন। "বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মতো আকর্ষণীয় চরিত্র বোধহয় আর কারও নাই। প্রজারঞ্জক সুলতান হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের তুলনা হয় না। তাঁর চরিত্রে নানা রকম বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হয়েছিল। এই সুলতানের যে সমস্ত কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায় তার প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে একটি উন্নত বৈচিত্রপ্রিয় রুচিবান বিদগ্ধ মানব-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের কোন কোন ঘটনা এতই বৈচিত্র্যময় যে, সেগুলি হতে তাঁকে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে হয়।" ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে আযম শাহের মৃত্যু হয় এবং সোনারগাঁয়ে (মগরাপাড়া) তাঁতে সমাধিস্থ করা হয়।

**বাংলার হুসাইন শাহী বংশ (আলাউদ্দীন হোসেন শাহ)**

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে হাবশী বংশের শামসউদ্দীন মুজাফফরকে পরাজিত ও বন্দী করে আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বংশ হুসাইন শাহী বংশ নামে ইতিহাসে পরিচিত। হুসাইন শাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ প্রায় ৫৫ বছর (১৪৯৩-১৫৪৮ খ্রিঃ) বঙ্গদেশ শাসন করেন। হুসাইন শাহী বংশ বঙ্গের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।

**আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ ঃ** আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ সিংহাসনে আরোহণের পর দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি প্রথমে শক্তিশালী প্রসাদরক্ষী পাইকবাহিনীর ক্ষমতা বিনষ্ট করার জন্য তাদের অনেককে বরখাস্ত করেন এবং পাইকদের পরিবর্তে এক নতুন দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। অতঃপর তিনি আবিসিনীয় হাবশীদের নিয়ে পূর্ববর্তী সুলতানদের গঠিত সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিলেন এবং তাদিগকে বঙ্গদেশ হতে বিতাড়িত করে তাদের স্থানে পুরাতন অভিজাতগণকে (সৈয়দ ও আফগান বংশজাত লোক) নেয়া হল। এই ব্যবস্থার ফলে অল্পদিনের মধ্যে দেশে শান্তি ফিরে আসল।

জৌনপুরের সুলতান হুসাইন শাহ শারকী নিজ রাজ্য হতে বিতাড়িত হয়ে পুত্র-পরিজনসহ বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ তাঁকে স্বীয় রাজ্যে বসবাস করতে অনুমতি দিলেন। বঙ্গের সুলতান জৌনপুরের



www.pathagar.com

সুলতানকে আশ্রয় দেওয়ায় দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদী খুব ক্রুদ্ধ হন। দিল্লীর সৈন্যবাহিনী বঙ্গের সীমান্ত আক্রমণ করলে উভয়ের মধ্যে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এর পর দিল্লীর সেনাবাহিনী দিল্লীতে ফিরে যায়।

**রাজ্য বিস্তার ঃ** দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে হুসাইন শাহ পূর্ববর্তী শাসনামলে যে সমস্ত স্থান হস্তচ্যুত হয়েছিল সেগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি কুচবিহারের কামতাপুরে অভিযান পাঠিয়ে উহা অধিকার করলেন। কামতাপুর বা কামরূপ বিজয়ের পর হুসাইন শাহ পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। অহোম নরপতি পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমভূমি অঞ্চল মুসলিম বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হলে অহোম নরপতি পার্বত্য অঞ্চল হতে বের হয়ে আসলেন এবং মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করলেন। ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সৈন্যবাহিনী উড়িষ্যা আক্রমণ করে। উড়িষ্যা অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এর পর হুসাইন শাহের সৈন্যবাহিনীর গোমতী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে চট্টগ্রাম অধিকার করে। আরাকান বিজিত হয় এবং তাঁর সেনাপতি পরাগল খান ইহার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। হুসাইন শাহের সামরিক অভিযান সম্বন্ধে ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন, "আসাম অভিযান ব্যতীত হুসাইন শাহের সকল সামরিক পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।"

**হুসাইন শাহের কৃতিত্ব ঃ** হুসাইন শাহ নিঃসন্দেহে বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। শাসক হিসেবে তিনি ন্যায়পরায়ণ ও সুদক্ষ ছিলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন ছাড়াও শিল্পকলা ও শিক্ষার উদার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি বঙ্গের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। তাঁর শাসনামলে বহু হাসপাতাল, মসজিদ ও বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' নামে দু'খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই যুগের কবি সাহিত্যিকগণের মধ্যে মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, যশোরাজ খাঁ, রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিপ্রদাস 'মনসা বিজয়' এবং বিজয়গুপ্ত 'পদ্মপুরাণ' (মনসামঙ্গল) রচনা করেন। মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভগবৎ' ও 'পুরাণ' বাংলায় অনুবাদ করে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলেই বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম বিস্তার লাভ করে। শিল্পকলা ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে অভাবিত উন্নতির জন্য হুসাইন শাহের শাসনামল বঙ্গের ইতহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে হুসাইন শাহ পরলোকগমন করেন।

**নসরত শাহ**

হুসাইন শাহের মৃত্যুর পর নসরত শাহ ক্ষমতাসীন হন। তিনি পিতার ন্যায় একজন যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি সিকান্দর লোদীকে পরাজিত করে তিরহুত অধিকার করেন। তিনি হাজীপুর অধিকার করে সেখানে একটি সামরিক ঘাঁটি



www.pathagar.com

স্থাপন করেছিলেন। পর্তুগীজদের দমন তাঁর শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নসরত শাহ কূটকৌশল প্রয়োগে বাবরের আক্রমণ হতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করেছিলেন। ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ক্রীদাস কর্তৃক নসরত শাহ নিহত হলে তাঁর প্রায় এক যুগব্যাপী গৌরবময় শাসনকালের অবসান ঘটে।

**নসরত শাহের আমলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ** সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উন্নতির জন্য নসরত শাহের শাসনামল গৌরবমণ্ডিত হয়ে রয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর আদেশে 'মহাভারত' বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়। সুবিখ্যাত 'সোনা মসজিদ' ও 'কদমরসুল মসজিদ' তাঁর শাসনামলের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তাঁর শাসনামলে জনসাধারণ শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে দিন অতিবাহিত করত।

**হুমায়ুন (১৫৩০-৪০, ১৫৫৫-৫৬ খ্রি:)**

দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের স্বল্পকালীন রাজত্বেও শিক্ষা চর্চা প্রসার লাভ করে। তিনি পিতার ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভূগোল ও বিজ্ঞান চর্চায় আনন্দ পেতেন। হ্যাভেল বলেন, "বাবরের মত তাঁর (হুমায়ুন) শিক্ষা এবং রুচি ছিল সম্পূর্ণরূপে ফার্সী ভিত্তিক।" তিনি জ্যোতিবিদ্যা গণিতশাস্ত্র এবং কাব্য চর্চায় অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তিনি কবিতা রচনা করতে পারতেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ লাভ করেন। হুমায়ুনের রাজত্বে লিখিত জওহরের "তাজকিরাত-উল-ওয়াকিৎ" ও গুল বদন রচিত "হুমায়ুন নামা" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে তিনি "দিনপানাহ" অর্থাৎ বিশ্বাসীদের আশ্রম নামে একটি শহর নির্মাণ করেন। শহরের প্রধান আকর্ষণ ছিল একটি সুন্দর গ্রন্থাগার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গ্রন্থপ্রিয়। তিনি রাজকীয় গ্রন্থাগারের জন্য অনেকগুলো গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। বাস্তবিক গ্রন্থের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এতই তীব্র ছিল যে, এমনকি সামরিক অভিযানের সময়ও অধ্যয়নের জন্য নির্বাচিত কিছু সংখ্যক বই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কাউন্ড নোয়র জানান যে, তিনি ভারতবর্ষ থেকে পলায়নের সময় কিছু গ্রন্থও সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত গ্রন্থাগারিক বাজ বাহাদুরকে তিনি সঙ্গে নেন। ভারতবর্ষ দ্বিতীয়বার রাজত্বের সময় শের মণ্ডল' নামক শের শাহের "প্রমোদ ভবন" তাঁর আদেশক্রমে গ্রন্থাগারে পরিণত করা হয়।

হুমায়ুন পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিদের মর্যাদার প্রতি ছিলেন খুবই সচেতন। সাম্রাজ্যে সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে সম্রাটের পরে বিদ্বান ব্যক্তিদের স্থান ছিল নির্ধারিত। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা তাঁর দরবারে বিশেষভাবে সমাদৃত হন, তাঁদের মধ্যে খুদামির, জৌহর আবদুল লতিফ ও শেখ হুসাইন দিল্লী নগরীতে সম্রাট হুমায়ুন প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন।



www.pathagar.com

হুমায়ুন জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল পছন্দ করতেন এবং তাঁর রাজত্বকালে বিজ্ঞানের এ শাখাগুলোর যথেষ্ট উন্নতি হয়।

"দিন পানাই"র দরবারে জ্ঞানী, গুণী, সাহিত্যিক, সুফি, কবি এবং ঐতিহাসিকগণ সমাদৃত হতেন। মুঘল স্থাপত্য এবং চিত্রকলার উন্মেষ হয় হুমায়ুনের পৃষ্ঠপোষকতায়। পারস্য দেশ হতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন কালে হুমায়ুন মীর সৈয়দ আলী এবং খাওয়াজা আবদুল সামাদ নামে দুজন প্রখ্যাত পাস্য দেশীয় চিত্রকরকে নিয়ে আসেন। এই দুজন চিত্রশিল্পীর উদ্দ্যোগে মুঘল চিত্রকলার বিকাশ ঘটে।

হুমায়ুন নারী শিক্ষার ব্যাপারে খুবই সজাগ ছিলেন। পারিবারিক পরিবেশে নারীদের শিক্ষিত, রুচিশীল, মার্জিত ও সংস্কৃতিমনা করার লক্ষ্যে তিনি ইরান, তুরান, সমরকন্দ ও বুখারা থেকে নামীয় বিশেষ গৃহ শিক্ষিকার মাধ্যমে শাহজাদীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আরবি, ফারসি ও তুর্কী ভাষায় পণ্ডিত এ গৃহ শিক্ষিকারা সার্থকভাবে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। শাহজাদীদের শিক্ষার সুবিধার্থে হুমায়ুন পারিবারিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরব, ইরান, তুরান ও মিশর থেকে সংগৃহীত গ্রন্থাদিতে এ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করেন। উল্লেখ্য, হুমায়ুনের ভগ্নি গুলবদন এ গ্রন্থাগারে ফেরদৌসী, হাফিজ, রুমি ও শেখ সাদীর অমর কাব্য ও কবিতা ইত্যাদি অধ্যয়ন করে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর কাব্যিক প্রতিভার বিকাশ ঘটান। গুলবদনের রচিত কাব্য গ্রন্থের নাম 'হুমায়ুন নামা'। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন কাব্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। গুলবদন শুধু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি হেরেমের এতিম ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া ও ধর্ম শিক্ষা দিতেন।

সম্রাট হুমায়ুন অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন এবং প্রতি সোমবার ও বুধবার সঙ্গীত চর্চার জন্য নির্ধারিত ছিল। তাঁর দরবারে সুকণ্ঠ গায়ক-গায়িকারা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন। গায়ক-গায়িকা ও যন্ত্রশিল্পীদের সুর মুর্ছনায় তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। শাদ বেগম ও মহরআংরেজ বেগম যন্ত্র সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। মাণ্ডু দুর্গ অধিকারের প্রাক্কালে বাচ্চু নামক একজন শিল্পীর সঙ্গীতের সুর লহরীতে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁকে তাঁর দরবারে গায়কের পদ প্রদান করেন।

নৃত্য-শিল্পীদের তিনি যথেষ্ট মর্যাদা দেন এবং হেরেমে সাংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁদেরকে প্রধান প্রধান বেগমদের মনোরঞ্জনের জন্য নিয়োজিত করেন।

হুমায়ুন জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল পছন্দ করতেন এবং তাঁর রাজত্বকালে বিজ্ঞানের এ শাখাগুলোর যথেষ্ট উন্নতি হয়।



www.pathagar.com

**আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ)**

বাংলাবর্ষ প্রবর্তনকারী সম্রাট আকবর মুঘল বংশের তৃতীয় সম্রাট। তিনি ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। মহামতি আকবরকে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়ে থাকে। কারণ, বাবর প্রতিষ্ঠিত তুর্কী সাম্রাজ্য হুমায়ুনের রাজত্বকালে বিপর্যস্ত হলেও আকবরের কূটনৈতিক দক্ষতায় ও সময় কুশলতায় কেবল আফগান ষড়যন্ত্রই ধূলিসাৎ হয়নি, বরং বিজিত অঞ্চলগুলো সুসংবদ্ধ হয়। তাঁর রাজত্বকালে মুঘলগণ সামান্য আক্রমণকারী থেকে স্থায়ী ভারতীয় রাজবংশে রূপান্তরিত হয়। তিনি ছিলেন একাধারে দুর্দমনীয় সৈনিক, শ্রেষ্ঠ সেনাপতি বিচক্ষণ প্রশাসক, জনহিতৈষী শাসক ও মানব চরিত্রের প্রকৃত বিচারক। তাঁর শাসনকে মুঘল আমলের "স্বর্ণযুগ বা অগাস্টান যুগ" বলা হয়।

সম্রাট আকবর নিরক্ষর বা উশ্মী ছিলেন। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মতে আকবর সহি করতে জানতেন এবং তাঁর ধাত্রীমাতা মাহম-আনগা সুশিক্ষিতা ছিলেন বিধায় সম্রাট আকরব সর্ববিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন। তাঁর জ্ঞান পিপাসা ছিল অপরিসীম ও স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। প্রতিটি বিষয় জানার একটা কৌতূহল এবং সীমাহীন অনুসন্ধিৎসা ছিল আকবরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি সুন্দর হস্তলিপি পছন্দ করতেন। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ছিল প্রখর এবং যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

তৃতীয় মুঘল সম্রাট মহামতি আকবর নিরক্ষর হিসেবে কথিত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রেখে গেছেন। ইউলিয়াম স্লীমান বলেন, "কবিদের জন্য আগ্রার মতো লাহোরও বিদ্যা চর্চার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ নগরীও সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পদচারণায় মুগ্ধ হয়ে উঠে। এখানেই 'তারিখ-ই-আল্‌ফি' লিখিত হয় এবং 'মহাভারত ও রাজতরঙ্গিনী' ফার্সী ভাষায় অনুদিত হয়। লাহোরে অবস্থানকালে তিনি এ স্থানের বিদ্বান ব্যক্তিদের সাথে দার্শনিক ও ধর্মীয় আলোচনা শুরু করেন। তাবাকত-ই-আকবরীর লেখক নিযামউদ্দীন আহমদ ও রাজস্ব মন্ত্রী রাজা টোডরমল এখানেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেন।

**ফতেহপুর সিক্রী ঃ** নতুন স্থাপিত ফতেপুর সিক্রীতে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় ও শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এ নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ ইবাদতখানা নির্মাণ করা হয়েছিল। এ ইবাদত খানায় সকল ধর্মাবলম্বীর পণ্ডিত সমাবেশে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা শুনতেন। ইহা ছিল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও মতাবলম্বী পণ্ডিত ব্যক্তিদের মিলন ক্ষেত্র। বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক মতাদর্শে বিশ্বাসী পণ্ডিতবর্গ ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আলোচনার প্রাক্কালে আকবর সত্য নিরূপণে সচেষ্ট হতেন। সম্রাট সব ধর্মের ভাল দিকগুলের সমন্বয়ে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে 'দিন-ই-ইলাহী' বতবাদের প্রবর্তন করেন। ইবাদত খানায় বিতর্ক সভার উদ্ভূত যে সব সমস্যা দেখা দিত



www.pathagar.com

সেগুলো যথাযোগ্য পরীক্ষণ ও সমাধানের ব্যবস্থা করতেন। শিক্ষার প্রসারের প্রেক্ষিতে এসব পরীক্ষণের ব্যবস্থা শিক্ষাবিদদের নিকট কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না।

ইবাদতখানায় বিতর্ক কালে একদিন প্রশ্ন ওঠলো মানুষের আদি ভাষা সম্পর্কে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা তাঁদের স্ব স্ব ভাষা বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সম্রাট আকবর সত্যিকার মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি বারটি শিশুর পরিচর্যার ভার দিলেন বারজন বোবা পরিচারিকার ওপর। তাদের বার বছর পর্যন্ত মানব সমাজ থেকে পৃথকভাবে বাস করার সুযোগ দেয়া হলো। বার বছর পর পণ্ডিত সমাবেশে শিশুদের এনে দেখা গেল তারা সকলেই বোবা, কোন ভাষাই তারা শিখতে পারেনি। শিশু কোন ধর্ম ও ভাষা সাথে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুর যে সার্বিক পরিবর্তন সাধিত হয়-এ মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক সত্য এ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো।

**শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি ঃ** আকবর জাতি সত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে ও জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে অসংখ্য মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি বিত্তবানদের সম্পত্তিও দান করেছিলেন। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বৃত্তি ও উপবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। গরিব ছাত্রদেরও বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ ছিল। এ সময়ে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় রাজা টোডরমল স্বীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ফ র্সী ভাষা শিখে এবং মুসলমানদের সাথে মুঘল প্রশাসনের সর্বত্র প্রতিযোগিতা অবতীর্ণ হতে শুরু করে।

**শিক্ষা সংস্কার ঃ** শিক্ষা বিস্তারের জন্য আকবর কেবল মক্তব ও মাদ্রাসা বৃদ্ধি করেই ক্ষান্ত হননি, ফার্সী ভাষা শেখানোর জন্য তিনি নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতিও প্রয়োগ করেন। নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী কোন শিক্ষার্থীকে ফারসী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করার পূর্বে শিক্ষার্থীকে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হতো। প্রথম পর্যায়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও যতিচিহ্ন প্রয়োগ করে অক্ষর পরিচয় করানো হতো। অক্ষরগুলো এভাবে শিখে নিতে দু দিনের অধিক সময় প্রয়োজন হতো না। দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্ত বর্ণগুলো কেবল শেখানো হতো। যুক্ত বর্ণগুলো আয়ত্ত করতে তাদের সপ্তাহ খানেকের মতই সময় লাগতো। সর্বশেষ পর্যায়ে স্রষ্টার প্রশংসাযুক্ত ছোট আকারের চরণ অথবা হিতোপদেশমূলক চরণ পড়তে দেয়া হতো। এভাবে শিক্ষকের দ্বারা শেখানোর পরে শিক্ষার্থীকে নিজের শ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে স্বাধীনভাবে পড়তে সুযোগ দেয়া হতো। প্রয়োজবোধে এ পর্যায়ে শিক্ষকরা সাহায্যও করতেন। শিক্ষার্থীকে পাঠের সংস্পর্শে রাখার জন্য প্রতিদিন অনুশীলনীর কাজ করতে বলা হতো। (১) অক্ষর, (২) যুক্তাক্ষর, (৩) অর্থশ্লোক অথবা দ্বিচরণ শ্লোক, (৪) পূর্ববর্তী পাঠের পুনরাবৃত্তির ওপরই তারা অনুশীলনীর কাজ করতো। ভাষা শেখানোর এ নতুন পদ্ধতি এতই কার্যকর হয়েছিল যে, ছাত্রদের ভাষা শেখার



www.pathagar.com

ব্যাপারে যেখানে কয়েক বছরের প্রয়োজন হতো, সেখানে কয়েক মাসের মধ্যে ভাষা শেখা আয়ত্ত হতো। এ পদ্ধতির প্রয়োগ এতই কার্যকরী হয়েছিল যে, আবুর ফজল হিন্দুস্থানের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিনব শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতার প্রমাণ পেয়ে অত্যন্ত গৌরব অনুভব করেছিলেন। এখানে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সংস্কার সাধনের জন্য আবুল ফজলও আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র।

**শিক্ষাক্রম ঃ** শিক্ষার্থীরা নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা অনুযায়ী যাতে বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারে সেজন্য শিক্ষাক্রমের মধ্যেও বৈচিত্র আনা হয়েছিল। কিছুই শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হতো না। পরিষ্কার এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কাউকে বর্তমান বা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে এবং ধরনের জীবনধর্মী শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে দেয়া হবে না এবং শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের প্রতি অবহেলা দেখানো ঠিক হবে না। মানবিক ও বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়া হতো। যেমন-নীতিশাস্ত্র, গণিত, হিসাব, কৃষি, জ্যোতির্বিদ্যা, অর্থনীতি, প্রশাসন পদ্ধতি, পদার্থবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন, সূক্ষ্ম অঙ্কশাস্ত্র, আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও ইতিহাস প্রভৃতি।

**শিক্ষার লক্ষ্য ঃ** সম্রাট আকবরের আমলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁর শাসনামলে নিছক ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল।

তিনি ছিলেন ভারতীয় ঐক্যের মূর্ত প্রতীক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতের জনগণকে সুসংহত করা। উদার মানসিকতা ও জাতীয় দৃষ্টি ভঙ্গির অধিকারী সম্রাট আকবর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর প্রজাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। হিন্দুদেরও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে সমভাবে শিক্ষা দেয়ার প্রথা চালু হয়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "His views on educational matters were better and more tolerant than those of other Muslim rulers. He encouraged the study of sanskrit and extended his Patronage to Hindu scholars."

**শিক্ষণ সম্পর্কে নির্দেশ ঃ** শিক্ষণ সম্পর্কে তাঁর একটি নির্দেশও উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর নির্দেশে বলেছিলেন যে, ছাত্ররা যাতে নিজেরা পড়ে পঠিত বিষয়টি সম্পর্কে নিজেরাই মর্ম অনুধাবনে সক্ষম হয় তারই ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এ উপলব্ধির পথে কিছুটা সাহায্য করবেন মাত্র। শিক্ষা সম্পর্কে আকবরের মতবাদ ও নির্দেশ অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং বাস্তব চর্চার পরিচায়ক। বস্তুত মধ্যযুগীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় বর্ধিত হলেও আকবর কী করে এ প্রগতিশীল মন ও চিন্তার অধিকারী হয়েছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়ের বস্তু।



www.pathagar.com

**নবরত্ন সভা ঃ** আকবর রাজ দরবারে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর নবরত্ন সভার সদস্যগণ তাঁর দরবারে উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক হিসাবে বিরাজ করতেন। তাঁরা অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আকবর তাঁদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বীরবল মানসিংহ, তানসেন মোল্লা-দো পেয়াজা।

**সঙ্গীত ঃ** আকবর সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আবুল ফজল আকবরের দরবারে ছত্রিশজন সঙ্গীত শিল্পীর উল্লেখ করেন। তানসেন ছিলেন তাঁদের শিরোমণি। আকবরের রাজত্বকালে বিভিন্ন রাগের সংমিশ্রণে ভারতীয় সঙ্গীতের উদ্ভব হয় এবং এতে তানসেনের অবদান অনস্বীকার্য।

**তানসেন ঃ** তানসেনের জন্ম ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে। দশ বছর বয়স থেকে তিনি স্বামী হরিদাসের অধীনে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। হরিদাস ছিলেন ধ্রুপদ গায়ক ও ধ্রুপদ রচয়িতা। ধ্রুপদের ক্রমোন্নতিতে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তানসেন বিস্ময়কর সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। গীত রচনাতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তানসেনের সঙ্গীত শিক্ষার পর্ব শেষ হয়। রেওয়ারের রাজা রাম তাঁকে সভাগায়ক নিযুক্ত করেন।

দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর সম্রাট আকবর তানসেনকে দিল্লীর দরবারে প্রধান গায়ক নিযুক্ত করেন। আকবরের মতো বিদ্যোৎসাহী সম্রাট ইতিহাসে বিরল। নানা বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের প্রতি তিনি অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। আকবর নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। দিল্লীর দরবারে তিনি বহু সঙ্গীতজ্ঞকে স্থান দেন। তানসেন ছিলেন তাঁর মধ্যমণি। সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীর দরবারকে কেন্দ্র করে সঙ্গীত চর্চার এক বিপুল ধারা গড়ে ওঠে। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশে সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতা গভীরভাবে ফলপ্রসূ হয়।

দরবার জীবনে তানসেন যেমন অসামান্য কণ্ঠস্বর ও সুরের প্রভাবে গানকে জনপ্রিয় করেন তেমনি শিষ্য তৈরি করে সঙ্গীত বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। আশি বছর বয়সে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন তাঁর পুত্র, জামাতা ও শিষ্যগণ তাঁর সঙ্গীতের পতাকা বহনের সম্পূর্ণ যোগ্য।

তানসেনকে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের জনক বলা হয়। তিনি আধুনিক ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন গীতিকার ও কবি। তাঁর রচিত বহু গান পাওয়া যায়। 'রাগমালা' ও 'সঙ্গীত সার' নামে তিনি দুটি সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তানসেন কতিপয় রাগ সৃষ্টি করেন। যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।



www.pathagar.com

ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পারস্যের সঙ্গীত ঐতিহ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে আমীর খসরু যে নব সঙ্গীত রচনার সূত্রপাত করেছিলেন তানসেনের সাধনায় তারই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র ও কন্যা বংশ এবং শিষ্য বংশের মাধ্যমে সেই সঙ্গীত ধারা সারা উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করে। হিসেবে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশের ক্ষেত্রে তানসেনের অবদান অপরিসীম।

**সাহিত্য ঃ** সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আকবরের রাজত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সর্বদা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ধর্মপণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গদান করতেন এবং তাঁর নিরবচ্ছিন্ন পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্য ও হিন্দু সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁর উদার ধর্ম সহিষ্ণু নীতি তাঁকে সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত করে এবং শিল্প সাহিত্যে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করে।

**ইতিহাস ঃ** আকবরের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনায় কয়েকজন পণ্ডিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা', মোল্লা দাউদের 'তারিখ-ই-আকবরী', ফেজী সরহিন্দির 'আকবরনামা', আবদুল বাকীর 'মা সীর-ই-রহিমা' প্রভৃতি ফারসি ভাষায় রচিত ইতিহাস থেকে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম সদস্য ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের ফারসি ভাষায় রচিত 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। আইন-ই-আকবরী আকবরের রাজত্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর নির্ভরযোগ্য মূল্যবান, ঐতিহাসিক তথ্যের সমৃদ্ধ গ্রন্থ। এতে তাঁর প্রশাসনিক কাঠামো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন যে, "ইহা ছিল দীর্ঘ ও নির্ভুল।" এ ছাড়া বদাউনীর "মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ।" এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক রচনা। নিযামউদ্দীন আহমদের "তাবাকাত-ই-আকবরী" এবং নকীব খান, মোল্লা আহমদ, আসফ খানের যৌথ প্রচেষ্টায় লিখিত "তারিখ আলফি" ঐতিহাসিক রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

**অনুবাদ ঃ** পারস্য ভাষায় মৌলিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা ব্যতীত আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ফৈজী, আবুল ফজল, বদাউনী সংস্কৃত ভাষায় বহু পারস্য গ্রন্থ, অনুবাদ করেন। এভাবে মহাভারত রামায়ণ পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। এছাড়া অর্থর্ববেদ, ভগবৎগীতা, লীলাবতী ও রাজতরঙ্গিনী পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দর্শন সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা ও পৌরানিক কাহিনীও পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়।

### শেরশাহ্ শূরী (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রিঃ)

স্বীয় প্রতিভা, বাহুবল ও সমরকুশলী শেরখান ১৫৪০ সালে সম্রাট হুমায়ুনকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং শেরশাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।



www.pathagar.com

তিনি শূরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আব্বাস শেরওয়ানী কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-শেরশাহী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, শেরশাহের বাল্য জীবন সুখের ছিল না। বাইশ বছর বয়স থেকে গৃহ বিতাড়িত হয়ে শেরশাহ তৎকালীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্র জৌনপুরে উচ্চ শিক্ষার জন্য গমন করেন। তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শেখ সাদীর রচিত গুলিস্তা, বুস্তাঁ এবং নিজামীর সেকেন্দ্রানামা মুখস্থ করে ফেলেন। জৌনপুরেই তাঁর এ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তিনি ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে শিক্ষা ও আনন্দ দুই'ই লাভ করেন। তিন বৎসরের মধ্যে শেরশাহ শিক্ষকের মর্যাদায় উন্নীত হন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন জায়গীরদার। তাঁর ভবিষ্যত জীবনে ভারতবর্ষের শাসনের শিক্ষানবিশী অধ্যায় সূচিত হয় তাঁর পিতা হাসানের জায়গীর পরিচালনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

শেরশাহ শিক্ষা প্রসারের জন্য বহু মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ নির্মাণ করেন। শেরশাহ জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতদের খুবই মর্যাদা দিতেন। তাঁদেরকে মুক্ত হস্তে অর্থ দান করতেন। শেখ আব্দুল্লাহ সুলতানপুরী মখদুম উল-মুলক ও আব্দুল হাসান কামবু নামে দু'জন নামকরা পণ্ডিত তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসাবে থাকতেন।

শেরশাহের সময়ে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা, আরবি, ফার্সীভাষা ব্যতীত আধুনিক শিক্ষাদানও করা হতো। মসজিদের জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করা হতো। তিনি মসজিদ ও মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য যথাক্রমে ভাতা ও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। এ কারণে শেরশাহ বহু ভূমি সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। শিক্ষার উন্নতি কল্পে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে টোল, পাঠশালা, মঠ, বিহার, মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠে। তাঁর সময়ে দেশে নাগরী ভাষার প্রচলন ছিল তা তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রার উপর থেকে বুঝা যায়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মাধম ছিল আরবি, ফারসি ও হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত। বিদ্যালয়ে উপদেশ দান, বিতর্ক, বক্তৃতা ও আলোচনার উপর প্রাধান্য দেয়া হতো। গ্রাম্য গীতানুষ্ঠান, কথকতা, মেলা প্রভৃতি লোক শিক্ষার উৎকৃষ্ট বাহন ছিল। এ ছিল তৎকালীন সমাজের স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা, সাহিত্য, ফিকাহ্, গণিত, তর্কবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করতেন না। হিন্দু শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি অনেক ভূমি দান করেন। মূলত তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত।

শেরশাহের স্বল্পকালীন রাজত্বে তাঁর স্থাপত্য শিল্প নিদর্শনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে রোটাসগড়ের দুর্গ, দিল্লীর পুরান কেল্লা, কিল্লা-ই-কুহনা মসজিদ এবং সাসারামে তাঁর সমাধি-সৌধ যা পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তব এর মতে, "সম্রাট আকবর অপেক্ষা শেরশাহ উদার ধর্মনীতিতে অধিকতর সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সাফল্য প্রতিফলিত হয়।"



www.pathagar.com

## জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৬ খ্রিঃ)

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পিতার ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী না হলেও শিল্প শিক্ষায় তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাঁর রাজত্বকালে শিক্ষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তিনি নিজে পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কবিতা তাঁর অত্যধিক প্রিয় ছিল এবং তিনি স্বয়ং কবিতা রচনা করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি ছিলেন সুধীজনের বিশ্বস্ত বন্ধু। তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী' ফারসি সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি। জ্ঞানী গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁর দরবার অলঙ্কৃত করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মির্জা গিয়াসবেগ, নাকিব খান, আবদুল হক দেহলবী।

প্রকৃতি প্রেম ও চিত্র কলার প্রতি তাঁর অসাধারণ মোহ ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলার জাতীয় স্কুলের উদ্ভব হয় এবং মুঘল চিত্রকরগণ অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন। এ সময়ের প্রখ্যাত চিত্রকর ছিলেন মনসুর, আবুল হাসান প্রমুখ।

শিক্ষার প্রতি জাহাঙ্গীরের এতই অনুরাগ ছিল যে, সিংহাসনে আরোহনের অব্যবহিত পরেই পাখি ও পশুর বাসভূমিতে পরিণত হয়, প্রায় তিন যুগ ধরে পরিত্যক্ত ব্যবহারের অনুপযোগী মক্তব ও মাদ্রাসার সংস্কার, পুনঃ নির্মাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ছাত্র ও অধ্যাপকদের বাসের উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ দেন। মৃত প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে ওঠে। তাঁর নির্দেশক্রমে রাজকীয় গ্রন্থাগার অসংখ্য মূল্যবান পুস্তকের সংযোজনে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়। মকতুব খান নামক একজন দক্ষ গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বে এ গ্রন্থাগার ন্যস্ত করা হয়। তিনি একটি ফরমান জারি করেন যে, উত্তরাধিকারীহীন বিত্তশালী কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ব করা হবে এবং সম্পত্তির কিছু অংশের আয় সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হবে।

## শাহজাহান (১৬২৭-১৬৬৬ খ্রিঃ)

বাবর প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয় শাহজাহানের রাজত্বকালে। শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি, সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষতা, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য শাহজাহানের রাজত্বকে বিখ্যাত করে রেখেছে। শাহজাহান শৈশবে পিতামহ সম্রাট আকবরের স্নেহে লালিত হন এবং সুরুচি সম্পন্ন মনের অধিকারী হন। শাহজাহানের রাজত্বকালের শিক্ষা সম্পর্কিত বার্ণিয়ারের বিবরণ অজ্ঞতা প্রসূত, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে, শাহজাহান একজন সংস্কৃতিবান নৃপতি ও মার্জিত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সব সময়ই যে কোন উৎস থেকেই আসুক না কেন সাহিত্য



www.pathagar.com

কর্মকে স্বীকৃতি দিতেন এবং সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করতেন। আমীর কাজউইনী (Amin Qazwini); আবদুল হাকিম শিয়ালকোটি হচ্ছেন তাঁর দরবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর পিতা ও পিতামহ কর্তৃক গৃহীত নীতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে পূর্ববর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমৃদ্ধি ছিল অব্যাহত। তাঁর আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে Mr. N.N.Law বলেন, "All the educational institutions, with their rich endowments, made by the previous emperors, nobles private gentlemen, continued unabated prosperityin his time."

সম্রাট স্বয়ং শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 'দারুল বাকা' নামক এক সময়ের জাঁকালো মাদ্রাসা তাঁর রাজত্বকালে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল। তিনি এটি পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং দিল্লীর প্রধান বিচারক মওলানা সদরুদ্দীন খান বাহাদুরকে পুনঃনির্মিত 'দারুল বাক' মাদ্রাসার পরিচালক নিযুক্ত করেন এবং ছাত্রদের সার্থক শিক্ষাদানের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর জামে মসজিদের দক্ষিণে প্রসিদ্ধ রাজকীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বি, পি, সাকসেনার মতে, তিনি দিল্লী ও আগ্রাস্থ কলেজসমূহের শিক্ষক নিয়োগ করতেন।

সম্রাট সুন্দর হস্তলিপি বিশারদ ছিলেন এবং শিল্পকলা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

**সাহিত্য ঃ** শাহজাহানের দরবারে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছিলেন "পাদশানামার" রচয়িতা আবদুল হামিদ লাহোরী, "শাহজাহান নামার" রচয়িতা ইনায়েত খাঁন, "আলম শাহীর" রচয়িতা মুহাম্মদ সালেহ। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ছিলেন আরবি, ফারসি ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তিনি ছিলেন জ্ঞান তাপস, উদারপন্থী ও অমায়িক। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে মেলামেশা করতেন এবং বেদান্ত ইহুদীদের তালমুদ, খ্রিস্টানদের নিউ টেস্টামেন্ট পাঠ করতেন। তিনি কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহায়তায় উপনিষদ ও অর্থবেদ ফারসিতে অনুবাদ করেন। এছাড়া দারাশিকো সফিনা আল আওলিয়া এবং মাজমূ-আল-বাহরাইন নামে দর্শন ও আওলিয়াদের ওপর দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

**সঙ্গীত ঃ** সম্রাট একনিষ্ট সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। এর ফলে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও রাগিনীর উদ্ভব হয়। যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেন যে, শাহজাহানের রচিত কতগুলো হিন্দি সঙ্গীত শ্রবণ করে দরবারে পূণ্যাত্মা সুফীগণ ভাব বিহবল হয়ে পড়তেন। তাঁর আমলের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে মুহাম্মদ সালিহ যদুনাথের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

**চিত্রকলা ঃ** হুমায়ুনের রাজত্বকালে মুঘল চিত্রকলার উন্মেষ হয়। জাহাঙ্গীরের আমলে এটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং শাহজাহানের রাজত্বে এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে



www.pathagar.com

থাকে। তাঁর আমলে প্রতিকৃতি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে। দারাশিকোর এলবাম শাহজাহানের আমলের চিত্রকলার একটি অনবদ্য সৃষ্টি। ফরিরুল্লাহ, মীর হাসান, অনুপ, চতর তাঁর চিত্রশালার পরিচালক ছিলেন এবং চিত্রমণি ছিলেন এ সময়ের বিখ্যাত চিত্রকর।

**আলমগীর (আওরঙ্গযেব) (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ)**

শাহজাহানের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন আওরঙ্গযেব। আওরঙ্গযেব একজন নিবেদিত প্রাণ, নিষ্ঠাবান ও আদর্শ মুসলিম হিসেবেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তাঁর রাজত্বকালে চিত্রশিল্প, স্থাপত্যকলা ও সাহিত্য চর্চা অব্যাহত ছিল। ঈশ্বরী প্রসাদের ভাষায়, 'কৃতি সেনাধ্যক্ষ এবং শাসক ছাড়াও তিনি একজন প্রকৃত অর্থে বিদ্বান ছিলেন।' তিনি মুসলিম ধর্মতত্ত্বের পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং নীতিশাস্ত্র, আরবি ব্যবহারতত্ত্ব এবং ফারসি সাহিত্যও তিনি নিবিড়ভাবে চর্চা করেন। সম্রাট আওরঙ্গযেব ছিলেন প্রখর মেধা শক্তি সম্পন্ন। তিনি সমস্ত কোরান শরীফ মুখস্থ বলতে পারতেন। তিনি স্বযং ফারসি ভাষায় চিঠি ও নথি পত্র লিখতেন। তিনি কবিতা রচনা করতে সক্ষম ছিলেন, তবে তা থেকে তিনি বিরত ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে, কবিগণ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। কোরান শরীফ তিনি সিকাস্তা ও নাসতালিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করেন।

**মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ** সমগ্র সাম্রাজ্যে তিনি বহু সংখ্যক মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান করেন। তিনি অধ্যাপকদের বেতনও শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। পণ্ডিতদের যোগ্যতানুযায়ী তাঁদের ভূমি দানের ব্যবস্থাও করেছিলেন বলে জানা যায়। সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশসমূহের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সমান মনোযোগী। বিশেষত গুজরাট প্রদেশের বোহরা সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য তিনি ছিলেন সমান মনোযোগী। বিশেষত গুজরাট প্রদেশের বোহরা সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন এবং তাদের জন্য মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তিনি রাজকীয় ফরমান জারী করেন যেন প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রজাসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে যত্নশীল। ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গুজরাটের পুরানো মক্তব ও মাদ্রাসা পুনঃনির্মাণ ও সংস্কারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেন। তিনি গুজরাটের দেওয়ানকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যেন তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সাহায্য করেন। তাঁরই আমলে শিয়ালকোট একটি শিক্ষাকেন্দ্র রূপে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

**রাজকীয় গ্রন্থাগার ঃ** ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামি আইনশাস্ত্র তাঁর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি রাজকীয় গ্রন্থাগারটিতে ইসলামিক আইন ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা বাড়ান।



www.pathagar.com

**ফতোয়া-ই-আলমগীরী ঃ** ধর্মশাস্ত্র ও আইনজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' মুসলিম আইনের ওপর নির্ভরযোগ্য আইন সংকলন। আইনজীবী ও বিচারকরা অদ্যাবধি মুসলিম আইনের উৎস হিসেবে এর ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। তথ্যবহুল এ গ্রন্থ তাঁর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়।

**কবি ও সাহিত্যিক ঃ** তাঁর রাজত্বকালে বেশ কিছু সংখ্যক কবি ও সাহিত্যিকদের আবির্ভাব শিক্ষা বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে। তাঁর রাজত্বকালে ৪৫ জন বিশিষ্ট কবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সবচেয়ে সেরা কবি ছিলেন সরমদ। এ কবিদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন লাহোরের বাসিন্দা। তন্মধ্যে চন্দর হুয়ান হচ্ছে একজন হিন্দু কবি। এ সময়ে আবদুল আযীয, আবদুল্লাহ, আবদুল করিম শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

**আলমগীর আওরঙ্গযেবের শিক্ষা দর্শন**

শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা-সহনশীলতা, শাসন-প্রশাসন, যুদ্ধরীতি-কৌশল, দক্ষতা ও কর্ম নৈপুণ্য, সততা, নিষ্ঠা ও মহানুভবতা ইত্যাদি গুণের দিক থেকে আওরঙ্গযেব নিঃসন্দেহে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম ছিরেন। শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিত্রকলা, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে তিনি উদার মনোভাব প্রদর্শন করেন। তিনি নিজে একজন নিষ্ঠাবান মুসলিমও ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই নিজে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন। তিনি প্রচলিত শিক্ষা দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা সম্পর্কে কতগুলো মৌলিক দর্শনের অধিকারী ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁর শিক্ষা দর্শনগুলো নিম্নরূপ ঃ

**ক. শিক্ষা হবে বাস্তবমুখী, জীবনকেন্দ্রিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ঃ** আওরঙ্গযেব যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা ছিল পুঁথিগত বিদ্যা। আরবি ও ফারসি ব্যাকরণ চর্বিত চর্বন। এ শিক্ষা বাস্তব সমস্যার কোন সমাধান করতে পারতো না। তিনি আক্ষেপ করে যা বলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর শিক্ষা দর্শনের রূপটি ফুটে উঠেছিল।

**খ. শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি ঃ** আওরঙ্গযেব যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা তাঁকে ভবিষ্যতে একজন সেনানায়ক, কুটনীতিবিদ ও রাষ্ট্র পরিচালক হিসেবে প্রস্তুত করেনি। তাই তাঁর সময়ে প্রাপ্ত শিক্ষার প্রতি অভিযোগ করেছিলেন। তিনি শিক্ষাকে ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতির ভিত্তি হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন।

**গ. বৈষয়িক শিক্ষা ঃ** শিক্ষা মানব সমাজের রীতি-নীতি, সমাজ ব্যবস্থা, ভৌগোলিক পরিবেশ, সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাকে প্রতিফলিত করবে। এজন্য তিনি ইতিহাস, ভূগোল ও ভূতত্ত্ব শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

**ঘ. ধর্মীয় শিক্ষা ঃ** শিক্ষা আত্মচেতনা, স্বদেশপ্রেম, নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করবে। এর ব্যবস্থা হিসেবে তিনি জাতীয় ইতিহাস, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি জোর দেন।



www.pathagar.com

**ঙ. মানব চরিত্র গঠনে সহায়ক ঃ** শিক্ষা মানব চরিত্রের রহস্য উদঘাটন করবে। মানব চরিত্র ও তার জটিল রহস্যসমূহ আবিষ্কারের ওপর তিনি জোর দিতেন।

**চ. শিক্ষা জগৎ ও জবিনের রহস্য উন্মোচন করবে ঃ** বিশ্ব জগত ও এ পৃথিবীর প্রাণিজগতের মূল রহস্য সৃষ্টিতত্ত্ব তার কার্যকারণসমূহ উদঘাটন, জগত ও জীবনের মধ্যে সংহতি ও সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদি জটিলতর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াসমূহ আবিষ্কার করে মানুষের অন্তর্চক্ষুকে উন্মোচন করাই হলো শিক্ষার অন্যতম কাজ।

**ছ. শিক্ষা হবে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ** সৈনিক, সেনানায়ক ও সম্রাট হিসেবে তাঁর মধ্যে যে দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রয়োজন ছিল তা তিনি শিক্ষকের মাধ্যমে লাভ করেন নি। অথচ বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতা অর্জন না করলে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা বড়ই দুষ্কর। শিক্ষার এ লক্ষ্যটি সম্পর্কেও আওরঙ্গযেব অবহিত ছিলেন।

**জ. শিক্ষা মানেই অনুধাবন ক্ষমতা ঃ** মুখস্থ বিদ্যা আওড়ানো কোন শিক্ষা নয়। কিন্তু আওরঙ্গযেব বাল্যকালে এ শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। শিক্ষার কাজ হলো কোন বিষয় সম্যকভাবে অনুধাবন করা।

উপরিউক্ত আলোর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সপ্তদশ শতাব্দীর এ মুঘল সম্রাট যে শিক্ষা দর্শন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণ তা আরও পরে অনুধাবন করেন। আওরঙ্গযেবের শিক্ষা দর্শনের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা দর্শনের গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে।



www.pathagar.com

# শিক্ষা কমিশনের আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষা

**(১৮৮২-২০০৪)**

**ইতিহাসের আলোকে শিক্ষা কমিশন ঃ** আমাদের উপমহাদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। প্রাচীন কালে আর্যদের শিক্ষা ব্রাহ্মণদের শিক্ষা, বৌদ্ধদের শিক্ষা এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যাপক ভিত্তিক চালু ছিল।

মোঘল শাসনের অবসানের পর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ শাসন লাভের পরও দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল।

১৮৩৫ সালের ২০ জানুয়ারি বড় লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক স্কটল্যান্ডবাসী মিশনারী শিক্ষাবিদ রেভারেন্ড উইলিয়াম এ্যাডমকে বাংলা ও বিহার বা প্রদেশের দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য শিক্ষা কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি (১৮৩৫-১৮৩৮) সালের মধ্যে বাংলা বিহার প্রদেশের দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে তিনটি রিপোর্ট পেশ করেন।

অতি প্রাচীনকাল থেকে এই উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে এই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সীমিত পরিসরে এবং নড়বড়ে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজরাই সর্বপ্রথম শিক্ষার একটা কাঠামোগত রূপ দান কর। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তারা প্রথম কাজ শুরু করে ১৭৯২ সালে। সেই সময় চার্লস গ্রান্ড কমিশনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করে ব্রিটিশ সরকার। এরপর ১৮১৩ সালে কোম্পানি সনদ, ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলে কমিটি, ১৮৩৮ সালে উইলিয়াম অ্যাডামস কমিটি, ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন, ১৮৩৪ সালে সার্জেন্ট কমিটি এ অঞ্চলের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে বিভিন্ন সময় রিপোর্ট পেশ করে শিক্ষানীতি দাঁড় করিয়েছিল। ব্রিটিশ পরবর্তী যুগে আসে পাকিস্তানীরা। ২৩ বছরের ইতিহাসে তারাও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কিছু নাড়াচড়া করে একটা রূপরেখা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানীদের এই



www.pathagar.com

প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি, ১৯৫২ সালে মাওলানা আকরাম খাঁ কমিটি, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান কমিটি, ১৯৫৯ সালে শরীফ কমিশন, ১৯৬৫ সালে হামিদুর রহমান কমিশন এবং ১৯৬৯ সাল নূর খাঁ কমিশন গঠনের মাধ্যমে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে রিপোর্ট করায় ছাত্রদের আন্দোলন কোনটাই বাস্তব রূপ লাভ করেনি। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষা ব্যবস্থার একটা সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরির জন্য ১৯৭২ সাল থেকে কাজ চলতে থাকে। ১৯৭২ সালে কুদরাত-এ খুদা কমিশনের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ১৯৭৭, ১৯৮৩, ১৯৮৬, ১৯৮৭, ২০০১, ২০০৩ এবং সর্বশেষ ২০১০ সাল পর্যন্ত শিক্ষার উপর ৮টি কমিশন গঠন করে শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়।



www.pathagar.com

# হান্টার শিক্ষা কমিশন ১৮৮২
## (প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন)

**পটভূমি ঃ** ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৮৮২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিপন কর্তৃক নিয়োগকৃত ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (Indian Education Commission, ১৮৮২ বা I.E.C) হান্টার কমিশন নামে পরিচিত।

**মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ** কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টা ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহার করার সুপারিশ করেন এবং বলেছিলেন যে, আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে সুযোগ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারি পক্ষের উদ্যোগী হওয়া উচিত। তবে যেসব জেলায় বেসরকারি প্রচেষ্টায় আদর্শ মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না, সরকারি উদ্যোগে জনস্বার্থে সেখানে অন্তত একটি করে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কমিশন স্বীকার করেন।

**"এ" কোর্স ও "বি" কোর্স ঃ** এ যাবৎকাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি হিসেবে একমুখী তত্ত্বগত বিষয় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। তাই কমিশন উচ্চমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমকে দুটো অংশে ভাগ করার পরামর্শ দেন। যথা 'এ' কোর্স ও 'বি' কোর্স। 'এ' কোর্সে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় ও "বি" কোর্সে থাকবে সাহিত্য বহির্ভূত, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয়।

**মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যম ঃ** মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কমিশন নীরব ছিলেন। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে, কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম করে শিক্ষা পরিচালনার পক্ষপাতি ছিলেন।



www.pathagar.com

## লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার (১৮৯৮–১৯০৪)

হান্টার কমিশনের প্রায় ১৫ বছর পর অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড়লাট হয়ে শিক্ষা সংস্কারের কাজে হাত দেয়ার পূর্বেই তিনি শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনার জন্য ১৯০১ সালে কাশ্মীরের সিমলায় এক শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে লর্ড কার্জন সমস্ত প্রদেশের শিক্ষা ডিরেক্টর এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের আহ্বান জানান। এই আলোচকগণ দীর্ঘ ১৫ দিন আলোচনার পর শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত ১৫০ টি প্রস্তাব প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকারে লর্ড কার্জন এ সমস্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

**২। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ঃ** গ্রান্ট ইন এইড প্রথার প্রবর্তনের পর থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রচেষ্টা অবাধ গতিতে বিস্তার লাভ করেছিল। তার ফলে বহু ক্ষেত্রে শিক্ষার মানের বিশেষ অবনতি ঘটে। এমন অনেক স্কুল ছিল যেগুলোতে অত্যন্ত নিম্নমানের শিক্ষাদান করা হতো। মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কার্যকারিতার দিক থেকে তাদের বিশেষ মূল্য ছিল না। শিক্ষার এ অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার রোধ করতে লর্ড কার্জন উপযোগী সিদ্ধান্ত নেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অনুসৃত নীতি হলো ঃ (১) শিক্ষার বিস্তারের নিয়ন্ত্রণ ও (২) শিক্ষার মানের উন্নয়ন।

**স্কুল অনুমোদন ঃ** মাধ্যমিক শিক্ষার অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কার্জন স্কুলগুলোতে অনুমোদন প্রথার প্রবর্তণ করেন। স্কুলগুলোর ওপর দু প্রকারের অনুমোদন প্রথা বলবৎ হয়। প্রথম-শিক্ষা বিভাগের, দ্বিতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের। এতে মাধ্যমিক শিক্ষার বাধাহীন প্রসার খর্ব হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিভাগের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্কুল পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্যও আরও অসুবিধা হতো। যুগ্ম অনুমোদন প্রথার প্রবর্তনে সে অসুবিধা দূর হলো। শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত স্কুলগুলো নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হয় ঃ

ক. সরকারি গ্রান্ট-ইন-এইড লাভ;

খ. সরকারি পরীক্ষাগুলোতে ছাত্র প্রেরণ;

গ. সরকারি ছাত্র-বৃত্তিভোগী ছাত্রদের গ্রহণ।

অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে পরবর্তীকালে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাণহীনতা ও যান্ত্রিকতার ছাপ দেখা দিয়েছিল। অনুমোদন শর্ত যথাযথ পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক স্বেচ্ছা সৃষ্ট বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়।



www.pathagar.com

**মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন ব্যবস্থা ঃ** কার্জন প্রচলিত স্কুলগুলোর শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্যও সচেষ্ট হন। তাঁর এ নীতিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে তিনি তিনটি প্রধান উপায় অবলম্বন করেন।

ক. সরকারি উচ্চ স্কুলগুলোকে আদর্শ মডেল স্কুলরূপে পরিচালনা করতে হবে এবং প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করে সরকারি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ. বেসরকারি বিদ্যালয় যাতে সরকারি মডেল স্কুলের উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারে, তার জন্য বিপুল পরিমাণ গ্রান্ট-ইন-এইড বিতরণের আয়োজন করা হবে। লর্ড কার্জন স্কুলের পরীক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে চান নি এবং এ নীতির ফলে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য দেয়ার নীতি ক্রমশই মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বিলুপ্ত হয়।

গ. মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার দিকে কার্জন অধিকতর মনোযোগ দিলেন। ১৯০৪ সালের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে তিনি নির্দেশ দেন যে, শিক্ষণ কলেজগুলোকে উন্নত করে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, এ ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

স্কুলভবন নির্মাণ, ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করা।

১. পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করা।

২. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানকে জোরদার করা।



www.pathagar.com

# স্যাডলার কমিশন
## (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন)

**পটভূমি ঃ** ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ, এর গঠনমূলক নীতি ও সমস্যা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনকে স্যাডলার কমিশন বলা হয়। সভাপতি ডঃ মাইকেল স্যাডলারের নামানুসারে এ কমিশন "স্যাডলার কমিশন" নামে পরিচিত। এ কমিশনের ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার জিয়াউদ্দিন্‌আহমদ (পরে তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন ডঃ গ্রেগরি, স্যার ফিলিপ হার্টগ, প্রফেসর রামজে মুইর। ১৯১৯ সালে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ কমিশনের রিপোর্ট আন্তঃপ্রাদেশিক গুরুত্ব বহন করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করার লক্ষ্যে এ কমিশন গঠিত হলেও এর উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। কমিশন মনে করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার মানের উপর উচ্চ শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে বিধায় মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার না করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। উচ্চ স্তরের শিক্ষা সংস্কারের জন্য প্রতিবেদন পেশ করতে গিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রেও এ কমিশন প্রতিবেদন পেশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য স্যাডলার কমিশন গঠিত হলেও সঠিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে এ কমিশনের পেশকৃত প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

**মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ** স্যাডলার কমিশন মনে করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের ওপর উচ্চ শিক্ষার সংস্কার নির্ভর করে। এ জন্য কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ পেশ করেন।



www.pathagar.com

১. ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার পরিবর্তে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাই মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে ভিভাজক রেখা নির্ণয় করবে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করা যাবে।

২. ডিগ্রী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস আলাদা করে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এ কলেজসমূহ আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অথবা নির্ধারিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে পরিচালিত হতে পারে। এ ধরনের নতুন কলেজে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষক শিক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

৩. মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রদেশে মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড গঠিত হবে এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। মিশন আশা করেন যে, প্রস্তাবিত বোর্ড গঠিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের ভার লাঘব হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়া সম্ভব হবে।

## সার্জেন্ট পরিকল্পনা – ১৯৪৪

**পটভূমি ঃ** উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে বিতাড়িত হওয়ার পূর্বে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যায়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা (Central Advisory Board of Education) ১৯৪৩ সালে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের তদানীন্তন শিক্ষা উপদেষ্টা জন সার্জেন্টকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি তার রিপোর্ট দাখিল করেন ১৯৪৪ সালে। এই রিপোর্টটিকে বলা হয় যুদ্ধ পরবর্তী এ উপমহাদেশের শিক্ষক উন্নয়ন রিপোর্ট। এই কমিটি নতুন কোন শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেননি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা ইতোপূর্বে যেসব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে মূলত সার্জেন্ট রিপোর্ট হলো সেগুলোরই পূর্ণাঙ্গ রূপ। কমিটির লক্ষ্য ছিল অন্তত ৪০ বছরের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষার মানকে সমসাময়িকভাবে ইংল্যান্ডের শিক্ষামানের পর্যায়ভুক্ত করা।

## মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে সার্জেন্ট কমিটি প্রদত্ত সুপারিশগুলো হল–

১. ছাত্রদের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সাধারণ বয়স এগার বছর হওয়ার চাই এবং এ স্তরে ছয় বছর ব্যাপী অধ্যায়ন করতে হবে। বিবরণীতে ছাত্রদের নির্বাচন করার জন্য কতকগুলো সাধারণ নিয়মও উল্লিখিত হয়।



www.pathagar.com

২. মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। তবে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা (Second Language) হিসেবে প্রবর্তন করা হবে। একাডেমিক বিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষা দেবে আর টেকনিক্যাল বিদ্যালয় প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করবে।

৩. উভয় ধরনের বিদ্যালয়ের জন্য সার্জেন্ট বিবরণীতে পাঠ্যসূচিও নির্ধারিত হয়।

৪. উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কমিশন মন্তব্য করেন যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করা মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ শিক্ষার পর যাতে অধিকাংশ ছাত্ররা সমাজে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।



www.pathagar.com

# শরীফ কমিশনের রিপোর্ট (১৯৫৮)

**পটভূমি ঃ** ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের সুপারিশ করে। অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কারের জন্য গঠিত দুটি কমিটির রিপোর্টে শিক্ষা উন্নয়নের বিভিন্ন সুপারিশ করলেও তা বাস্তবায়ন হয় নি। এমনিভাবে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চলতে থাকে। পরবর্তীতে শিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কারে দাবি ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করে। কাজেই একটা সুসংবাদ উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর এস, এম শরীফকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যানের নামানুসারে ইহা 'শরীফ কমিশন' নামে পরিচিত। ১৯৫৯ সালে ৫ জানুয়ারি এর উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কমিশনকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে জাতীয় চাহিদা পূরণের উপযোগী করে সংগঠনের সুপারিশ করতে বলেন। কৃষি, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নয়ন চরিত্র গঠন, শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সুপারিশ করার জন্য তিনি কমিশনকে অনুরোধ করেন।

কমিশন শীঘ্রই শিক্ষার স্তর, পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে পাকিস্তানের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, সাময়িক বেসাময়িক কর্মচারী ও সর্বস্তরের জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে কমিশন সুচিন্তিত অভিমতসহ সুপারিশ প্রণয়নের কাজ শেষ করে ১৯৬০ সালে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন।

**শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ** কমিশনের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুসারে শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তোলা। শিক্ষা সমাজ ও ব্যক্তিকে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে নেয়ার সহায়ক হবে, গড়ে তুলবে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। পাকিস্তানের স্বাধীনতা



www.pathagar.com

ও সংহতির সাথে সম্পৃক্ত ইসলামি মূল্যবোধ সংগঠিত হবে শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎস ও পুঁজি সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। শিক্ষার মাধ্যমেই উন্নীত হবে কারিগরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। একটি প্রগতিশীল ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশের সংক্ষিপ্তসার হল ঃ

১. একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষান্তর হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এ স্তরের শিক্ষা এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সমাপ্তির পরে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পারদর্শী হতে পারে।

২. এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে একজন নাগরিক, কর্মী এবং দেশপ্রেমিক হিসাবে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে তুলতে হবে।

৩. নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা বলা হবে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক না করা পর্যন্ত ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে থাকবে। মাধ্যমিক স্তরকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে।

ক. অন্তর্বর্তী শিক্ষা–৬ষ্ঠ হতে ৮ম মান

খ. মাধ্যমিক নবম ও দশম শ্রেণী এবং

গ. উচ্চ মাধ্যমিক একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী মিলিয়ে।

এ শিক্ষা সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্তে বলা হয় সাধারণ শিক্ষার সাথে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি পেশাভিত্তিক শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। পূর্বে আরোপিত শর্ত না মানার ফলে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় হয়েছে যাতে শিক্ষক, ঘর দরজা ও এবং সাজসরঞ্জাম নেই। শিক্ষার মানেরও অবনতি ঘটেছে। কাজেই মঞ্জুরী দানের শর্ত সঠিকভাবে পালনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থসংস্থানের জন্য কমিশনের সুপারিশ মতে ৬০% ছাত্র বেতন ২০% বিদ্যালয় পরিচালকদের দান এবং ২০% সরকারি সাহায্য দিবে। সরকারি সাহায্য এবং মঞ্জুরী দানের বেলায় শর্ত পালন অত্যাবশ্যক বিবেচিত হবে।

**আকরাম খান কমিটি (১৯৫১)**

একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ সালে একটি শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিকে বলা হয় পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি। এ কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ মাওলানা আকরাম খান। তাই এ কমিটির ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর সুপারিশ পেশ করে।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষে ২টি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। এর একটি হচ্ছে পাকিস্তান এবং অন্যটি ভারত। স্বাধীন দেশের জন্য একটি শিক্ষা



www.pathagar.com

ব্যবস্থা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপঃ

১. ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজ ভাবাপন্ন অনুগত্য একদল কর্মচারী তৈরি করা,
২. জাতীয় ভাষারূপে কোন ভারতীয় ভাষা তখনও স্বীকৃতি পায়নি,
৩. ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে সরকার কোন দিনও সমাজ সংস্কারে সচেষ্ট ছিল না,
৪. ধর্মের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ছিল নিরপেক্ষ,
৫. গণশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি উদাসীন ছিল সুস্পষ্ট। তখন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক অর্থ ব্যয় করা হত এবং প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিত ছিল।
৬. ব্রিটিশ সরকার এ দেশকে কাঁচামাল যোগান ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত করে।

সংক্ষেপে দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসন আমলে এদেশের শিক্ষা ছিল পুঁতি সর্বস্ব ও পরীক্ষা কেন্দ্রিক। তখন এদেশের শিক্ষিত যুবকগণ বেকারত্বের অভিশাপে ভুগছিলেন। তাই জাতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে জীবন ও সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। উল্লিখিত অবস্থা দূরীকরণের জন্য স্বাধীন দেশে শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভূত হয়।

**মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা**

১. ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল আরও ৬ বছরের হতে হবে এবং ভর্তির স্বাভাবিক বয়স প্রায় ১১ বছর হতে হবে।
২. উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা ২ ভাগে বিভক্ত হতে হবে। যেমন– ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক ধাপ এবং নবম থেকে একাদশ শ্রেণী উচ্চ মাধ্যমিক ধাপ।
৩. বর্তমানে প্রচলিত মহাবিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ধাপটি বিলুপ্ত করতে হবে এবং এর একটি শ্রেণীকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করে এবং অপরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রীর কোর্সের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
৪. উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্যশাখায় ভর্তি ছাত্রদের মেধা ও দক্ষতা নির্ণয়ের ভিত্তিতে হতে হবে।
৫. ছাত্রদেরকে নিম্ন মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাদের শিক্ষাক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে।



www.pathagar.com

৬. মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে।

৭. যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অথবা উচ্চ কারিগরি অথবা বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদার্পণ করবে তাদেরকে ইংরেজি ভাষা ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে পড়তে হবে।

৮. নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। রাষ্ট্র ভাষার একটা সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত উর্দু অথবা আরবি শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।

৯. ধর্মকে মুসলমান ছাত্রের জন্য বাধ্যতামূলক বিষয় করতে হবে। অমুসলমানদের ক্ষেত্রে ন্যায় এবং নৈতিকশাস্ত্রকে সাধারণ বিষয় হিসেবে দেয়া যেতে পারে যদি তারা তাদের স্বীয় ধর্মে অধ্যয়ন করতে না চায়।

১০. শারীরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের প্রবর্তন করতে হবে। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে উচ্চ মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা অবিচ্ছেদ্য করতে হবে।

১২. প্রাচীন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাসূচি পর্যন্ত (অষ্টম শ্রেণী) সংযুক্ত করতে হবে।

১৩. মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন–

ক. পৃথক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

খ. পৃথক উচ্চ বিদ্যালয়।

গ. সংযুক্ত নিম্ন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে প্রয়োজন সেখানে রাখা যেতে পারে।

১৪. সরকারকে উপযুক্ত স্থানে কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করে কম্প্রিহেনসিভ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৫. সরকারকে প্রত্যেক মহকুমায় আধুনিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে অন্ততপক্ষে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং এ বিদ্যালয়সমূহে স্থানীয় অবস্থার ওপর নির্ভর করে যতগুলো বিভাগ বা বিষয় ন্যায্য মনে হয় তার প্রবর্তন করতে হবে। সরকারের সরাসরি অনুদান কোন স্থানের অবস্থার ওপর নির্ভর করে বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক এবং ছাত্রের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আবাসিক ব্যবস্থাও করতে হবে।



www.pathagar.com

১৬. অন্যান্য স্থানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত স্বেচ্ছাশ্রম একটি পরিকল্পনার ভিত্তিতে সরকারের সুবিবেচনার মধ্যে থাকবে। শিক্ষার্থীর চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রদেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে এ বিদ্যালয়সমূহ প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহার করা যায়।

১৭. নিম্নবর্ণিত ফল লাভের লক্ষ্যে বর্তমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একটি জরিপকার্য পরিচালনা করতে হবে।

ক. অযোগ্য এবং নিস্প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়সমূহকে অপসারিত পুনর্বন্টিত বা সংযুক্ত করা।

খ. বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

১৮. মহকুমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় ভারের অন্ততপক্ষে ৫০% সরকারের বহন করা উচিত।

১৯. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১৮,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২০. বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন স্কেল যতদূর সম্ভব সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমসাময়িক হতে হবে্এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২১. প্রত্যেক মহকুমার প্রধান কার্যালয়ে একজন মহকুমা শিক্ষা অফিসার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবেন।

২২. প্রদেশের প্রদান কার্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একজন সহপরিচালক থাকতে হবে।

২৩. বর্তমান বিদ্যালয়ের মহিলা পরিদর্শকের পদটি পরিবর্তিত করে নারী শিক্ষার সহকারী পরিচালিকার পদে রূপান্তরিত করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক জেলায় মহিলা শিক্ষা অফিসার থাকতে হবে।

২৪. গণশিক্ষা পরিচালকের উপাধি পরিবর্তন করে শিক্ষা পরিচালকে রূপান্তরিত করতে হবে।

২৫. প্রদেশের ছয়টি রেঞ্জ পরিদর্শকের (Range Inspector) পদ অবলুপ্ত করে ১৫ জন জেলা পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং এ পদগুলো জেলা শিক্ষা অফিসার পদে রূপান্তরিত করতে হবে। জিলা শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী থাকবেন।

২৬. শিক্ষা পরিদপ্তরে কিছুসংখ্যক বিশেষ পদ সৃষ্টি করতে হবে। বিজ্ঞান, কারিগরি ও বাণিজ্য বিষয়ে পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিদর্শকের জন্য নতুন পদসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দও নিয়োজিত থাকবেন।



www.pathagar.com

# আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৫৭

**পটভূমি ঃ** ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আকরাম খান শিক্ষা কমিশন ১৯৫২ এর সংস্কার প্রস্তাবসমূহের অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান। এ রিপোর্টটি ১৯৫৭ সালের আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত।

**মাধ্যমিক শিক্ষা**

মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ শ্রেণী পর্যন্ত ১১ বছরের অর্থাৎ পাঁচ বছর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার পর ছয় বছর ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার কোর্স চালু করতে হবে।

২. মাধ্যমিক কোর্সের প্রথম তিন বছর নিয়ে জুনিয়র হাইস্কুল এবং পরবর্তী তিন বছর নিয়ে সিনিয়র হাইস্কুল অথবা পূর্ণ ছয়টি শ্রেণী নিয়ে সিনিয়র হাইস্কুল স্থাপন করতে হবে।

৩. সিনিয়র ও জুনিয়র হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ও চালু করা যেতে পারে।

৪. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদেশের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হবে। প্রতি ৫০ হাজারে জনসংখ্যা অনুপাতে একটি সিনিয়র হাইস্কুল এবং প্রতি পঁচিশ হাজার লোকের বসতি-পূর্ণ এলাকায় একটি জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. সরকারের অনুদান ব্যতিরেকে কোন স্কুল পরিচালিত হতে পারবে না।

৬. সমগ্র দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের বেতনের হার সমহারে থাকবে।



www.pathagar.com

৭. শিক্ষার প্রতি মেয়েদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সিনিয়র হাইস্কুলের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত তাদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

৮. সিনিয়র হাইস্কুলে বাছাইয়ের মাধ্যমে এমন শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে হবে যারা শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ লাভে সমর্থ হবে।

৯. মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা বাহন রূপে ব্যবহৃত হবে এবং মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১০. জুনিয়র হাইস্কুলের পাঠ্যক্রমে ভাষা, সমাজ পাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, ধর্ম শিক্ষা অথবা নীতি শিক্ষা, চিত্রকলা, সঙ্গীত, হস্তশিল্প, শরীর চর্চা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি থাকবে। এগুলোর মধ্যে ভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজ পাঠ ওএ কটি হস্তশিল্প আবশ্যিক বিষয়রূপে গৃহীত হবে।

১১. সিনিয়র হাইস্কুলে বহুমুখী পাঠ্যক্রম থাকবে। যেমন- মানবতামূলক তত্ত্বশিক্ষা, বিজ্ঞান, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলামিকশাস্ত্র (Islamic Studies) প্রভৃতি।



www.pathagar.com

# কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭২

**পটভূমি ঃ** স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রক্তঝরা দিনগুলোর সীমাহীন ত্যাগ ও কঠোর বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে জনজীবনে অর্থবহ করতে হলে ইংরেজ প্রবর্তিত ও পাকিস্তান আমলে প্রচলিত শিক্ষা যে যুগের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নয় তা বলাই বাহুল্য। তাই সর্বমহল থেকে শিক্ষা সংস্কারের দাবি উঠেছে। বাংলাদেশের জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে হলে জনগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে, যাতে জনগণ দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সত্যিকার জনসম্পদে পরিণত হতে পারে। এ দেশের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলে অনেক প্রতিবন্ধকতা এসেছিল। এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এ দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন জাতি নিকট মৌলিক দায়িত্ব।

২৬ জুলাই, ১৯৭২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির নানাবিধ অভাব ও ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশনা এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথনির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এ কমিশন নিয়োগ করেন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরামর্শ দানের জন্য কমিশনের সদস্যদের আহবান জানান। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। সভাপতির নাম অনুসারে এই কমিশন কুদরত-ই-খুদা এই কমিশন নামে পরিচিত। বিভিন্ন পেশার লোকদের নিকট থেকে কমিশন প্রশ্নমালার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত মূল্যবান অভিমত সংগ্রহ করেন। কমিশন অভিমতগুলো ব্যাপক পর্যালোচার পর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে সুচিন্তিত সুপারিশ প্রণয়ন করেন এবং ৩০ মে, ১৯৭৪ তা রিপোর্ট আকারে সরকারের নিকট পেশ করেন।



www.pathagar.com

**মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ** ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের ব্যাপ্তি, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, কাঠামো, শিক্ষাক্রম, মাধ্যমিক পর্যায়ের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষা বা শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর মতামত প্রদান ও নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।

**মাধ্যমিক শিক্ষা কী বা মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের ব্যাপ্তি ঃ** মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষা-কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ও প্রথম ডিগ্রী শিক্ষার পূর্ববর্তী স্তর হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা কৈশোর ও কৈশোরোত্তারকালের শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। আর এই শিক্ষার উৎস বা উৎপত্তি হচ্ছে অতীতের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বা অতীতের সরকার, মিশনারী ও ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগ।

**মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য/বৈশিষ্ট্য ঃ** ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট উল্লিখিত মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে গঠিত বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্বকে পরিমাণে এবং পরিসরে বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সুসংহত করতে হবে।

২. সুসমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবনযাপনের জন্য সচেতন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ ও প্রগতিশীল জীবন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা। উক্ত উদ্দেশ্যের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সমাজের একজন সদস্য এবং সমাজের অন্য সবার সাথে মিলে মিশে তাকে বসবাস করতে হবে। এর জন্য দরকার কর্তব্য প্রতিপালন এবং কুসংস্কারমুক্ত মনমানসিকতা।

৩. দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা। কারণ অতীতের পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে জনসম্পদে পরিণত না করে জনদায়ে পর্যবসিত করেছে। তাই দেশের সমৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে।

৪. মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা। উন্নয়নশীল দেশে সবার জন্য শিক্ষা বিলাসিতা। তাই কমিশন শুধু মেধাসম্পন্নদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুপারিশ করেছে।

**মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কমিশনের সুপারিশ**

১. মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠন-মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের সংগঠনের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর ধরে নবম শ্রেণী থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায় বলে গণ্য করা যায় অর্থাৎ যে সব শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক কোর্স গ্রহণ করবে তাদের জন্য মাধ্যমিক স্তর হবে একাদশ পর্যন্ত এবং যারা সাধারণ কোর্স নেবে তাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা হবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।



www.pathagar.com

২. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে পূর্ণাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণকরণ-এতদউদ্দেশ্যে একই শিক্ষায়তনে তিন/ চারটি শ্রেণীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ এতে শিক্ষাক্রমের যোগসূত্র বজায় থাকবে এবং শিক্ষায় সমতা নিশ্চিত হবে। তাছাড়া একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি মনোবিজ্ঞান সম্মত। কারণ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের পরিবেশ বিচ্ছিন্ন।

৩. উক্ত অবস্থার অবসানকল্পে কমিশন ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন না করে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার সুপারিশ করেছে। এতে করে নতুন মাধ্যমিক খোলার ব্যয়বার অনেকাংশে লাঘব হবে।

৪. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচি জীবন-ঘনিষ্ঠ করণ ঃ কমিশনের মতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষের মত ছাত্রছাত্রী নানা কারণে স্কুলের পড়াশুনা ত্যাগ করে ফলে জনদায় হয়ে ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করে। তাই কমিশন স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মধারা ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচি পরিমার্জনের সুপারিশ করেছে।

৫. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর প্রান্তিক শিক্ষা স্তর ঃ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা এবং স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে বিবেচিত হবে। এ উদ্দেশ্যে কমিশন ও স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে।

৬. কমিশন নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষা কার্যক্রমকে দু ভাগে ভাগ করেছে। যথা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা।

৭. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উল্লিখিত সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি প্রথম দুটি উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নবম ও দশম শ্রেণীতে উভয় ধারায় কয়েকটি বিষয় আবশ্যক পঠনীয় হিসেবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আবশ্যিক বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্বনির্বাচিত ধারায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করবে।

৮. দশম শ্রেণী শেষে উভয় ধারার শিক্ষার্থীরা বহিঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে।

৯. দশম শ্রেণীর পর সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষার্থীরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নির্ধারিত বহুমুখী সাধারণ শিক্ষাক্রমসমূহের যে কোন একটিতে শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবে এবং শিক্ষা সমাপনান্তে বহিঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। অপরপক্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর বৃত্তি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজন মত একাদশ শ্রেণীতে এক বছর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে এবং বহিঃপরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে এবং সার্টিফিকেট পাবে।



www.pathagar.com

১০. বৃত্তিমূলক শিক্ষাস্তরও হবে প্রান্তিক শিক্ষাস্তর। অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রান্তিক শিক্ষা লাভের পর মধ্যস্তরের জনশক্তিতে পরিণত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৭৩-৭৮) শিক্ষার্থীদের বিশ ভাগকে এবং পরবর্তী পরিকল্পনায় অন্তত পঞ্চাশ ভাগকে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নিয়ে আসতে হবে।

১১. কমিশন আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের সুপারিশ করে। কমিশন আঞ্চলিক সমবায় সংস্থা গঠনেরও সুপারিশ করেছে।

১২. কমিশনের মতে দেশের ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে নবম-দশম ও একাদশ শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তিত করতেহ বে।

১৩. কমিশন মাধ্যমিক স্তরের জন্য নিম্নোক্ত শিক্ষাক্রম সুপারিশ করেছে ঃ

**শ্রেণী : নমব ও দশম**

| কলা বিভাগ | | বিজ্ঞান বিভাগ | | বৃত্তিমূলক | |
|---|---|---|---|---|---|
| বাংলা | ২০০ | বাংলা | ২০০ | বাংলা | ২০০ |
| ইংরেজি | ১০০ | ইংরেজি | ১০০ | ইংরেজি | ১০০ |
| গণিত | ১০০ | গণিত | ১০০ | গণিত | ১০০ |
| সাঃ বিজ্ঞান | ১০০ | পদার্থবিদ্যা | ১০০ | সাঃ বিজ্ঞান | ১০০ |
| ইতিহাস | ১০০ | রসায়ন | ১০০ | বৃত্তিমূলক | ৫০০ |
| ভূগোল | ১০০ | ঐচ্ছিক ৩টি | ৩০০ | | |
| নৈবাচনিক বিষয় ২টি | ২০০ | বৃত্তিমূলক ১টি | ১০০ | | |
| বৃত্তিমূলক বিষয় ১টি | ১০০ | | | | |
| মোট | ১০০০ | মোট | ১০০০ | মোট | ১০০০ |

১৪. ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশের কিচুসংখ্যক শিক্ষায়তনে একাদশ শ্রেণী খোলার এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর সুপারিশ করেছে।

১৫. শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়ার পাঁচ বছর পর শিক্ষা মানোন্নয়ন সম্পকে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার অভিমত প্রকাশ করেছে।

১৬. কমিশনের মতে আগামী পাঁচ বছরে শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নীত হলে দশ বছরের স্কুর শিক্ষার পর প্রথম ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।



www.pathagar.com

**জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৭**

১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে ২৭ সদস্যের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন বিভিন্ন সেমিনার, বৈঠক ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের পরামর্শ গ্রহণ করে। তদুপরি ইউনেস্কোর সৌজন্যে কমিশনের দুই সদস্যের দু'টি কমিটি থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপিনস এবং জাপান ভ্রমণ করে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অতঃপর ১৯৮৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি দেশের শিক্ষা সংস্কার, পুনর্বিন্যাস এবং উন্নয়নের দিকনির্দেশনা সম্বলিত সুচিন্তিত রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টের বিভিন্ন দিক ও সুপারিশসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

**মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ** প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যবর্তী শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলা হয়। ইহা শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ। সাধারণত ১১ থেকে ১৭/১৮ বয়ঃক্রমের শিক্ষার্থীরা এ স্তরে শিক্ষা লাভ করে। এ সময় কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বর্ধন ও বিকাশ ঘটে। কাজেই এ সময়ের শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ** এ স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সুসংহত করা। বিভিন্ন পঠিতব্য বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান দান, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কর্তব্য নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা অর্জন। সুনাগরিকের কর্তব্য সচেতনতা বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা এবং মেধা ও সম্ভাবনার স্ফুরণ। মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিখ্ষা গ্রহণ উপযোগী করা এবং যুক্তি ও চিন্তায় বিশ্বাসী করে পরমসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি, সমাজ ও বিশ্বে উন্নত জীবন যাপনে সমর্থ এবং উত্তম পেশার উপযোগী করে গড়ে তোলা। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে সক্ষম করা।

**প্রেক্ষাপট/বর্তমান অবস্থা ঃ**

আমাদের শিক্ষা কাঠামো হল নিম্ন মাধ্যমিক তিন বছর, মাধ্যমিক দুই বছর ও উচ্চ মাধ্যমিক দুই বছর (৩+২+২ = ৭)। এ পর্যায়ে প্রায় দশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।

এ দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। শিক্ষকদের বেতনের ৭০%, ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া এবং ১০০ টাকা চিকিৎসা বাতা সরকার বহন করে। তবে বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য সরকার প্রদত্ত অনুদান পর্যাপ্ত নয়।

**সমস্যা ঃ** শিক্ষকের পদের শূন্যতা শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা এবং বিদ্যালয় কক্ষের অনুপযুক্ততা। আসবাবপত্র, শিক্ষোপকরণ, পুস্তক, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও পরিদর্শকের অভাব। বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অপর্যাপ্ততা, পরিচালনার ক্ষেত্রে বস্তুগত ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার অভাব। ম্যানেজিং কমিটির নির্লিপ্ততা, শিক্ষক অভিভাবকের নিয়মিত সংযোগ এবং উন্নয়ন কাজে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের সাথে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ের অভাব।



www.pathagar.com

**সমাধান ঃ** এসব সমস্যার মধ্যেই সমাধানের সূত্র নিহিত আছে। শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ, গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় উন্নয়ন এবং নিয়মিত পরিদর্শন ও ম্যানেজিং কমিটির ঘন ঘন মিটিং এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক জোরদার করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে উন্নয়নমূলক তদারকির দায়িত্ব প্রদান এবং স্থানীয় উদ্যোগ ও আর্থিক সহায়তা লাভের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ক্রমান্বয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ের বেতন ভাতার পুরোটা সরকার কর্তৃক বহন, অনুদান বৃদ্ধি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

স্নাতক পর্যায়ে অনেক বিষয় প্রবর্তনের ফলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গণিত ও পদার্থের পরিবর্তে সহজ বিষয় নিয়ে পাস করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। কাজেই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কমিশনের সুপারিশ :

১. স্নাতক কোর্সে কমপক্ষে দুটি স্কুল বিষয় নিয়ে পাস করা ব্যক্তিকে বি. এড. কোর্সে অগ্রাধিকার দান।
২. তিন বছরের বি. এড. কোর্স চালু করে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানে আগ্রহীদেরকে দুটি স্কুল বিষয়ে দক্ষ করে তোলা।

উচ্চ মেধার শিক্ষার্থীদের জন্য ইংল্যান্ডে পাবলিক স্কুর, চীনে কী স্কুল, ভারতে নভোদর বিদ্যালয় আছে। আমাদের দেশে মেধাবীদের মেধার অপচয় হচ্ছে এবং সাধারণ ও নিম্নমেধার শিক্ষার্থী তাদের উপযোগী উৎপাদনমুখী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সকলের মূল্যায়ন হয় একই প্রান্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। অগ্রসর পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা নেই। কাজেই উচ্চ মেধার শিক্ষার্থীদের লালন ও নিম্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বাড়তি সময়ে নিরাময়মূলক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কমিশনের সুপারিশ।

১. ১০টি ক্যাডেট কলেজ, ১টি আবাসিক কলেজ এবং কোন কোন ল্যাবরেটরী স্কুলকে বিশেষ ধরনের মেধার স্কুলে রূপান্তর করে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন রাখা উচিত। এতে মেধাভিত্তিক ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। দরিদ্র মেধাবীদের শিক্ষার খরচ বহন করবে সরকার। এ স্কুলগুলোর পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি উচ্চ শিক্ষার অনুরূপ হবে।
২. পুরাতন জেলা শহরে কিছু নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করে মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।
৩. নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীর বাড়তি শিক্ষার সুযোগ নিজ নিজ বিদ্যালয়েই সৃষ্টি করতে হবে। যে সকল শিক্ষক নিরাময়মূলকপ াঠদান করবে তাদের মাসিক বেতনের অতিরিক্ত সম্মানী থাকবে। কোন প্রাইভেট টিউশনি থাকবে না।



www.pathagar.com

৪. এস. এস. সি, এইচ. এস. সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর জন্য যথাযথ বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করে উৎপাদনমূলক কার্যক্রমে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে।

**পুনর্বাসন ঃ**

মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ ঃ

১. উপদেশ ও নির্দেশনার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদানকারী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

**পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ঃ** সারা বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা, অভীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণ এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় বহিঃপরীক্ষার সাথে আন্তঃপরীক্ষার ফলাফলকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ব্যপ্তি এবং তীক্ষ্নতা যাচাই ও সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষায় অসদুপায় বন্ধের জন্য নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অনুপাত বৃদ্ধি করতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে রচনামূলক ৫০% ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের হার ৫০% হবে। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে রচনাধর্মী ৪০% এবং নৈর্ব্যক্তিক ৬০% হওয়া উচিত। বিশেষ কমিটির পরিচালনায় প্রশ্ন তৈরি ও অভীক্ষা দ্বারা আদর্শায়িত করে শিক্ষা বোর্ড ও টেক্স্ট বুক বোর্ডের আওতাধীন বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। সমতা রক্ষার জন্য প্রতি বিষয়ে কয়েক সেট প্রশ্ন থাকবে। বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নের সাহায্যে আন্ত এবং প্রান্তিক পরীক্ষা নেয়া হবে। পরিদর্শকগণ এসব পরীক্ষায় সঠিকপ দ্ধতি অনুসরণ করছে কিনা তা তদারক করবে। উপযুক্ত পারিশ্রমকি দিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা উত্তর পত্র মূল্যায়ন করতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত ফলাফল উন্নয়ন পরীক্ষা এবং শ্রেণী বিভাগ চালু থাকবে। তবে ভবিষ্যতে গ্রেড পদ্ধতি চালু করার চিন্তা ভাবনা করা উচিত। বেশি পক্ষে দু'টি বিষয়ে অকৃতকার্য হরে পুনঃপরীক্ষা দিতে পারবে। কিন্তু পরপর তিন বছরের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। একটি 'পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা' স্থাপন করে পরীক্ষার পদ্ধতি সংস্কার করতে হবে। এই সংস্থা বিজ্ঞান সম্মত প্রশ্ন প্রণয়ন, প্রশ্ন ব্যাঙ্কের দায়িত্ব বহন, বহিঃরক্ষা, আন্তঃরক্ষা, তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল সমন্বয় সাধন, উত্তরপত্র মূল্যায়নে কম্পিউটার ব্যবহার এবং গবেষণালব্দ অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সংস্কারের পরামর্শ দিবে। এই গবেষণা পরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীলতা বিকাশের বিভিন্ন দিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় আদর্শ অভিজ্ঞতা প্রস্তুত ও নতুন ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনেরব ব্যবস্থা করবে।

**পরীক্ষা কেন্দ্র ঃ** পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও যোগযোগ ব্যবস্থা বিবেচনা করে পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারিত হবে। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র প্রতি থানায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র প্রতি জেলা সদরে হওয়া উচিত। তবে থানা



www.pathagar.com

কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নীতিগতভাবে পরীক্ষার্থী নিজেদের প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে পারবে না এবংপ রীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন করা যাবে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে প্রচারণা প্রয়োজন। কার্যকর তদারকি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা পরীক্ষার কেন্দ্রের নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে। পরীক্ষায় দুর্নীতি সম্পর্কীয় আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

২. অভ্যন্তরীণ তত্ত্বধান জোরদার করার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে দু'জন সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করে একজনকে পাঠক্রমিক এবং অন্যজনকে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের দায়িত্ব দিতে হবে। কলেজেও দু'জন উপাধ্যক্ষ থাকবে। তাঁদেরকে একই রকম দায়িত্ব দিতে হবে।

৩. পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বিদ্যালয়ে প্রশস্ত আয়তনের শ্রেণীকক্ষ, প্রশাসনিক কক্ষ, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ, স্টাফ ও শিক্ষার্থী কমন রুম, কৃষি জমি, খেলার মাঠ ইত্যাদি থাকতে হবে।

৪. বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, শিল্প এলাকা, জাদুঘর ইত্যাদিতে শিক্ষা সফর, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার জন্য টীম ও হবি ক্লাব গঠন, প্রতিদিন খেলাধুলার ব্যবস্থা, সুস্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা, বিদ্যালয় সমবায় সেন্টার গঠন, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে যোগদান, শ্রেণীকক্ষে শ্রবণ-দর্শন উপকরণ ব্যবহার, প্রতিবছর পহেলা মার্চ শিক্ষক দিবস পালন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং সুসম্পর্ক গড়ে তুলে আর্থসামাজিক উন্নয়নে শিক্ষাকে অর্থবহ করতে হবে।

**প্রাইভেট টিউশন ঃ** প্রাইভেট টিউশনির মত নীতিগর্হিত কাজ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শ্রেণীতে পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ক্লাস ও টিউটরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করে সম্মানী প্রদান, প্রাইভেট টিউশনের বিরূপ ক্রিয়া সম্পর্কে অভিভাবকগণকে সচেতন করা, বাঃসরিক কর্মসূচি অনুযায়ী পাঠদান, পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহার, ঘন ঘন পরীক্ষা ও মুল্যায়ন, শ্রেণীকক্ষে সঠিক পদ্ধতিতে পাঠদান, বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, অন্যান্য দেশের ন্যায় শিক্ষকদের নিবন্ধিকরণ প্রথা চালু ও শিক্ষক সমিতি কর্তৃক এসব বাস্তবায়নের নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

## বাংলাদেশ শিক্ষাণীতি, ১৯৯৭ (প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এম শামসুল হক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। উক্ত কমিটি ১৯৯৭ সালে রিপোর্ট পেশ করে। উক্ত রিপোর্ট ২৫টি অধ্যায়ে লিখিত এবং শিক্ষার প্রত্যেক দিকের উপর কমিটি সুপারিশ পেশ করেছে।



www.pathagar.com

**মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ** বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর অংশটি মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে না হয় বৃত্তি মূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের পথে যাবে। এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। কর্ম জগতের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করা, উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে তিনটি ধারা থাকবে সাধারণ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষাধারা। সব ধারাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে এবং কয়েকটি সাধারণ আবশ্যিক বিষয় থাকবে, এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর এক ধারা থেকে অন্য ধারায় গমনের পথ খোলা থাকবে।

**সুপারিশ ঃ**

১. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হবে চার বছরের, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারা নির্ধারিত অভিন্ন শিক্ষাক্রমানুসরণ করতে হবে এবং এই স্তরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা হবে।

২. মাধ্যমিক স্তরে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং প্রয়োজনয়ি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের।

৩. বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম-দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. সকল বিষয়ের শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ করতে হবে।

৫. সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। অনতিবিলম্বে তা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।



www.pathagar.com

৮. দশম শ্রেণীর পর একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে মাধ্যমিক প্রথম পর্ব। এ পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল সম্বন্বিত করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। দ্বদশ শ্রেণী শেষে অনুরূপ একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং নাম হবে মাধ্যমিক দ্বিতীয় পর্ব। এতে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয় করতে হবে। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের নম্বর যোগ করে মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত ফল নির্ধারিত হবে।

৯. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য অনুপাত হবে ১ঃ৪০।

১০. শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা আবশ্যিক হিসেবে পাঠ্য থাকবে।

১১. সরকারের নির্ধারিত হারের চেয়ে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি হারে বেতন আদায় করে, যারা চাঁদা আদায় করে, যাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে মিশনারী ট্রাস্ট এর দেশে বিদেশি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বরাদ্ধ দেয়া চলবে না। তবে অভিন্ন শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচী ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলক অনুসরণ করতে হবে। সরকারের অনুমতি ক্রমে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ও' লেবেল থেকে 'এ' লেবেল চালু রাখতে পরবে।

১২. বিভিন্ন জড়িপে দেখা গেছে যে অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য অনুদান ভোগ করছে। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের মাধ্যমে সব চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. ক্যাডেট কলেজগুলোতে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে এবং ক্যাডেট কলেজের ব্যয় নির্বাহ হবে সামরিক বাজেট বরাদ্ধ থেকে।



www.pathagar.com

# মনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন

**জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩**

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সভ্যতার অগ্রগতির মূল বাহন হচ্ছে শিক্ষা, স্বাধীনতা উত্তর বিগত ৩৩ বছরেও আমাদের দেশে শিক্ষার সার্বজনীন রূপরেখা পায়নি, প্রতিনিয়ত চলছে পরিবর্তনের ধারা। আর এই পরিবর্তনের জন্য গঠন করা হচ্ছে শিক্ষা কমিশন। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ইতোপূর্বেও ৬টি কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু কোনটাই প্রকৃত পক্ষে আলোর মুখ দেখেনি। সর্বশেষ ২০০৩ সালে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে নতুন কমিশন গঠন করা হয়। শিক্ষার নানা খুঁটি নাটি দিক বিবেচনা করে এই কমিশন ৩১ মার্চ ২০০৪ সালে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে রিপোর্ট পেশ করে :

**মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ** আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি ভাগ রয়েছে। যথা– (১) নিম্নমাধ্যমিক, (২) মাধ্যমিক, (৩) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়। নীচে এ পর্যায়ের জন্য গৃহীত সুপারিশগুলো তুলে ধরা হলো–

**সরকারি স্কুল স্থাপন ঃ** সরকারকে স্কুল ম্যাপিং এর মাধ্যমে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি বছরে কমপক্ষে ২৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেছে কমিশন।

**মডেল স্কুল ঃ** কম খরছে ভাল লেখাপড়া ও উন্নত সুযোগ সুবিধার জন্য প্রতিটি উপজেলায় আগামী ১০ বছরের ভিতর একটা করে মডেল স্কুল স্থাপন।

**বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ঃ** শহর অঞ্চলে পাসের হার কোন রকমে ঠিক থাকলেও মফস্বল অঞ্চলে কোন পরীক্ষা এলে দেখা যায় রেজাল্ট বিপর্যয়। এর মূল কারণ ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞানের জন্য ভাল ও পর্যাপ্ত শিক্ষক না পাওয়া। এই কমিশনে পর্যাপ্ত ভাল বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

**কোটিং, নোট, প্রাইভেট নিষিদ্ধ ঃ** শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়ার সুষ্ঠু মান বজায় রাখার জন্য কোটিং সেন্টার, নোট, গাইড প্রকাশনা ও শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে। তহবে কোন ছাত্র-ছাত্রী শ্রেণীকক্ষে



www.pathagar.com

বেশি দুর্বল হলে তার মান উন্নয়নে উক্ত বিষয়ের শিক্ষক ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে সর্বোচ্চ ৬ ঘণ্টা ছাত্রদের পড়াতে পারবেন।

**শিক্ষার মাধ্যম ঃ** আমাদের বাঙালি চেতনাকে ধরে রাখার জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়েছে তবে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

**স্কুলভিত্তিক নম্বর প্রদান ঃ** স্কুলের শিক্ষকই একজন শিক্ষার্থীকে ছোটবেলা থেকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে। তাই একজন ছাত্র কেমন তা একজন শিক্ষকই ভাল মূল্যায়ন করতে পারবেন। এজন্য বর্তমান কমিশনে ২৫% নম্বর স্কুলভিত্তিক করার সুপারিশ করা হয়েছে।

**মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** এখন থেকে স্কুল পর্যায়ে কোন শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য না করার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে কোন শিক্ষার্থী যদি নির্দিষ্ট মানের চেয়ে কম জ্ঞান অর্জন করে তবে শিক্ষকের আওতায় এনে তার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাজনীতি ঃ** দলাদলির সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুরবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা হয়। এটা বন্ধের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

**একমুখী শিক্ষা ঃ** এতদিন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে নবম শ্রেণী থেকে বিভাজনের মাধ্যম মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখার সৃষ্ঠি হত। এতে অনেক শিক্ষার্থীর কোনো বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হত না। এটা বন্ধের জন্য কমিশন একমুখী অর্থাৎ বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য সব এক করে সকলকে এসএসসি পর্যন্ত একই রকম শিক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

**পাঠ্য বিষয় ঃ** একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা আনয়নের ফলে পাঠ্যক্রমে আনতে হবে ব্যাপক রদবদল। কমিশন এজন্য ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এক রকম পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেছে। আর নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য আর এক রকম পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেছে। এতে বর্তমান সময়কে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরি করে তা বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করেছে কমিশন। তবে কলেজের পড়াশোনা ব্যাপক ও বিস্তৃত বলে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয়নি।

## জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে চেয়ারম্যান এবং ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে আঠার সদস্যবিশিষ্ট মাত্র চার মাসের মধ্যে একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার পর তা চূড়ান্ত না করে ব্যাপক জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হলে তা সকল মহলের বিপুল সাড়া পাওয়া যায়।



www.pathagar.com

**জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০) এর আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

* শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা
* কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করে।
* মানব সম্পন্ন শিক্ষা দান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষার ভিত শক্ত হবে।
* বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্য যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা।
* নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারার অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।



www.pathagar.com

# মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা এবং শ্রেণী শিক্ষকের দায়িত্ব

বিদ্যালয় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার শ্রেণী ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিদ্যালয় কাঠামোর সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান হল শিক্ষার্থী এবং যে স্থানে তাদের শিক্ষাদান কাজ সংগঠিত হয়ে থাকে তা হল শ্রেণীকক্ষ। আসলে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যাবলিই শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে আবর্তিত। তাই শ্রেণীকক্ষের পরিবেশের ওপর বিদ্যালয়ের পরিবেশ অকেকাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীরা যতক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকে তার সিংহভাগ সময়ই কাটায় শ্রেণীকক্ষে এমন কি বিদ্যালয়ের কার্যক্রমেরও বেশির ভাগ অংশ হয় শ্রেণীকক্ষেই। মূলতঃ শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের ওপর শ্রেণীকক্ষের সুবিধাদি এবং এর সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিচালনা শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুতঃ শ্রেণী ব্যবস্থাপনা হল বিদ্যালয় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু।

**শ্রেণীকক্ষে শৃংখলা রক্ষার উপায় বা কৌশল**

১। শ্রেণীতে শৃংখলা রক্ষার প্রধান এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল শিক্ষক পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণীতে আসা এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ শিক্ষাদান করা। কারণ শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠ আকর্ষণীয় হলে অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করলেও শিক্ষার্থীরা শ্রেণী পাঠের প্রতি মনোযোগী থাকে।

২। শ্রেণীতে শিক্ষক-শিখন প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের যথেস্ট সুযোগ থাকে। মূলতঃ এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর ভূমিকাই প্রধান ও প্রত্যক্ষ। শিক্ষক সক্রিয় না থাকলে শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় থাকবে। ফলে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

৩। মানুষ সজাগ অবস্থায় তার ব্রেন কখনও বসে থাকে না, কোন না কোন কাজ করবেই। তাই শিক্ষার্থীরাও কোন কাজ ছাড়া চুপ করে বসে সময়



www.pathagar.com

কাটাতে পারে না। অবসরে বসে থাকলে কিছুটা দুষ্টুমী এবং বিশৃঙ্খলা করাটাই স্বাভাবিক। কাজেই পাঠদানের পর হাতে সময় থাকলে পাঠ সংশ্লিষ্ট কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

৪। শ্রেণীতে শিক্ষকের অবস্থান এমন স্থানে হবে যাতে শ্রেণীর সকলে সহজেই তাঁকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে পারে এবং শিক্ষকও সকল শিক্ষার্থীর ওপর নজর রাখতে পারেন।

৫। শিক্ষককে একই অবস্থানে স্থির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে বা বসে পাঠদান করা উচিত নয়, প্রয়োজনে তাঁকে Movement করতে হবে। এটা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অন্যতম সহায়ক।

৬। শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের খাতার লেখা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের আসনের নিকট গিয়ে তা সংশোধন করা উচিত। শিক্ষক নিজ আসনে বসে শিক্ষার্থীদের খাতা সংশোধন করতে চাইলে শিক্ষার্থীরা টেবিলের পাশে ভিড় করে বিশৃংখলার সৃষ্টি করবে।

৭। শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে, পাঠের উপযোগী উপকরণের যথার্থ ব্যবহার করাতে হবে এবং শ্রেণী পরিচালনার ব্যাপারে সার্বিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষককে শ্রেণীতে আসতে হবে।

সুতরাং শ্রেণীকক্ষে শৃংখলা রক্ষার প্রধান হাতিয়ার হল পরিবেশ। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কর্তব্য শ্রেণী উপযোগী শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী এবং সময় উপযোগী যথোপযুক্ত শিক্ষাদান বা পাঠদান কৌশল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা। শিক্ষকের শিক্ষাদান সংক্রান্ত কার্যাবলি যদি শিক্ষার্থীদের ভাল লাগে, মন ছুঁয়ে যায় বা মনকে আকৃষ্ট করে তাহলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষিত এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। শিক্ষকের শিক্ষাদান সংক্রান্ত আচরণ বা কার্যাবলির প্রতি, আর শ্রেণী থাকবে শিক্ষকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

আদর্শ শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্য অথবা শ্রেণীকক্ষের আকার, আয়তন, আসবাবপত্র, শিক্ষার্থীদের আসন ও আলো বাতাসের ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত।

শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশের প্রভাব খুব বেশি। মনোরম পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। একটি আদর্শ শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল–

১। শ্রেণীকক্ষের আয়তন শিক্ষার্থীর সংখ্যার অনুপাতে হতে হবে। তবে শ্রেণীকক্ষের আকার ও আয়তন এমন হতে হবে যাতে ৪০ জন শিক্ষার্থী একত্রে বসতে পারে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের শর্তানুসারে ১১ বছরের বেশি বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণীতে জন প্রতি ১২ বর্গফুট জায়গা নির্দিষ্ট করা এবং শ্রেণীর আয়তন সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থীর উপযোগী হতে হবে।



www.pathagar.com

২। শ্রেণীকক্ষের উচ্চতা বেশি থাকবে এবং প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকবে। দরজা, জানালার সংখ্যা বেশি এবং জানালাগুলো বড় বড় থাকবে। দরজা, জানালাগুলো উত্তর-দক্ষিণে খোলা থাকা বাঞ্ছনীয়। সম্ভব হলে বৈদ্যুতিক পাখা, বাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৩। শ্রেণীকক্ষগুলো বর্গাকার না হয়ে আয়তক্ষেত্রাকার হবে।

৪। শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজন মত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক মজবুত ও হালকা আসবাবপত্র থাকবে। শিক্ষার্থীদের বসার বেঞ্চ বা ডেস্ক একটার পর একটা পর পর সাজিয়ে বসাতে হবে। শিক্ষার্থীদের আসন এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে যে কোন আসন হতে শিক্ষকের অবস্থান এবং ব্লাকবোর্ড বা চকবোর্ড স্পষ্ট দেখা যায়। এছাড়া বেঞ্চ বা ডেস্কগুলো নড়াচড়া করার উপযোগী হবে।

৫। শিক্ষার্থীদের বসার আসনগুলোর উচ্চতা তাদের উচ্চতা অনুপাতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬। শ্রেণীকক্ষে যে দিক দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো প্রবেশ করে সে দিকে মুখ করে শিক্ষার্থীদের বসবার ব্যবস্থা রাখা ঠিক নয়। এতে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের লেখা স্পষ্ট দেখতে পারবে না। এছাড়া এতে চোখের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

৭। শ্রেণীকক্ষের মেঝে, দেয়াল, ছাদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৮। প্রত্যেক শ্রেণী বা শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত রাখা দরকার। মাধ্যমিক স্তরের প্রতি শ্রেণী বা শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ৪০ জন। কোন অবস্থাতে এ সংখ্যা ৫০ অতিক্রম করতে দেয়া ঠিক নয়।

৯। শ্রেণীকক্ষ তথা বিদ্যালয় গৃহ জনকোলাহল মুক্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাজার, রেল স্টেশন, স্টীমার স্টেশন, নদীর ঘাট, অফিস আদালত, রাজপথ ইত্যাদি থেকে বিদ্যালয়ের অবস্থান বেশ কিছুটা দূরে থাকা উচিত।

১০। শ্রেণীকক্ষসমূহের মাঝের দেয়াল বা পার্টিসন এমন হওয়া উচিত যাতে এক কক্ষের শব্দ অন্য কক্ষের শিক্ষার্থীদের মনোযোগের বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। এ দেয়াল নাড়াচাড়া করার উপযোগী হওয়া উচিত যাতে প্রয়োজনমত শ্রেণীকক্ষের আকার ছোট বা বড় করা সম্ভব হয়।

**শ্রেণীতে শ্রেণীশিক্ষক যে সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন :**

শ্রেণী শিক্ষাদান কার্যক্রমে নিবেদিত প্রাণ শিক্ষককে যে সমস্ত উপাদানকে যত্নসহকারে বিবেচনা করতে হবে এমন কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। শিক্ষার্থীদের বয়স, উচ্চতা, শারীরিক দুর্বলতা, দৃষ্টিহীনতা, কানে কম শোনা ইত্যাদি বিবেচনা করে তাদের বসার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।



www.pathagar.com

২। শিক্ষাদান কাজের ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়মিত হাজিরা পর্যবেক্ষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই শ্রেণী পরিচালনায় শিক্ষককে এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩। শ্রেণীকক্ষে শ্রেণী শিক্ষকের অবস্থান এমন স্থানে হবে যাতে তিনি সকল শিক্ষার্থীর ওপর নজর দিতে পারেন।

৪। শিক্ষকের পাঠদান আকর্ষণীয়, সজীব, আনন্দদায়ক, সাবলীল ও সৃজনশীল হলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ সহজ ও ফলপ্রসূ হবে।

৫। শ্রেণীতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দলনেতা নির্বাচন এবং তার সাহায্য গ্রহণ করা শ্রেণী পরিচালনায় অত্যন্ত সহায়ক।

৬। শ্রেণীতে অমনোযোগী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য প্রথমে দুষ্টুমীর বা চঞ্চলতার কারণ সনাক্ত করতে হবে তার পর তার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শাস্তি দিয়ে তাদেরকে শ্রেণীতে মনোযোগী করা যাবে না।

৭। মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সবসময় কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং তারেদ কাজের ভালমন্দ অনুসারে প্রশংসা বা ভুল শোধরানোর উপায় বলে দিতে হবে।



www.pathagar.com

# মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কাঠামো

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো মাধ্যমিক শিক্ষা বাংলাদেশের মাধ্যমিক। শিক্ষা কাঠামোকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায় যেমন ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী নিম্ন মাধ্যমিক স্তর, নবম ও দশম শ্রেণীকে মাধ্যমিক স্তর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। কাজেই বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর এই দ্বিতীয় স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অবস্থান করছে কোমল মতি ছেলে মেয়েরা যাদের বয়স ১১ হতে ১৭+। এটা হচ্ছে কৈশোর এবং শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক বিবর্তন ও বিকাশদান। এবং মানব সভ্যতার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে বিশ্বব্যাপী মানসম্পন্ন শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন ও উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষার বিকল্প নাই। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে আজকাল আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একথার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার যে উন্নয়ন ঘটেছে এর মূল কারণ আমাদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। পক্ষান্তরে আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে দ্বিতীয় পূর্ব শর্ত।

একজন মানুষে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তবে প্রথম জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই মূল শিক্ষা যারফ ল সমস্ত এইস্তরে শিক্ষার্থীরা থাকে ভাবপ্রবন ও অনুকরণশীল যা সঠিক শিক্ষা ও পথ নির্দেশনার মাধ্যমে কাজে লাগানো একান্ত আবশ্যক, অধ্যাপক ড. গোলাম মাওলা 'মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং মতামত প্রবন্ধে লিখেছেন।'

বাংলাদেশের বিরাজমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেককে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ করে অথবা পড়া-শুনা ত্যাগ করে অর্থ-উপার্জন ও জীবিকা নির্বাহের কাজে প্রবেশ করতে হয়। এই সমস্ত কারণে অনেক শিক্ষার্থীর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা একটি প্রান্তিক শিক্ষা স্তর। আবার অপর দিকে এই মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব। কাজেই দেখা গেছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামোর এই স্তরটি একদিকে যেমন উচ্চ শিক্ষা লাভের পথকে প্রশস্ত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে অন্যদিকে শিক্ষার্থীর উপযুক্ত শিক্ষার স্তর



www.pathagar.com

হিসাবে নৈতিক, বৃত্তিগত ও বৌদ্ধিক শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক প্রভৃতি দিক দিয়ে সুশিক্ষিত, পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যক্ষম মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব বহন করে।

এমতাবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলিকে এই সকল বহুবিধ দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরী যার জন্য প্রয়োজন একটি স্বয়ংসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে প্রতিভার সঠিক বিকাশ ঘটবে, উচ্চ শিক্ষার 'ভিত' তৈরি হবে এবং কর্মজীবী মানব সম্পদের রূপান্তরিত হওয়ার শারীরিক, মানসিক এবং মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধসহ মৌলিক শিক্ষা পাবে।

**মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য**

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রান্তিক এবং অধিকাংশের শিক্ষা হিসেবে এই শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করা এবং ব্যক্তি ও নাগরিক হিসেবে পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের জন্য শারীরিক, বুদ্ধিগত ও বৃত্তিগত দিক দিয়ে সুশিক্ষিত করে তোলা। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃত্তিমূলক ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১। **শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ঃ** মাধ্যমিক শিক্ষা হবে অনুপ্রেরণামূলক যা শিক্ষার্থীর সুপ্ত জ্ঞানের প্রতিভা বিকাশিত হয়।

একজন শিক্ষার্থী যখন অজানাকে জানার প্রেরণা লাভ করে তখন বাস্তব জীবনে উন্নতি এবং কল্যাণ সাধন করতে পারে।

২। **স্বাধীন মত প্রকাশ ঃ** মানুষ কখন ও পরাধীন জীবন যাপন করতে চায় না। তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য স্বাধীন মত প্রকাশ এবং চিন্তাশক্তির অনুশীলন প্রয়োজন। বিশেষ এবং চিন্তাশক্তির স্বাধীনতা না পেলে মত প্রকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। যেহেতু চিন্তাশক্তির মানুষের সৃজনী শক্তির ক্ষমতার মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর স্বাধীন মত প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

৩। **শিক্ষার্থীকে সুনাগরিকের পরিণত ঃ** আজকের কোমল মতি শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব। তাদের উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব থাকে স্কুলের উপর। একজন শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা এবং তাঁর জ্ঞানের বিকাশ সাধনে সহায়তা দান করা মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য।

৪। **সঠিক পথে চলার অনুপ্রেরণা ঃ** একজন শিক্ষিত এবং বিবেকমান ব্যক্তি মাত্রই সঠিক পথে চলার আগ্রহ প্রকাশ করে। এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজে নেতৃত্বদান করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে পথ চলার অনুপ্রেরণা দান করা।



www.pathagar.com

**৫। জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবোধ ঃ** জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চেতনাবোধ যে কোন নাগরিকের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ জাতীয় বৈশিষ্ট্য এই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। যে জাতির স্বকীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নেই, সে জাতি পৃথিবীতে পরপদানত জাতি বা ক্রীতদাস বলে পরিগণিত। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

**৬। শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন ঃ** শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। "সুস্থ দেহের সুস্থ মন" - এ প্রবাদ বাক্যটি চিরন্তন সত্য। শরীর সুস্থ না থাকলে মনও কখনও সুস্থ থাকে না। অসুস্থ মানুষ কখনও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না এবং তার দ্বারা মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সুস্থ দেহে সুস্থ মনের অধিকারী নাগরিক তৈরি করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় শরীর চর্চা ও আমোদ-প্রমোদমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করা।

**৭। চরিত্র গঠন ঃ** চরিত্র মানুষের মূল্যবান সম্পদ। চরিত্র মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল রাখে। যে সমস্ত মানুষ সমাজের কল্যাণ সাধন করে গেছেন এবং বিশেষ গুণের জন্য অমর হয়ে রয়েছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ। ছাত্র জীবনেই চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সৎ চরিত্র গঠন। ত্যাগ, সংযম, ধৈর্য, সাধুতা, উদারতা, কর্তব্যপরায়ণ প্রভৃতি গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে এই মাধ্যমিক স্তর।

**৮। প্রয়োজন ও চাহিদার সমন্বয় বিধান ঃ** মাধ্যমিক শিক্ষার অপর লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন ও চাহিদার নিবৃত্তি। এই প্রয়োজন ও চাহিদা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত, শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে হতে পারে। জীবনের বিভিন্ন স্তরে এই প্রয়োজন ও চাহিদা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। সুতরাং এই মাধ্যমিক স্তরে এমন শিক্ষা প্রবর্তন করা প্রয়োজন যা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবনে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় এবং প্রয়োজনে যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারে।

**৯। আত্মোৎসর্গকৃত মনোভাব গঠন ঃ** পরোপকার মানুষের পরম ধর্ম ও মহৎ গুণ। সমাজে মানুসের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে হলে আত্মোৎসর্গকৃত মনোভাবের প্রয়োজন। নিজের সুখ-শান্তির সঙ্গে অপরের সুখ-সুবিধা বিধান করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। স্বদেশ প্রেম, মানবপ্রীতি, সেবাপরায়ণতা, ধর্মনিষ্ঠ প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলীর অধিকার হওয়ার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একান্ত কর্তব্য। শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী বিকাশের মনোভাব জাগিয়ে তোলা ও পরিবেশ সৃষ্টি করা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য।



www.pathagar.com

**১০। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ঃ** জীবিকার্জনের জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা লাভের একান্ত প্রয়োজন। পুঁথিগত বিদ্যা ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ কাজে আসে না এবং বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে এবং জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করে। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে এই স্তরে শিক্ষার্থীর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনে সক্ষম করে তোলা।

**১১। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাবে গঠন ঃ** সমগ্র বিশ্ব মিলে আজ একটি সমাজ। কোন রাষ্ট্রই সবদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ না। কোন না কোন দিক দিয়ে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রই আজ একে অপরের সন্নিকটবর্তী হচ্ছে এবং U. N. O.-এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে পৃথিবীর সমগ্র দেশ 'এক দুনিয়ার আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং একজন নাগরিক যেমন তার দেশের, তেমনি বিশ্বসমাজেরও একজন সদস্য। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর মনে এই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাব গড়ে তোলা।

মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে আর্থ সামাজিক এবং মানসম্পন্ন জীবন যাপনের পূর্ব শর্ত।

**মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কাঠামো ঃ**

১। শিক্ষার্থীদেরকে প্রত্যেক স্তরের পূর্ববর্তী স্তরের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা এবং এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা।

২। নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

৩। ধর্মীয় ও নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুপ্রাণিত করা।

৪। দেশাত্মবোধ ও মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত করা।

৫। শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

৬। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সমর্থ না করা।

৭। জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

৮। প্রত্যেক স্তরে সংশ্লিষ্ট স্তরের পরবর্তী স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে পূর্ব প্রস্তুতি হাসিলে সাহায্য করা।

**প্রধান উদ্দেশ্য**

১। এ স্তরের শিক্ষাক্রমকে ক্রমশ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, বিশেষ করে এ অঞ্চলের দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার সমমান সম্পন্ন করা।



www.pathagar.com

২। জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এমন ভাবে শিক্ষাক্রম পুনর্বিন্যস্ত করা যাতে শিক্ষার্থী আত্মকর্মসংস্থান ও উপার্জন সক্ষম হয়।

৩। প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞানকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করে মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা।

৪। আদর্শ নাগরিক জীবন যাপনের জন্য উপযুক্ত গুণাবলী অর্জন করা।

৫। শিক্ষার্থীদিগকে উন্নত ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করা।

৭। শিক্ষার্থীকে জীবিকা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।

৮। ছাত্রদের মেধা ও প্রবণতা অনুসারে উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

৯। ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ সাধন এবং ভবিষ্যত জীবনের উপযোগী করে প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ প্রদান করা।

১০। শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, মেধা, শক্তি, আগ্রহ অভিরুচী প্রভৃতি অনুযায়ী তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সাহায্য করা।

১১। প্রয়োজনীয় সামাজিক আচার-আচরণ ও দক্ষতা দিয়ে শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

১২। তত্ত্ব বা জ্ঞান শিক্ষাদানের সাথে সাথে শিক্ষার্থীকে তার কর্ম জগতের সাথে পরিচিত করা এবং সে সম্পর্কিত প্রাথমিক দক্ষতা শিক্ষাদান করা।

১৩। শিক্ষার্থীর ধ্যান-ধারণা, চিন্তা, মূল্যবোধ প্রভৃতি গড়ে উঠতে সাহায্য করা এবং তার শারীরিক, মানসিক গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে সহায়তা করা।

১৪। শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করা, গণতান্ত্রিক আদর্শে তাকে উদ্বুদ্ধ করা এবং নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতন করে তোলা।



www.pathagar.com

# মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের কাঠামো

নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর

সাধারণ শিক্ষা উপব্যবস্থা মাদ্রাসা শিক্ষা উপব্যবস্থা

আবিশ্যক বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় (১টি) আরবি/সংস্কৃতি/পালি

আবিশ্যক বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় (উর্দু/ফার্সি)

বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ধর্মশিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি/চারু ও কারুকলা ও স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা

কুরআন মজিদ, আকাইদ ও ফিক্‌হ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি

## মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা

| বিজ্ঞান শাখা | মানবিক শাখা | ব্যবসায় শিক্ষা শাখা | তাজবিদ শাখা | হিফজুল কোরআন শাখা |
|---|---|---|---|---|
| সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহ ঃ বাংলা, ইংরেজি, আরবী, গণিত। | সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহ ঃ বাংলা, ইংরেজি, আরবী, গণিত। | সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহ ঃ বাংলা, ইংরেজি, আরবী, গণিত। | সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহ ঃ বাংলা, ইংরেজি, আরবী, গণিত। | সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহ ঃ বাংলা, ইংরেজি, আরবী, গণিত। |



www.pathagar.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় ঃ কুরআন মজিদ ও তাজবিদ, হাদিস শরীফ, ফিকহ্ ও উসুল-ই-ফিকহ্, কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি | অন্যান্য বিষয় ঃ কুরআন মজিদ ও তাজবিদ, হাদিস শরীফ, ফিকহ্ ও উসুল-ই-ফিকহ্, কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি। | অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় ঃ কুরআন মজিদ ও তাজবিদ, হাদিস শরীফ, ফিকহ্ ও উসুল-ই-ফিকহ্, কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি। | অন্যান্য আবশ্যিক বিষয় ঃ কুরআন মজিদ ও তাজবিদ, ফিকহ্ শরীফ, ফিকহ্ ও উসুল-ই-ফিকহ্, কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি। | অন্যান্য বিষয় ঃ কুরআন মজিদ ও তাজবিদ, হাদিস শরীফ, ফিকহ্ ও উসুল-ই-ফিকহ্, কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি। |
| নৈর্বাচনিক বিষয় ঃ ভৌত বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান | নৈর্বাচনিক বিষয় ঃ ইসলামের ইতিহাস, সামাজিক বিজ্ঞান। | নৈর্বাচনিক বিষয় ঃ হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবসায় পরিচিতি। | নৈর্বাচনিক বিষয় ঃ তাজবিদ ও কিরাত। | নৈর্বাচনিক বিষয় ঃ তাজবিদ, হিফজুর কোরআন। |
| ঐচ্ছিক বিষয় ঃ উচ্চতর বাংলা, উচ্চতর ইংরেজি, উচ্চতর গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, উর্দু, ফার্সি, কম্পিউটার শিক্ষা, বেসিক ট্রেড। | ঐচ্ছিক বিষয় ঃ উচ্চতর বাংলা, উচ্চতর ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি, পৌরনীতি, মানবিক, উচ্চতর গণিত, কম্পিউটার শিক্ষা, বেসিক ট্রেড। | ঐচ্ছিক বিষয় ঃ উচ্চতর বাংলা, উচ্চতর ইংরেজি, অর্থনীতি, বানিজ্যিক ভূগোল, কম্পিউটার শিক্ষা, বেসিক ট্রেড। | ঐচ্ছিক বিষয় ঃ উচ্চতর বাংলা, উচ্চতর ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি, কম্পিউটার শিক্ষা, বেসিক ট্রেড। | ঐচ্ছিক বিষয় ঃ তাজবিদ, হিফজুল কোরআন, উচ্চতর বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি, কম্পিউটার শিক্ষা, বেসিক ট্রেড। |



www.pathagar.com

# বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের উন্নয়ন

বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান মানবীয় সম্পর্ক হলো ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকারে শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের স্থান ছিল গৌণ আর শিক্ষক ছিলেন মুখ্য। শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষকের ইচ্ছামত পরিচালিত হতো সেখানে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা প্রবণতা। আগ্রহ ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম ছিল না। আধুনিক কালের শিক্ষাব্যবস্থার এর যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মূল কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে ছাত্র এবং তাকে ঘিরে সবকিছুর আয়োজন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ আবদুল হাকিম বলেন ঃ–

"আজকাল শিক্ষানীতিতে শিশুর মনের খবর নেওয়ার জন্য খুবই বেশি তাড়া দেখা যায়। যাদেরকে শিক্ষা দেয়া হবে তাদের মানসিক, শারীরিক ও আত্মিক শক্তি সামর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার অত্যাবশ্যকতা আধুনিক শিক্ষাবিদগণ সবাই স্বীকার করেন। শিশুরা মানুষের সন্তান কিন্তু শিশুকে একটি ক্ষুদ্রাকার মানুষ হিসেবে দেখে বয়স্কদের মনের মত করে তাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা চলে না। কারণ শিশুর দেহ মনের চাহিদা হুবহু বয়স্কদের চাহিদার অনুরূপ নয়। শিশুর যে বয়সে যে দিকে মতি গতি, ঝোঁক বা গরজ সে বয়সে তার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ঐ সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর রাখতে হবে। তা না হলে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।"

শিশুকে সুশিক্ষার মাধ্যমে পরিণত ও উপযুক্ত মানব সম্পদে রূপান্তরিত করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। আর এই কাজে সাফল্য লাভের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব অধিক। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত মনের দ্বারে কোমল অনুভূতির পরশে তার সে ঘুমিয়ে থাকা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলবেন। এই প্রসঙ্গে প্রফেসর ফাতেমা খাতুন শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা গ্রন্থে লিখেছেন ঃ শিক্ষকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীর প্রতি প্রকৃত মমতাবোধের দ্বারা তার জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া। সে আলোতে উদ্ভাসিত শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের প্রতি অবশ্যই অনুরক্ত হবে।



www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের আচরণ হবে সর্বদা সহজ আন্তরিক, সহানুভূতিশীল। ফ্রেয়েবলের মতে, শিক্ষক শিশুর সদাশয় তত্ত্বাবধায়ক। শিক্ষকের মধুর ব্যক্তিত্বই তাঁকে করে তোলে শ্রদ্ধা সমীহার পাত্র।

শিক্ষক পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও দক্ষতার সাথে শ্রেণীতে পাঠদান করবেন যতদূর সম্ভব সহজ সরল ভাষায়। শিক্ষার্থীর প্রশ্নের জবাবে কোন রকম বিরক্তিবোধ না করে বরং প্রশ্ন আহ্বান করে তার উত্তর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। শ্রী মঞ্জশ্রী চৌধুরী তাঁর 'সু শিক্ষক' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

শুধু শ্রেণী কক্ষে নয়। শ্রেণী কক্ষের বাইরে ও শিক্ষক হবেন শিশুর উৎসাহদাতা। নিরাপত্তার আধার। প্রতিটি ছাত্রের গুণাবরীর স্বীকৃতিদান তাকেই করতে হবে। ছাত্রের সৎ গুণের বিকাশ সাধন। দুর্বলতা বা দুশ্চিন্তার অপনোদন করা শিক্ষকের পবিত্র কর্তব্য। শিক্ষার্থীর নানাবিধ সমস্যার মোকাবেলায় শিক্ষক সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন শাস্তি তিনি অবশ্যই দেবেন না।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক জোরদার করতে হলে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের সব সময় বন্ধু ভাবাপন্ন হতে হবে। শিক্ষক যদি ছাত্রের কাজের এবং কথার যথাযোগ্য গুরুত্ব দান করে তাহলে উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

শিক্ষক সর্বদাই সুশৃঙ্খল আচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকবেন। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক হল সর্বোত্ত মডেল। শিক্ষকের শৃঙ্খলামূলক আচরণ অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবনও সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠতে পারে।

শিক্ষককে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, সুরুচি, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচরণের পরিচ্ছন্নতা এবং নানারকম মুদ্রাদোষ বর্জিত মধুর বাচনভঙ্গী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। পরিহাস প্রিয়, ভাড়ামীপনা শিক্ষকের কাম্য হতে পারে না।

বিদ্যালয়ের সব ধরনের শিক্ষার্থীই থাকে। শিক্ষক তাদের মধ্যে দুর্বল ও মেধাবী বা কৃতি শিক্ষার্থীদের প্রতি স্বতন্ত্র নজর দেবেন। অন্যান্য শিক্ষকসহ অভিভাকের সাথে আলাপ আলোচনা করে প্রয়োজনয়ি নির্দেশনাসহ সহায়তা প্রদান করে তাদের নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষক অবশ্যই এমন সব গুণাবলির বাস্তব উদাহরণ হবেন যা শিক্ষার্থীদের সুবিবেচনায় একজন শিক্ষকের জন্য বাঞ্চনয়ি। কেবলমাত্র বাঞ্ছিত গুণাবলি আয়ত্বকরণের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে এ ধরনের সম্পর্ক একটি পারস্পরিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের থেকে ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষককে শিক্ষার্থী পরম হিতৈষী, পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারলে তাদের আচরণেও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আসবে।



www.pathagar.com

নির্বাচিত ৬টি দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, জাপান, ইংল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা।



www.pathagar.com

**ভূমিকা ঃ**

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই তার নিজস্ব জাতীয় আদর্শ সংস্কৃতির বহিঃ প্রকাশ। শিক্ষা ব্যবস্থাই জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ১০৭২ সালে রচিত সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বৈষম্যহীন, গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে একটি অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি ও ১৯৮৮ সালে মফিজ উদ্দিন কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক দীর্ঘ মেয়াদী সামগ্রিক রূপরেখা ও দিক নির্দেশনা সম্বলিত কোন পূর্নাঙ্গ নীতি প্রণয়ন করা হয়নি।

**বাংলাদেশ ঃ**

বাংরাদেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা কাঠামো তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন ঃ-

১. প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক
২. মাধ্যমিক পর্যায়
ক) নিম্ন মাধ্যমিক
খ) মাধ্যমিক
গ) উচ্চ মাধ্যমিক
৩. উচ্চ শিক্ষা
ক) স্নাতক (পাস) ও স্নাতক (সম্মান)
খ) মাষ্টার্স
গ) এমফিল ও পি এইচ ডি।

**প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ঃ**

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকে যদিও আনুষ্ঠানিক স্তর হিসেবে গন্য করা হয়নি তথাপি বেসরকারি উদ্যোগে এই শিক্ষা দেশের প্রায় সব শহরেই চালু আছে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা বয়স ৪-৫ বছর হয়ে থাকে।

**প্রাথমিক শিক্ষা ঃ**

বাংলাদেশের বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ৬-১১ বছর বয়সের শিশুরা ৫ বছর মেয়াদী (১ম-৫ম) শ্রেণী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহন করে থাকে। বর্তমানে এ স্তরের শিক্ষা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, বেসরকারি বিদ্যালয়ে এবং এনজিও কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে দেয়া হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলা, পুস্তকের ব্যবস্থা আছে। তৃতীয় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা আছে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বিষয়গুলোর নাম যথাক্রমে মাতৃভাষা (বাংলা), ইংরেজি, গণিত,



www.pathagar.com

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, ধর্ম শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, সংগীত।

**মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ**

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো স্তরের ২য় স্তরটি হল মাধ্যমিক শিক্ষা। দেশে বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর তিনটি উপস্তরে বিভক্ত। যেমন ঃ-

ক. মানবিক শাখা।
খ. বিজ্ঞান শাখা।
গ. ব্যবসায় শাখা।

১. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৩টি শাখায় বিভক্ত। যথা ঃ-

ক. বিজ্ঞান
খ. মানবিক
গ. ব্যবসায় শিক্ষা
ঘ. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
ঙ. ইসলামী শিক্ষা

**উচ্চ শিক্ষা ঃ**

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে কলেজে ৩ বছর পাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরের ডিগ্রী প্রোগ্রামে ভর্তি হয়। যে সব শিক্ষার্থীরা ডিগ্রী পাস প্রোগ্রাম থেকে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হয় তাদের জন্য মাস্টার্স ডিগ্রীর মেয়াদ ২ বছর এবং সম্মান ডিগ্রীধারীদের জন্য ১ বছর। এর উর্ধ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ও পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

পেশাগত বিশেষায়ন শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন- কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, কম্পিউটার বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ডিগ্রীর মেয়াদ ৫ বছর। বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ৬টি স্কুলের মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদে ডিগ্রী প্রদান করে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশরে প্রধান দায়িত্ব হল দেশে রসরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার বিশ্বব্যাপী চাহিদার সঙ্গতি রক্ষা করে দেশের উচ্চ শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা স্থাপনের প্রয়োজনীয় সব ধরনের যোগানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

**ভারত ঃ**

ভারতের শিক্ষা বিকাশের ইতিহাস অতি প্রাচীন। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংল্যান্ডের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা আধুনিক শিক্ষা বিকাশের পথকে সুপ্রশস্ত করে।



www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষা কমিশন বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে শিক্ষার বিন্যাসে সমতা আনার জন্য ১০ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা তদূর্ধ্বে ২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বা বিদ্যালয় প্রস্তুতিমূলক কোর্স শিক্ষাদানের সুপারিশ করেন।

(ক) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ ১–৩ বছর
(খ) নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ ১ম–৪র্থ শ্রেণী
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক ঃ ৫ম–৭ম শ্রেণী
(ঘ) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর ঃ ৮ম–১০ম শ্রেণী
(ঙ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ ১১–১২শ শ্রেণী

**মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ**

ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাকে ৮ম -১২শ শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এ দুই স্তরে ভাগ করা হয়। নতুন শিক্ষা বিন্যাস কার্যকরী করার ফলে পূর্বের কলেজ শিক্ষা স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন স্কুলে অধ্যয়ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য। যেসব শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করবে না তারা মাধ্যমিক স্তরে নিজেদের ভবিষ্যত যোগ্যতা লাভ করবে।

**নিম্ন মাধ্যমিক স্তর ঃ**

(১) তিনটি ভাষা অ- হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে এ ভাষা সাধারণ হবে-
ক. মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা
খ. হিন্দি (কেন্দ্রীয় ভাষা)
গ. ইংরেজি
তবে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে-
ক. মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা
খ. ইংরেজি
গ. হিন্দী বাদ দিয়ে একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা।
(২) গণিত
(৩) বিজ্ঞান
(৪) সমাজবিদ্যা (ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতি)
(৫) কর্ম অভিজ্ঞতা ও সমাজ কল্যান
(৭) শারীরিক বিদ্যা
(৮) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা
মাধ্যমিক স্তর শিক্ষা ২ ভাগে বিভক্ত। নিম্ন মাধ্যমিক
কোন কোন রাজ্য ( ৮ম-১০ম) শ্রেণী
কোন কোন রাজ্য (৯ম-১০ম) শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন স্তর।



www.pathagar.com

**উচ্চ মাধ্যমিক ঃ**

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষনীতির আলোকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমান, মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরটি পরিচালনা করা হয়।

১. যে কোন দু'টি ভাষা তথা যে কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা, যে কোন বিদেশী ভাষা এবং যে কোন প্রাচীন ভাষাকে নিয়ে দুটি ভাষা।

২. বিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞান অর্থ বা মানবিক বিষয় হতে যে কোন তিনটি ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচন করতে হবে। যেমন ঃ-

ক. ইতিহাস
খ. অর্থনীতি
গ. তর্কবিদ্যা
ঘ. মনোবিজ্ঞান
ঙ. সমাজ বিজ্ঞান
চ. শিল্পকলা
ছ. পদার্থ বিদ্যা
জ. রসায়ন
ঝ. গণিত
ঞ. প্রাণীবিদ্যা
ট. ভূ-বিদ্যা
ঠ. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
৩. কর্ম অভিজ্ঞতা ও সমাজ কল্যান
৪. শারীরিক শিক্ষা
৫. শিল্পকলা
৬. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে শিক্ষা।

**উচ্চ শিক্ষা ঃ**

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হবার পর Attiliated College এ ডিগ্রী করতে পারবে। মেয়াদ ৩ বছর বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে। স্নাতোকত্তোর ২ বছর ডিগ্রীর পর এম. ফিল. ও পি. এইচ. ডি. প্রদান করা হয়।

**মালয়েশিয়া ঃ**

মালয়েশিয়ায় জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হল দেশের সর্বস্তরের জনগনের চাহিদা পূরণ করা এবং শিক্ষায় রয়েছে ব্যাপক স্বাধীনতা, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের "রাজ্জাক কমিশন" রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা আইন পাশ হয়। এরপর থেকে মালয়েশিয়ায় শিক্ষাব্যবস্থার গঠনমূলক পরিবর্তন হতে থাকে।



www.pathagar.com

**মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ**

মালয়েশিয়ায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা তিনটি স্তরে বিভক্ত। যেমন ঃ-

ক. নিম্ন মাধ্যমিক

খ. উচ্চ মাধ্যমিক

গ. মাধ্যমিক স্তর উত্তর শিক্ষা

**নিম্ন মাধ্যমিক ঃ**

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকাল তিন বছর। তবে চাইনিজ ও তামিল প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদেরকে এক বছরের জন্য রিমুভ ক্লাশে অধ্যয়ন করে তাদের মান উন্নতি করা হয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তর ৭ম থেকে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত।

**উচ্চ মাধ্যমিক ঃ**

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ১০ম এবং ১১তম গ্রেড পর্যন্ত। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির জন্য নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ স্তরের শিক্ষাকাল দুই বছর। এ স্তরের শিক্ষা একাডেমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক স্কুলে দেয়া হয়ে থাকে। দশম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যত পেশা সম্পর্কে চিন্তা করে এবং কোন একটি বৃত্তিকে ভবিষ্যত পেশা হিসেবে পেশা সম্পর্কে চিন্তা করে এবং কোন একটি বৃত্তিকে ভবিষ্যত পেশা হিসেবে বেছে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীকে "মালয়েশিয়া সার্টিফিকেট অব এডুকেশন" (Malaysia Certificate of Education) নামক পাবলিক একজামিনেশনে অংশগ্রহণ করতে হয়।

**মাধ্যমিক স্তর উত্তর শিক্ষা ঃ**

এ স্তরের শিক্ষাকাল ২ বছর। ১২ তম এবং ১৩ তম গ্রেড। মাধ্যমিক স্তর উত্তর শিক্ষার দুটি ধারা, একটি হল সিক্সথ ফরম এবং অপরটি হল ম্যাট্রিকুলেশন।

১. সিক্সথ ফরম এর শিক্ষাকাল ২ বছর

২. ম্যাট্রিকুলেশন ধারা শিক্ষাকার এক বা দুই বছর।

**জাপান ঃ**

সাংবিধানিক আইন অনুসারে কিন্টার গার্টেন হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত জাপানে শিক্ষা পরিচালিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তথা ইংল্যান্ডের সমসাময়িক কাল থেকেই জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বর্তমানে এদেশে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। ৯ বছরের সকল ছেলেমেয়ে যারা স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ তাদের জন্য বাধ্যতামূলক।



www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ৪ পর্যায়ে দেয়া হয়। যেমন ঃ-

| | |
|---|---|
| ১. প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ এলিমেন্টারি শিক্ষা | ঃ ৬ বছর (৬-১২ বছর পর্যন্ত) |
| ২. জুনিয়র হাইস্কুল শিক্ষা | ঃ ৩ বছর |
| ৩. সিনিয়র হাই স্কুল শিক্ষা | ঃ ৩ বছর |
| ৪. উচ্চ শিক্ষা | ঃ সাধারণত ৪ বছর। |

**মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ**

৭ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। জুনিয়র হাইস্কুল-এ ৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার পর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা সিনিয়র স্কুলে ভর্তি হয়।

**সিনিয়র স্তর ঃ**

জাপানের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর বাধ্যতামূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। আর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নামে পরিচিত। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সংগঠিত। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ের ভিত্তিতে শিক্ষাস্তরকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ঃ-

১. সাধারণ শিক্ষা

২. বিশেষ শিক্ষা ঃ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, মাৎস্য, চারুকলা ও অন্যান্য ধরনের বৃত্তিমূলক ও পেশামূলক শিক্ষা।

**উচ্চ শিক্ষা ঃ**

উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, জুনিয়র মহাবিদ্যালয়, প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয় ও বিশেষ প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় রয়েছে।

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছরের স্নতক ও ২ বছরের স্নাতোকত্তর ডিগ্রী ও ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

২. নিম্ন মাধ্যমিক বলেজ ২ থেকে ৩ বছর মেয়াদে বিভিন্ন কোর্স প্রদান করা হয়।

৩. প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়, বনকৌশল, নৌ বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ রয়েছে।

**ইংল্যান্ড ঃ**

ইংল্যান্ডের শিক্ষা শুরু হয় ধর্ম যাজকদের প্রচেষ্টায়, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সহযোগিতায় এগিয়ে আসে এবং পরবর্তী কালে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সহায়তা দান করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আরও উদ্দেশ্যমুখি ও কার্যকরী করার জন্য শিক্ষা প্রশাসন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নেয়।



www.pathagar.com

**মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ**

রোমান শাসন আমলে ইংল্যান্ডে গ্রামার স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু হয়। ১১ হতে ১৮ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদেরকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় এ শিক্ষা দেয়া হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সিরিল নরউডের কমিটি শিক্ষার্থীর সামর্থ ও অভিরুচি অনুসারে তিন বছরের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেণ-

১. সাধারণ শিক্ষার জন্য গ্রামার স্কুল

২. বিজ্ঞান ধর্মী শিক্ষার জন্য স্কুল

৩. কোন কারিগরি শিক্ষার জন্য মর্ডান স্কুল।

সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল গুলো দু'ধরনের হয়ে থাকে। জাতীয় তহবিল হতে অনুদান প্রাপ্ত স্কুলগুলো দু'ভাগে পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমনঃ-

ক. স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত

খ. ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

এখানে সরকারি সাহায্য পুষ্ট তিন ধরনের বিদ্যালয় রয়েছে ঃ-

১. কাউন্টি স্কুল ঃ

এ ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যাই বেশি।

২. ভলান্টারি স্কুল ঃ

মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় এবং অংশত সরকারি আর্থিক সাহায্য পুষ্ট।

৩. সরকারি কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞান দপ্তর হতে সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়।

**গ্রামার স্কুল ঃ**

গ্রামার স্কুল বহু শতাব্দি ধরে ইংল্যান্ডে মাধ্যমিক শিক্ষাদান করে আসছে। এগুলো ঐতিহ্যবাহী স্কুল বলে পরিচিত মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশ না থাকলেও কিছু প্রভাব গ্রামার স্কুলের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি নিয়ন্ত্রণ করে।

**প্রথমত ঃ**

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নের পূর্বে প্রস্তুতি প্রদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রামার স্কুলের পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করা হয়।

**দ্বিতীয়ত ঃ**

ট্রেনিং কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য উচ্চ পেশামূলক সংস্থা ও গ্রামার স্কুলের শিক্ষাক্রম প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে।

**মর্ডাণ স্কুল ঃ**

এ সব মূলত পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়। আধুনিক অর্থনৈতিক ও শ্রম জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এসব বিদ্যালয়ে কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়। মিল বা



www.pathagar.com

কলকারখানা, দোকান, ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান, মাল বহন, খামার ইত্যাদির জন্য মাধ্যমিক স্তরের শ্রম দক্ষতা উপযোগী শিক্ষা মর্ডাণ স্কুল গুলোতে দেয়া হয়। এ স্কুলের শিক্ষা শেষে অনেকে চাকরি গ্রহণ করে।

**কারিগরি বিদ্যালয় ঃ**

বিশ শতকের প্রথম দিকে জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। স্পেন্স রিপোর্ট এদের টেকনিক্যাল হাইস্কুলে উন্নীত করার সুপারিশ করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইনে এদের পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক স্কুলের মর্যাদা দেয়া হয়। দুই বা তিন বছরব্যাপী কারিগরি শিক্ষা দেয়া হয়। সাধারণত শিক্ষার্থীদের বয়স ১৩ বছর ধরা হয়। এসব স্কুলের শিক্ষাক্রম হল বিশেষ শিল্প নির্ভর গণিত ও বিজ্ঞান। তাছাড়া অন্যান্য সাধারণ বিষয় যথা ঃ- ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদিও পড়ানো হয়। মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ বিষয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কারিগরি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়।

**তৃতীয়ত ঃ**

এ সব বিদ্যালয়ের ভবনও অনেক ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট ও অনুপযোগী ছিল। এসব কারনে ষাট দশক হতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য গ্রামার ও মর্ডাণ স্কুলের কোর্স শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উপযুক্ত তিন শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সকল শ্রেণীর সামর্থ ও অভিরুচি অনুযায়ী যথেষ্ট মনে না হওয়ায় আরও কয়েক ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। যেমন ঃ-

১. কম্প্রিহেনসিভ স্কুল
২. বাইল্যাটারাল স্কুল
৩. মাল্টির‍্যাটারেল স্কুল
৪. কমন স্কুল

**১. কম্প্রিহেনসিভ স্কুল ঃ**

শ্রমিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইংল্যান্ডে কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের প্রসার ঘটে। এ কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের মূল লক্ষ্য ছিল সব সামাজিক শ্রেণীর ও সকল মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন তরুণ-তরুণীদের একই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে সামাজিক ঐক্য স্থাপন করা।

**২. বাইল্যাটারাল স্কুল ঃ**

গ্রামার, মর্ডাণ ও কারিকরি এ তিন ধরনের বিদ্যালয়ের যে কোন দু'টিকে একই বিদ্যালয়ের আওতায় নানা ধারনের দ্বিমুখী স্কুল রয়েছে।



www.pathagar.com

**৩. মাল্টির‍্যাটারেল স্কুল ঃ**

বিভিন্ন প্রকৃতির মাধ্যমিক শিক্ষাকে একই বিদ্যালয়ের আওতায় আনয়নকেই বলা হয় মাল্টির‍্যাটারেল স্কুল।

**৪. কমন স্কুল ঃ**

এগুলো মর্ডাণ স্কুল গুলোর সমতুল্য। নতুন কিছু নয়।

**বেসরকারি স্কুল ঃ**

ইংল্যান্ডের বেসরকারি স্কুলগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানকার বেসরকারি স্কুলগুলো প্রধানত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রদান করে। বেসরকারি স্কুলগুলোকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ-

১. স্বাধীন
২. অন্যান্য

**স্বাধীন স্কুল ঃ**

স্বাধীন স্কুলগুলো অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে সরকারি সাহায্য লাভ না করলেও মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। এসব বিদ্যালয়কে রেজিস্ট্রি এবং জাতীয় শিক্ষার মান রক্ষা করতে হয়। গ্রেট বৃটেনের প্রায় পাবলিক স্কুলই এ দলে পড়ে।

**পাবলিক স্কুল ঃ**

এসব স্কুল ইংল্যান্ডের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করে শিক্ষার্থীদের চরিত্র ও নেতৃত্ব গঠনে যোগ্য ভূমিকা পালনে পাবলিক স্কুলগুলো সুখ্যাতি লাভ করে আসছে। ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদদের অনেকেই এ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র।

**অন্যান্য স্বাধীন স্কুল ঃ**

পাবলিক স্কুল ছাড়া অন্যান্য স্বাধীন স্কুল রয়েছে। এসব শিক্ষাক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মেনে চলে। কোন কোন স্কুল মন্ত্রণালয় হতে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। তবে বিনিময়ে এক চতুর্থাংশ আসন স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মনোনিত শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হয়।

**আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঃ**

যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় অথবা জাতীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়। আমেরিকার সংবিধান অনুযায়ী যখন ফেডারেল সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের



www.pathagar.com

মধ্যে ক্ষমতা বন্টন হয় তখন শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয় অঙ্গরাজ্যের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় তিনটি ধাপ। যথা ঃ-

১. প্রাথমিক
২. মাধ্যমিক
৩. উচ্চ শিক্ষা

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা ঃ-

১ ৪ বছর হাইস্কুল
২. কম্বাইন্ড জুনিয়র ও সিনিয়র হাইস্কুল
৩. সিনিয়র হাইস্কুল
৪. কমিউনিটি কলেজ
৫. জুনিয়র কলেজ

**জুনিয়র হাইস্কুল ঃ**

বিশ শতকের প্রথম ভাগে আমেরিকায় জুনিয়ার হাইস্কুল গড়ে ওঠে। ১৩ হতে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের চাহিদা পূরণ, পরিবেশের সঙ্গে তাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে জুনিয়র হাইস্কুল গড়ে ওঠে।

**সিনিয়র হাইস্কুল ঃ**

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অবৈতনিক জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা। ১৬-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। বর্তমনে ১৬ হতে ১৮ বছর বয়সী শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যয়ন করছে।



www.pathagar.com

# "নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন শিক্ষা" প্রাণহীনদের মত

**ভূমিকা ঃ**

মানব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের ভয়াবহ হতে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য আজ সর্বময় প্রচেষ্টার নৈতিক অগ্রগতি অর্জনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। নৈতিক অগ্রগতি সব সময় কল্যানকর মূল্যবোধের সম্প্রসারক এটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নের বিশেষ সূচক হিসেবে গৃহীত।

**নৈতিকতা বা Morality ঃ**

মানুষের বিমূর্ত চেতনার একটি কল্যাণকর প্রতিফলন হল নৈতিকতা। এটি ব্যক্তি মানবের প্রতিফলন হিসেবে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের ন্যায় ভাল সুবিচারের সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যায়ে সুসংগঠিত মূল্যবোধে উজ্জীবিত সকল কর্মচেতনাকেই নৈতিকতা বা Morality বলা হয়। একে নিচের রেখা চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

Morality → Moral Activities → Morality → Values
নৈতিক → নৈতিক ক্রিয়া → নৈতিকতা → মূল্যবোধ

**মূল্যবোধ বা Values ঃ**

মানুষের মূল্যবোধ হল তার নীতিবোধ, গুণাবলি, রুচিপ্রবণতা যা কাঙ্খিত এবং ভিতরে পালন করেন এবং বাইরে পালন করেন। মানব জীবনের প্রতিষ্ঠিত ধারণাসমূহ প্রথা, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতির রীতি নীতি, কার্যাবলী বা কল্যাণকর এবং অনুসরনযোগ্য তা নিজে পালন এবং বাস্তবায়নের চেতনাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ চেতনাটি মূল্য এবং বোধ এর সাথে সম্পৃক্ত তাই মূল্যবোধ বলতে ব্যক্তির জ্ঞানগর্ভ নৈতিকতাপূর্ণ আচরণকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ মানব জীবনের কাঙ্খিত সৌহার্দপূর্ণ এবং বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিকতাপূর্ণ আচরন গুলোকেই মূল্যবোধ বা Values বলা হয়।

যেমন ঃ- মূল্যবোধ হতে পারে স্বচ্চতা, সত্যবাদিতা, পরিচ্ছন্নতা, পরোপকারিতা, অধ্যবসায়, শান্তি প্রিয়তা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা, আনুগত্য ইত্যাদি।

ম্যাকাইভার এন্ড পেজ এর মতে, "মূল্যবোধ হল পরিবেশ পরিস্থিতির পেক্ষাপটে ব্যক্তির সাধারণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ সৃষ্টিকারী জৈব মানসিক প্রবণতা।"

উডওয়ার্ক এর মতে, "মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির জৈব মানসিক প্রবণতার সামঞ্জস্যকারী আচরনের সমষ্টি যা সকল ক্ষেত্রেই কাঙ্খিত।"



www.pathagar.com

**শিক্ষার সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক ঃ**

মানব সমাজে ব্যক্তি মানবের কল্যাণকর ক্রিয়াকেই নৈতিক ক্রিয়া বা Moral Activities বলা হয়। ব্যক্তির নৈতিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়, শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ, মমত্ববোধ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে ন্যায়, সুবিচার, সুশাসন এবং ভাল এর প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক শিক্ষণ অত্যাবশ্যক। শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল সমাজে ব্যাপক নৈতিকতার প্রতিফলনের মাধ্যমে সুবিচার সুশাসন প্রতিষ্ঠাকরণ। যাতে করে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ জীবনের অধিকারী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। কাজেই শিক্ষার নৈতিকতা বলতে শিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মানবীয় মূল্যবোধ নির্ভর কাঙ্খিত চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠাকরণ এর সামগ্রিক প্রক্রিয়াকেই বোঝানো হয়।

অর্থাৎ শিক্ষার বৈচিত্র্যময় এবং বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্ধারিত জীবন দর্শনের ভিত্তিতে মূল্যবোধ নির্ভর চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করে আদর্শ জীবনে উজ্জীবিত করার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকেই শিক্ষায় নৈতিকতা বা Morality in Education বলা হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে মানবীয় কল্যানকর সামগ্রিক চেতনা, এর মাধ্যমে মানব সমাজে নৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত আদর্শ জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রে মমত্ববোধ এবং জনকল্যানকর কর্মসূচির বাস্তবায়ন হয়। শিক্ষায় নৈতিকতার চেতনাকে নিচের রেখা চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা যায়। যেমন ঃ-

শিক্ষা - জীবন দর্শন → মূল্যবোধ → নৈতিকতা → আর্দশ জীবন।

অতএব, বলা যায় যে, শিক্ষার সাথে নৈতিকতার অতি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

**শিক্ষার সাথে মূল্যবোধের সম্পর্ক ঃ**

মানুষের কল্যাণের জন্য মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিককালে মানুষের জীবন বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। মূল্যবোধের অবক্ষয় এমন কিছু সমস্যার জন্ম দেয় যেগুলো মানুষের শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ জীবন যাপনকে বিঘ্নিত করে। প্রকৃত পক্ষে মূল্যবোধ বিবর্জিত কার্যকলাপের কারনেই সব ধরনের সামাজিক অপরাধ সংগঠিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত থেকে সমষ্টিগত পর্যায়ে মূল্যবোধ শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বাধে মূল্যবোধ শিক্ষা এবং বাস্তবে এর প্রয়োগ ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজন। মূল্যবোধ শিক্ষার উদ্দেশ্য মানব সম্প্রদায়ের নৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি করা। বর্তমান বিশ্বে মূল্যবোধের অবক্ষয় অর্থাৎ নৈতিকতার সংকট একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। বাস্তব দৃষ্টিতে মূল্যবোধ না নৈতিকতা মানব সভ্যতার অন্যতম উপাদান। বিশেষভাবে মূল্যবোধই সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাই মূল্যবোধ শিক্ষা অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই যে,



www.pathagar.com

ব্যক্তিগত, সামাজিক তথা সার্বজনীন পর্যায়ে নৈতিকতা বা মূল্যবোধ মানব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গুণ। পশু হতে মানুষের পার্থক্যকল্পে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে নৈতিকতা একটি মূল বিষয় এবং মূল্যবোধ শিক্ষাই হল এর উৎস।

মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ তার মধ্যে সমাজের অন্যান্যর প্রতি ভালবাসা, স্নেহ মমতা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা বোধের গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে পারে। একমাত্র মূল্যবোধ শিক্ষাই পারে ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গকে সব ধরনের সামাজিক ন্যায় বিচার সম্পাদনে সহায়তা করতে। মূল্যবোধ শিক্ষা ব্যতীত ব্যক্তিগত, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন গণতান্ত্রিক ন্যায় বিচার ও ভাল প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তির অনৈতিক গুনাবলী এবং কার্যকলাপ সমাজের অন্যজনকে মারাত্মকভাকে প্রভারিত করে। অনাচার, অসততার মত নেতিবাচক মূল্যবোধগুলো স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ব্যক্তির হতে সামাজিক, সামাজিক হতে জাতীয়, জাতীয় হতে আর্ন্তজাকিত পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করে। কারণ তার খারাপ কার্যকলাপগুলো নীতি জ্ঞানকে ধ্বংস করে। মূল্যবোধ শিক্ষার অভাবে বিভিন্ন সমাজ ও জাতি তথা সমগ্র বিশ্ব নিদারুণভাবে অন্যায়, অসততা, অবিচার ও সর্বপ্রকার দুরাচার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। ইতিহাস হতে দেখা যায় যে, মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়েও অনৈতিকতা ছিল যা বর্তমানেও আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এর মাত্রার গভীরতা নিয়ে। দুঃখজন ব্যাপার হল যে, বর্তমানে অনেক দেশ ও সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় আশংকাজনক ভাবে বেশি। বিচ্ছিন্নভাবে নয় বরং সামগ্রিকভাবে নৈতিক অবক্ষয়ের কারণসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে এবং অবক্ষয়ের সূত্র উদঘাটন করতে হবে। এজন্য বিদ্যালয়ে নৈতিকতা শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

**বর্তমান শিক্ষার সাথে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবস্থা ঃ**

বর্তমানে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি সংকট হচ্চে মূল্যবোধের। বিশ্বাসের এবং সর্বোপরি চারিত্রিক দৃঢ়তার। আজকের দিনে শহরে, গ্রামে, সমাজে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এমন কি পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে মূল্যবোধ শব্দটি ভয়ানক ভাবে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান ধারণা উপেক্ষিত, অবহেলিত এমনকি পরাভূত ও পদদলিত হচ্ছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বক্ষেত্রেই দায়িত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হচ্ছে। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে মানুষ আজ বিভিন্ন ধরনের দূর্নীতিতে লিপ্ত হচ্ছে। নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে দায়ী করলে চলবে না। নৈতিক অবক্ষয়ের পেছনে অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি কাজ করছে তা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসংযম। সামাজিক অস্তিরতার সাথে সাথে যখন দূর্ভোগ বৃদ্ধি পায় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছে নৈতিকতার প্রশ্ন গৌন হয়ে দাঁড়ায়। কোন অবস্থাতেই নৈতিকতা বিসর্জন দেবনা এমন চারিত্রিক



www.pathagar.com

দৃঢ়তা আছে তারা নিঃসন্দেহে নমস্য কিন্তু তার শতকরা কয়জন জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করেন।

মূল্যবোধ ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষা ব্যক্তির আচরণ পরিচালিত করে। আর এ দুইয়ের সমন্বয়ে ব্যক্তি যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পূরণে ভূমিকা রাখে। তাইতো বলা যায় শিক্ষার্থীকে আদর্শরূপে গড়ে তুলতে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

**উপসংহার ঃ**

আমাদের জীবনে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশি আর বিশ্বাসের প্রভাবেই আমরা ধর্মীয় কর্মকান্ডে অনেক বেশি ব্রত হই। মূল্যবোধ ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। পরিশেষে বলা যায়, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে নৈতিক অগ্রগতি হাসিল করার ক্ষেত্রে অবশ্যই উপযোগি শর্তাবলির অনুসরণ একান্ত আবশ্যক। এর জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এদের অনুসরণ অনুকরণ করে একজন সাধারণ মানুষ উত্তম মানুষে পরিণত হতে পারেন।



www.pathagar.com

# "প্রচলিত শিক্ষাক্রমের সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন।"

**ভূমিকা ঃ**

শিক্ষাক্রম যতই উত্তম হউক না কেন, বাস্তবায়নে ত্রুটির জন্য অনেক সময় তা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এছাড়া শিক্ষাক্রম উন্নয়ন অপেক্ষা বাস্তবায়ন একটি জটিল কাজ। কারন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে হাজার হাজার স্কুল, ছাত্র, শিক্ষক শিক্ষা সুপারভাইজার, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসন সম্পৃক্ত থাকে। তাই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সকলকে সম্পৃক্ত করে বিশদ ও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুসারে বিস্তারণের ব্যবস্থা করতে হয়।

**পরিমার্জন ও নবায়ন ঃ**

সময় এবং চাহিদার প্রেক্ষাপটে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের তাগিদে শিক্ষাক্রমের শিক্ষণ শিখন বিষয়বস্তুর নতুনত্ব আনার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম বিশারদগণের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের যে পরিবর্তন পরিবর্ধন কিংবা নবায়ন করার সার্বিক ব্যবস্থাপনা গ্রহন করা হয় তাকেই শিক্ষাক্রম-এর সংস্করণ বা শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর সংস্কার বলে। একে আবার শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন হিসেবে অভিহিত করা হয়। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন কাজ যা সময়ের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সুসম্পন্ন করা হয়।

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন নির্ধারিত শিক্ষা বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত ব্যক্তি বর্গের সমন্বিত কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করা হয়। এটি সময় সাপেক্ষ এবং উন্নয়ন চেতনা নির্ভর। শিক্ষাক্রমের পরিমার্জনে শিক্ষার নতুন লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও চেতনার প্রতিফলন ঘটানো হয়। এর জন্য নতুন অর্থ বরাদ্দ এবং উপকরণাদিতে সংযোজন করা আবশ্যক হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমকে যুগ উপযোগী করা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমকে সময় উপযোগী করা হয়। এর বিষয়বস্তুতে সর্বাধুনিক চাহিদা নির্ভর বিষয়বস্তুর সংযোজন করা হয়।

**শিক্ষাক্রম পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা ঃ**

শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার সকল কর্মকান্ডের "কেন্দ্রবিন্দু বা নিউক্লিয়াস" হল শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম ব্যতীত শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষাক্রম ছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রম ধারাবাহিক ও সঠিকভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রম হচ্ছে শিক্ষাক্রম কল্পনারই অংশ বিশেষ। এর প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ ঃ



www.pathagar.com

**জরুরী বিষয় বাছাই ঃ**

যে বিষয় বা জ্ঞান সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সনাক্ত করে।

**বিষয় বস্তুর বিন্যাস ঃ**

সমাজ ও ব্যক্তির প্রয়োজনে শিক্ষার বিষয়বস্তু বিন্যাসে সহায়তা করে। সনাক্তকৃত বিষয়বস্তু সহজ থেকে কঠিন এ নীতি অনুসারে বিন্যাস করে।

**বিষয়বস্তু নির্ধারণ ঃ**

সকল শিক্ষার্থীর গ্রহন ক্ষমতা অনুসারে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে। শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহন ও ধারণ ক্ষমতা অনুসারে কাজের মাত্রা ঠিক করে।

**শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ**

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের গুণগত মান উন্নতি করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার করে।

**শিশুর/শিক্ষার্থীর সর্বমুখী বিকাশ ঃ**

বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন প্রকার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বসুখী বিকাশের ব্যবস্থা করে।

**পদ্ধতি নির্ধারণ ঃ**

শিক্ষক কি পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করেন, তা ঠিক করে।

**সুনাগরিক গড়ে তোলা ঃ**

শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তোলার শক্তিশালী কার্যকর পরিকল্পনা হল শিক্ষাক্রম।

**শিক্ষা ব্যবস্থার গতিশীলতা আনয়ন ঃ**

শিক্ষাক্রম শিক্ষা ব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, সময়োপযোগী, কর্মভিত্তিক, গতিশীল করে পূর্ণগঠন ও নিমার্ণ করার একটি নীল নক্সা।

**সার্বিক বিকাশ ঃ**

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে কখন, কী ও কতুটুকু শেখাতে হবে এবং কোন কোন বিষয়ে হাতে কলমে শিখবে শিক্ষাক্রম হল তারই রূপরেখা।



www.pathagar.com

**প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আলোচনা ঃ**

শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলবার শক্তিশালী ও কার্যকর পরিকল্পনা হল শিক্ষাক্রম। অন্যকথায় বলা যায় যে, শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেম্যমুখী, সময়োপযোগী, কর্মভিত্তিক, গতিশীল করে পুর্ণগঠন ও নিমার্ণ করার একটি নীল নক্সা বিশেষ। শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম ব্যতীত শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে কখন কি ও কতটুকু শেখাতে হবে এবং কোন কোন বিষয় হাতে কলমে শিখবে শিক্ষাক্রম হল তারই রূপরেখা।

গতানুগতিক শিক্ষাক্রমে পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হত। শিক্ষার লক্ষ্য ছিল খুবই সংকীর্ণ। শিক্ষাক্রম রচনার প্রধান ভিত্তি ছিল বিষয় কেন্দ্রিক অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়ের তত্ব আর তথ্য আয়ত্ত করাই ছিল শিক্ষার্থীর একমাত্র কাজ। শিক্ষার্থীর সর্বঙ্গীন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শরীর চর্চা ও খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি শিক্ষাক্রম সর্হিঃভুত বিষয় বলে গন্য হত। ফলে জীবনের চাহিদা এবং ব্যক্তিত্বের সামাজিক বিকাশ ঘটানোর পথে বাধা সৃষ্টি হত।

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে শিক্ষাক্রমকে ব্যাপক অর্থে গ্রহন করা হয়। পরিবর্তনশীল জীবন এবং বিবর্তনশীল শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাক্রমের ধারণার সম্পর্ক নিবিড়। শিক্ষার্থী যাতে তার অভিরুচি, প্রবণতা, সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলা করতে পারে তার সব কিছুই আধুনিক শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকে। অধিকন্তু শিক্ষার্থীর শিখন স্থিতিশীল করার জন্য পরিবেশকে ব্যবহার করার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া শিক্ষাক্রম এখন আর কয়েকটি সমষ্টি নয়। শিক্ষার্থীর দেহ মনের সার্বিক বিকাশের জন্য বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিষয় সমূহের সমষ্টি হচ্ছে শিক্ষাক্রম। তাই প্রচলিত শিক্ষাক্রম অর্থাৎ পুথিগত মুখস্ত বিদ্যার্জনের পরিবতে ব্যবহারিক কাজ ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

**উপসংহার ঃ**

যুগের চাহিদা প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্রমের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে থাকে। শিক্ষা ধারারও পরিবর্তন হয়। তখন শিক্ষাক্রমের ডিজাইন, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, সামগ্রিক অবয়ব, চেতনা, মূল্যায়নে ধারার নতুনত্বের সংযোজন হয়। কাজেই শিক্ষাক্রমের ধারণাগত ক্রমবিবর্তন চেতনায় নতুনত্ব আসবে এটাই সকলের প্রত্যাশা যেখানে রয়েছে নবায়ন চেতনা।



www.pathagar.com

# নেতৃত্ব (Leadership)

**ভূমিকা ঃ**

সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে তখন থেকেই নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে। কেননা সমাজের অধিকাংশ মানুষ নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সমাজের অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংখ্যক মানুষ নেতৃত্ব দেয়ার কাজে এগিয়ে আসে। সভ্যতা ও সমাজের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির সাথে সাথে মানুষের সামাজিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে কোন কাজ বা পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নেতৃত্ব প্রয়োজন। বর্তমান সমাজে যে ব্যাপক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড আমরা লক্ষ করি সেখানে ও সবাই সমানভাবে দায়িত্ব পালন করেন না। সবাই গতানুগতিক কাজ করেন, একটি ক্ষুদ্র অংশ তাদের পরিচালনা করেন। এই ক্ষুদ্র অংশই হলো "নেতৃত্ব"।

**নেতা কাকে বলে?**

সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হলে মানুষকে দল গঠন করতে হয়। দলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিকল্পনার জন্য যিনি নেতৃত্ব দেন তিনিই হলেন নেতা। সহজ কথায় বলতে গেলে যার অনুসারী আছে, তাকেই নেতা বলে। যার কথা লোকে মেনে চলে, যার আদর্শ নির্দেশ পেতে লোক পছন্দ করে, যার কাছে লোকে সিদ্ধান্ত কামনা করে তাকেই নেতা বলে।

সুতরাং একজন নেতার মাঝে অনেক গুনের সমাবেশ থাকতে হবে। কারণ, নেতা হলেন সমাজ বা দলের চালিকা শক্তির ধারক বাহক। নেতা মানুষকে ভালবাসবেন। তাঁকে যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তিনি হবেন কর্তব্যপরায়ন। তিনি তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার করে সমাজ বা দলকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেবেন।

**নেতৃত্ব কি?**

নেতৃত্ব একটি আপেক্ষিক ধারনা। এটি একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সুদূরপ্রসারী কোন উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে নেতা একটি দল পরিচালনা করে থাকেন। Leadership বা নেতৃত্ব বলতে পথ প্রদর্শন বা পরিচালনার কলা-কৌশলকে বুঝায়। নেতৃত্ব এমন একটি শক্তিশালী কৌশল যাতে দলীয় সদস্যরা তাদের সর্বাধিক সামর্থ অনুযায়ী উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে তৎপর হয়। সুতরাং নেতৃত্ব হলো কোন নির্বাহীর নির্দেশনা, পথ প্রদর্শন ও অন্যান্যদের কাজের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া।

নেতৃত্ব বিষয় নিয়ে উন্নত বিশ্বের পন্ডিতগন ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। বিভিন্ন লেখক, গবেষক ও চিন্তাবিদগণ নেতৃত্বের যে সংজ্ঞা প্রদান



www.pathagar.com

করেছেন তা পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে নেতৃত্ব হলো ঃ-

১. নেতৃত্ব হচ্ছে ব্যক্তি আচরণের এমন একটি গুন যা জনগণকে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় কাজ করতে প্রভাবিত করে।
২. একটি ব্যবস্থাপনা কৌশল
৩. একটি প্রভাব যার দ্বারা অনুসারীগণ অনুপ্রানিত হয়ে নেতার নির্দেশিত কাজগুলো করবে।
৪. নেতৃত্ব কোন ব্যক্তির এরূপ একটি গুণ যা অন্য সব ব্যক্তিকে অথবা তাদের সংগঠিত প্রচেষ্টায় পথ নির্দেশ করে।

নেতৃত্ব শুধুমাত্র তার অনুগামীদের আদেশ পালন করতেই বলেন না, প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তাদেরকে এমন যোগ্য করে তোলেন এবং এমনভাবে অনুপ্রাণিত করেন যে তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে ও উদ্দীপনার সাথে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে।

**নেতৃত্বেও ধরন/প্রকার ঃ**

রাষ্ট্র সমাজ উত্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণত যে সমস্ত নেতৃত্ব দেখা যায় সেগুলোকে বিশেষজ্ঞরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন এগুলো হলো ঃ

১. স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব
২. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব
৩. মুক্ত/উদার নেতৃত্ব

**নেতৃত্বের কার্যাবলী ঃ**

নেতা একটি প্রতিষ্ঠানের বা দলের কর্ণধার। কাজেই প্রতিষ্ঠান বা দলটিকে সুষ্ঠুরূপে দক্ষতার সাথে লক্ষ্য পথে পরিচালনা করার যাবতীয় কার্যবলী নেতৃত্বকে পালন করতে হয়। নেতৃত্বের কাজের বর্ণনা দেয়া সুকঠিন। কোন পরিস্থিতিতে তাকে কোন কাজ করতে হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়না। তবে সাধারণ অবস্থায়-নেতৃত্বকে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয় তা হলো ঃ

**১। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ**

যে কোন কাজ বা দলগত সমস্যা মোকাবিলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নেতৃত্বের একটি গরুত্বপূর্ণ কাজ। যে কোন জটিল পরিস্থিতিতে নেতাকে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

**২। পরিচালনা ঃ**

নেতাকে তাঁর দলের সদস্যদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে হয়। এজন্য তাঁকে নিয়মিত ভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ কর্মীরেদ নিকট প্রেরণ করতে হয়।



www.pathagar.com

**৩। বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ**

কর্মীদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে নেতার কাজ তা নিষ্পত্তি করা। উত্তম নেতার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো মতানৈক্যের অবসান ঘটিয়ে সর্বসম্মত ও সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত আসা।

**৪। কাজের ইংগিত প্রদান ঃ**

দলের কর্মীরা কিভাবে নিজ নিজ কর্তব্য কাজ সম্পন্ন করবেন নেতা তাঁর ইংগিত প্রদান করবেন। তিনি কর্মীদের দিয়ে এমনভাবে কাজটি করিয়ে নিবেন যেন তারা এটিকে আরোপিত দায়িত্ব মনে না করে। কিভাবে কাজটি করলে বাল হয় নেতা শুধুমাত্র তার ইংগিত প্রদান করবেন।

**৫। সাংগঠনিক ঃ**

নেতার কার্যাবলী সংগঠনের কার্যাবলী ও সংশ্লিস্ট কর্মীদের দায়িত্বের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। নেতার সৃজনশীল চিন্তা যেন সংগঠনের কর্মবন্টনের পরিপন্থী না হয় এবং এগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়াই নেতার দায়িত্ব।

**৬। প্রতিনিধিত্বকরণ ঃ**

নেতা তাঁর সংগঠনের মূখ্য ব্যক্তি বা প্রতিনিধি। সংগঠনের তিনিই মুখপাত্র। সকল ব্যাপারে তিনিই প্রতিনিধিত্ব করবেন। সংগঠন বা দল সম্পর্কে মানুষের ধারণা নেতাকে নিয়েই গড়ে ওঠে ফলে তাঁর সুনামে যেমন সংগঠন বা দল গর্ববোধ করে। তেমনি দুর্নাম ও সংগঠনকে হেয় করে।

**৭। অবহিতকরণ ঃ**

সঠিক নির্দেশ প্রদান করা নেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটি লিখিত ও মৌখিক দুই-ই হতে পারে। বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা, উপযুক্ত সময় ও স্থান নির্দেশাবলী পৌছানো নিশ্চেতকরণ নেতার দায়িত্ব।

**৮। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঃ**

নেতার তাঁর দলের সদস্যদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন এবং আপদ-বিপদ, দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি ও অনিশ্চিত অবস্থার বিপক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন।

**৯। গতি সঞ্চালক ঃ**

নেতা দলের গতি সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। নেতা তাঁর দলের চালিকা শক্তি। তার ভূমিকার কারনেই সংশ্লিষ্ট দল কাম্য গতিতে লক্ষ্যপানে চালিত হয়।



www.pathagar.com

**১০। প্রেষণা দান ও উৎসাহ প্রদান ঃ**

আদর্শ নেতা তাঁর অনুসারীদের উৎসাহ উদ্দীপনা যোগান। কর্মীরা কর্তব্য সম্পাদনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

**১১। কাজের স্বীকৃতি ও প্রশংসা ঃ**

সুসম্পাদিত কাজের জন্য স্বীকৃতি প্রদান ও প্রশংসা করা উত্তর নেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। স্বীকৃতি ও প্রশংসা কর্মীকে প্রণোদিত করে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রশংসা যেন অপাত্রে ঢালা না হয়। এতে সুযোগ্য কর্মীরা অসন্তুষ্ট হয় ও কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলে।

**১২। শাস্তি বিধান ঃ**

কাজে চরম অবহেলা, গাফিলতি, ইচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে নেতা শাস্তিও বিধান করে থাকেন। সাময়িক বরখাস্ত, চাকুরিচ্যুতি, পদাবনতি, বেতন কর্তন প্রভৃতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

**১৩। জবাব দিহিতা ঃ**

নেতাকে তার কাজের জবাবদিহিতা করতে হয় জনগণের কাছে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জায়গায় তাই নেতাকে জবাবদিহিতার জন্য নিজে প্রস্তুত থাকতে হয়, একই সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী ও তার অনুসারীদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখা দরকর।

**সক্রিয়/গ্রহণযোগ্য নেতা হয়ে উঠার কৌশল ঃ**

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি
২. অনুসারীদের আবেগ-অনুভূতি ও সমস্যা সম্পর্কিত ধারণা
৩. পরিবেশের প্রভাব
৪. উদ্দীপনা
৫. দায়িত্ব গ্রহণ
৬. আত্মসচেতনতা
৭. নেতৃত্বের প্রয়োজনে দক্ষতা ও গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন থাকা
৮. উদ্দেশ্যভিত্তিক সম্পর্ক
৯. পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীলতা
১০. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপস্থিতি
১১. যোগাযোগ নির্ভরশীলতা
১২. অনুসারীদের সাথে সহাবস্থান।
১৩. অনুসারীদের আনুগত্য।
১৪. ভুল থেকে শিক্ষা নেয়া।



www.pathagar.com

## মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার

### অধিকার ঃ

অধিকার স্বার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত; বস্তুতঃ অধিকার বলতে নৈতিক বা আইনগত বিধি বিধানের দ্বারা সংরক্ষিত সার্থকেই বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ অধিকার স্বার্থ বিশেষ। অন্য ভাবেও অধিকারকে ব্যাখ্যা করা যায়-

অধিকার বলতে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য কতিপয় সুযোগ-সুবিধার দাবিকে বুঝায়, যে দাবির হয় নৈতিক, না হয় আইনগত ভিত্তিক রয়েছে।

অধিকারকে ব্যাপক অর্থে দু'টো ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. নৈতিক অধিকার (Moral Right)

২. আইনগত অধিকার (Legal Right)

### নৈতিক অধিকার ঃ

যে অধিকারের ভিত্তি নৈতিকতা (Rule of natural justice) এবং যা ভঙ্গ করলে নৈতিক অপরাধ হয় তাকে নৈতিক অধিকার বলে। যেমন ঃ- সন্তানের নিকট হতে শ্রদ্ধালাভের নৈতিক অধিকার মাতা-পিতার রয়েছে।

### আইনগত অধিকার

যে অধিকার দেশের আইন (Positive law) দ্বরা স্বীকৃত এবং যা আইনগত ভিত্তিতে দাবি করা যায় এবং যা ভঙ্গ করলে আইনগত অপরাধ হয় তাকে আইনগত অধিকার বলে।

প্রখ্যাত আইন বিজ্ঞানী সেমন্ডের ভাষায় "আইনগত অধিকার আইনের বিধি বিধানের দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত স্বার্থ বিশেষ, যা লংঘন করা হলে স্বার্থের মালিকের প্রতি আইনগত অন্যায় করা হবে এবং যার প্রতি শ্রদ্ধা দেখান আইনগত কর্তব্য।" যেমন ঃ- নিজের বাড়ীর ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে নিয়মিতভাবে ভাড়া পাওয়ার আইনগত অধিকার বাড়ীওয়ালার রয়েছে। বাড়ীওয়ালার এই স্বার্থ আইনের দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়; এবং এই স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা ভাড়াটিয়ার পক্ষে আইনগত অন্যায় হবে।

### মানবাধিকার

মানবাধিকার বলতে মানুষের যে কোন অধিকারকে বোঝায় না; মানবাধিকার শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আইনগত ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেগুলোই মানবাধিকার যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে (As a human being) দাবি করতে পারে।

এ অধিকারগুলো কোন দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়;

এগুলো চিরন্তন এবং সার্বজনীন

পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ এ অধিকারগুলো নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে।



www.pathagar.com

## মানবাধিকারের প্রধান দু'টো বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

**সার্বজনীন সহজাততা (Universal inherence)**
**অহস্তান্তরযোগ্যতা (Inalienability)**

নাগরিক অধিকারগুলো রাষ্ট্র ছিনিয়ে নিতে পারে কিন্তু মানবাধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) গ্রহণ করে। এই ঘোষণায় ৩০টি মানবাধিকারের কথা বলা হয়। বা মানবাধিকার বলে পরিচিত।

**মৌলিক অধিকার**

যথা কতিপয় মানবাধিকারকে কোন দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সাংবিধানিক নিশ্চয়তা (Constitutional guarantees) দ্বারা সংরক্ষণ করা হয় তখন তাদেরকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। মৌলিক অধিকারগুলো সবই মানবাধিকার কিন্তু সব মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়।

**মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য ঃ**

| মানবাধিকার | মৌলিক অধিকার |
|---|---|
| ১. মানবাধিকারের ক্ষেত্র ব্যাপক | ১. মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ |
| ২. মানবাধিকারের উৎস হল আন্তর্জাতিক আইন | ২. মৌলিক অধিকারের উৎস হল কোন দেশের সংবিধান |
| ৩. মানবাধিকার কোন ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় | ৩. মৌলিক অধিকার নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ |
| ৪. মানবাধিকার বলবৎ করা যায় না। কারণ তা দেশের সংবিধান স্বীকৃত নয় | ৪. মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ করা যায়। কারণ আইন দ্বারা সেগুলো স্বীকৃত। |
| ৫. সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয় | ৫. সকল মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার |

বাংলাদেশের সংবিধানে ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। সংবিধানের ২৭ থেকে ৪৪ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে এগুলো লিপিবদধ করা হয়েছে।



www.pathagar.com

# জেন্ডার ধারণা

**জেন্ডার এবং সেক্স এর সংজ্ঞা**

মানুষের জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই শুরু হয় শিখন প্রক্রিয়া। একটি মানুষ যা করে, যেভাবে চিন্তা করে, যেভাবে জীবন পরিচালনা করে তা অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফল। শিশু শারীরিকভাবে নির্ধারিত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে এটা হলো লিংঙ্গ কিন্তু সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ এর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন আচরণ, ধারণা সৃষ্টি করে তাহ'লো জেন্ডার। উন্নয়ন আলোচনায় এই জেন্ডার শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেন এন ওকলে ১৯৭০ সনে। তিনি পুরুষ এবং মহিলাদের সামাজিকভাবে আরোপিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে বুঝতে গিয়ে এই জেন্ডার শব্দটা ব্যবহার করেন। জেন্ডার বলতে আমরা বুঝি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিধিতে নারী ও পুরুষকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমাজ যে পার্থক্য করে এবং যেভাবে তাদের সামাজিক ভূমিকা নির্ধারণ করে সেটাই হলো জেন্ডার।

জেন্ডারকে আরও পরিস্কারবাবে বুঝতে হলে জেন্ডার ও সেক্সের মধ্যকার পার্থক্যগুলো জেনে নেয়া দরকার ঃ

**জেন্ডার (Gender) এবং সেক্স (Sex) এর পার্থক্য ঃ**

| সেক্স (Sex) | জেন্ডার (Gender) |
|---|---|
| • নারী-পুরুষের জৈবিক সংজ্ঞা | • নারী-পুরুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা |
| • একে প্রাকৃতিক লিঙ্গ বলা যায় | • একে সামাজিক লিঙ্গ বলা যায় |
| • শারীরিকভাবে নির্ধারিত | • সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত |
| • অপরিবর্তনীয় | • পরিবর্তনীয় |
| • পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজে, সকল সময়ে একই রকম। | • দেশ, সমাজ, সময়ভেদে পরিবর্তনশীল ও ভিন্নতা রয়েছে। |

**বৈষম্য (Discrimination) কি?**

একই যোগ্যতা সম্পন্ন ২ জন ব্যক্তির মধ্যে যখন সম্পদ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ, মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অবসর যাপন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তখন তাকে বৈষম্য বলা যেতে পারে। এক কথায় সাম্যের অভাবই হচ্ছে বৈষম্য।



www.pathagar.com

**জেন্ডার বৈষম্য (Gender Discrimination) কি?**

"নারীর প্রতি বৈষম্য" বলতে বুঝায় নারী-পুরুষ ভেদে কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি করা, এর ফলশ্রুতিতে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধঃস্তন বা ছোট করে দেখা হয় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়। (সিডো: ধারা-১)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জেন্ডার একটি সম্পর্ক বিষয়ক শব্দ। সামাজিকভাবে গড়ে উঠা নারী-পুরুষের পরিচয় ধারণ করে এই শব্দ। যে সমাজ নারী-পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, সেই সমাজের জন্য সেই সকম্পর্কই জেন্ডার সম্পর্ক। তবে এই সম্পর্ক প্রায় ক্ষেত্রেই নারীকে ছোট বা হেয় করে দেখা হয়। যা খুবই বৈষম্যমূলক ব্যাপার। তাই এই সম্পর্ক পরিবর্তনযোগ্য। সমাজ ইচ্ছা করলে এই সম্পর্কের নানা অনুসঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে।

জেন্ডারের দ্বারা নির্দেশিক নারী-পুরুষের পরিচয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মূলত এই সম্পর্কে বৈষম্য তৈরি করে থাকে পুরুষতন্ত্র। শ্রেণী বৈষম্য ও বর্ণ বৈষম্যের মাধ্যমে একটি বিশেষ শ্রেণী বা বর্ণকে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সুবিধা ও অধিকার বঞ্চিত করা হয়। ঠিক তেমনি নারী হওয়ার কারণেও ঐ সকল বৈষম্যের শিকার হতে হয়। এর ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে তৈরী হয় বিভেদ। সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বের প্রগতি ও উন্নতির জন্য জেন্ডার বৈষম্য দূর করা একান্ত দরকার।

**বৈষম্যের ক্ষেত্র সমূহ ঃ**

| ক্ষেত্র | নারী |
|---|---|
| পরিবার | খাদ্য গ্রহণে, অবসর যাপন, মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, সুষম খাদ্য, সংসারের কাজে ও সন্তান ধারনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে |
| সমাজ | বিনোদন, খেলাধুলায় অংশগ্রহণে, স্বাধীন চলাফেরা, অধিকার, সামাজিক বিধিনিষেধ, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে, মুজুরী বৈষম্য, ধর্মীয় অনুশাসন, শিক্ষা, নেতৃত্ব দেয়া। |
| রাষ্ট্র | রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে, ভোটাধিকার, সম্পদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিধান, মজুরী, পেশাগত বৈষম্য, আইনগত বৈষম্য। |



www.pathagar.com

**মজুরী বৈষম্য কাকে বলে?**

অর্থনীতির ভাষায় কাজের বিনিময়ে নগদ মজুরী/ অর্থ উপার্জন করা যায় এমন কর্মকান্ডকেই শ্রম বলে অভিহিত করা হয়। তাহলে বলা যায় কাজ/শ্রমের বিনিময়ে যে নগদ অর্থ বা কোন দ্রব্য পাওয়া যায় তাই মজুরী। এখন সম পরিমাণ কাজ করার পর যদি ২জন ব্যক্তির মধ্যে ( নারী ও পুরুষ পুরুষ-পুরুষ, কিংবা নারী-নারী ও হতে পারে) যদি মজুরীর তারতম্য হয় তখন তাকে মজুরী বৈষম্য বলে।

**স্বাস্থ্যগত বৈষম্য**

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং সে ব্যবস্থার মধ্যে নারীর অবস্থান নারীর স্বাস্থ্যের প্রধান নির্ধারক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর অন্যান্য বিষয় গুলির মতো তার স্বাস্থ্য যেমনঃ খাদ্যাভাস এবং প্রজনন স্বাস্থ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

**জেন্ডার সমতা (Gender Equality)**

জেন্ডার সমতা নারী-পুরুষের সম অধিকার, সম মর্যাদা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার নীতিকে প্রকাশ করে। এটি নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দুর করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেয়ার ওপর জোর দেয়। জেন্ডার সমতা বলতে আমরা বুঝি নারী ও পুরুষের জন্য সমান অধিকার, দায়দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা। অর্থাৎ জেন্ডার অসমতার ঠিক বিপরীত হলো জেন্ডার সমতা।

তবে জেন্ডার সমতা মানে নারী ও পুরুষের অভিন্নতা বা সমরূপতা বা একই রকম হওয়া নয়। কেননা নারী ও পুরুষের জীবনের মধ্যে কতগুলো ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। যেমনঃ পুরুষ বাবা হয় এবং নারী মা হিসাবে সন্তান জন্ম দেয়। জেন্ডার সমতা নারী ও পুরুষের এই ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দেয়।

**কেন জেন্ডার সমতা**

- জেন্ডার সমতা অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে;
- জেন্ডার সমতার জন্য বিনিয়োগ আসলে ধাবিত হয় টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকি। তা পরিবারের উন্নয়ন ঘটায়, দারিদ্র্য কমায় এবং উন্নয়নের আর্থ-সামাজিক সুফল অনেক বেশী সমভাবে বা সুষমভাবে বন্টন করে।
- জেন্ডার সমতার নীতিমালা সুনির্দিষ্টভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যকার অসমতা বা বৈষম্যকে আঘাত হানে এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের কাছেই উন্নয়নের সুফল নিশ্চিত করে।



www.pathagar.com

- জেন্ডার সমতার দ্বারা নারীর উৎপাদনমূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- জেন্ডার সমতা কেবল গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যই নয়; তা একই সঙ্গে মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারেরও বিষয়।
- জেন্ডার সমতা বৃদ্ধিকারী দেশগুলো অন্যান্য দেশের তুলনায় কম দুর্নীতিগ্রস্ত হয় এবং প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

**জেন্ডার বৈষম্য দুরীকরণ এবং জেন্ডার সমতায় প্রতিষ্ঠার কৌশল/করণীয় ঃ**

| ক্ষেত্র | কৌশল/করণীয় |
|---|---|
| পরিবার | - মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে উভয়ের সমান সুযোগ থাকা এবং সমান সুযোগ তৈরী করা ৎ<br>- গৃহ কাজে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দায়িত্ব পালন করা<br>- পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করা<br>- নারীর শিক্ষার সুযোগ তৈরী করা<br>- পারিবারিক পরিসরে অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরী না করা<br>- কন্যা সন্তানের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া<br>- সংসারের ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেয়া |
| সমাজ | - নারী-পুরুষ উভয়কে সচেতন করে তোলা<br>- সামাজিক পর্যায় গণসচেতনতা সৃষ্টি<br>- নারীর অধিকারের পক্ষে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিকগুলো তুলে ধরা।<br>- সংবিধান ঘোষিত নারী-পুরুষের সমঅধিকারের কথা জানানো।<br>- শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি (বিশেষ করে লোকসংস্কৃতি) থেকে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক উদাহরন টেনে আনা।<br>- প্রচলিত বৈষম্যমূলক সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তন<br>- নারী-পুরুষের সমান মুজুরী দেয়া নিশ্চিত করা<br>- নারীর কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ<br>- সমাজে নারীর চলাফেরার অধিকার নিশ্চিত করা<br>- নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্য কাজ করা<br>- বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রবেশাধিকার ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা<br>- নারী-পুরুষের সমতা বা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সুফল বর্ণনা করা। |



www.pathagar.com

| ক্ষেত্র | কৌশল/করণীয় |
|---|---|
| রাষ্ট্র | - নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নীতি নির্ধারকদের সাথে এডভোকেসী করা<br>- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি<br>- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা<br>- নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য চাপ প্রয়োগ<br>- নারীর আইনগত সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা<br>- নারীর নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা<br>- উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা পদে নারীদের নিয়োগ প্রদান<br>- বেসরকারী সংস্তা সমূহের এ বিষয়ে বিশেষ কর্মসূচীগ্রহণ করার জন্য সরকারি সহযোগিতা।<br>- সার্বজনীন পারিবারিক আইন প্রণয়নে উদ্যোগ প্রহণ<br>- বৈষম্যমূলক আইনের অপনোদন<br>- নতুন আইন প্রণয়ন এবং আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন |



www.pathagar.com

# শিক্ষার্থীর শিখন পর্যালোচনা

**ভূমিকা ঃ**

আমার বি. এড. প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে পাঠদান অনুশীলনের জন্য ০৬/০৯/১১ ইং তারিখ হতে ২০/০৯/১১ ইং তারিখ পর্যন্ত আলীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ছিলাম। নারায়নগঞ্জ জেলার ফতুল্লায় অবস্থিত। এটি বাংলাদেশে সরকার অনুমোদিত বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে সর্বমোট ১৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন। বিদ্যালয়ে ৮টি শাখা নিয়ে মোট শিক্ষার্থী ১০০০। আমি বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে মোট ৯০টি ক্লাস নিয়েছি।

শিক্ষার্থীরা শিখন পর্যালোচনার লক্ষ্যে ২ জন শিক্ষার্থী (একজন মেধাবী এবং একজন দূর্বল) বেছে নিয়ে তাদের কর্মতৎপরতার উপর জরিপ করা হয়।

**কেস স্টাডি ঃ ১**

একজন দুর্বল শিক্ষার্থীর শিখন পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদ।

**ভূমিকা ঃ**

শিক্ষার্থীর শিখন পর্যালোচনার লক্ষ্যে একজন মেধাবী এবং একজন দূর্বল শিক্ষার্থীর আচরণ লক্ষ্য করে তাদের কর্ম তৎপরতার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধন করা যা এখানে একজন দূর্বল শিক্ষার্থীর প্রতি নিবন্ধন করে সে দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে নিম্নে তা দেয়া হলো ঃ-

| | |
|---|---|
| শিক্ষার্থীর নাম | ঃ মারিয়া আক্তার |
| শিক্ষার্থীর রোল | ঃ ১২ |
| শিক্ষার্থীর শ্রেণী | ঃ ৬ষ্ঠ |
| বিদ্যালয়ের নাম | ঃ আলগিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ |
| পিতার নাম | ঃ রফিকুল ইসলাম। |
| পিতার পদবী | ঃ ব্যবসায়ী। |
| মাতার নাম | ঃ ফাতেমা বেগম |
| মাতার পদবী | ঃ গৃহিনী। |
| ঠিকানা | ঃ আলীগঞ্জ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ |



www.pathagar.com

**শ্রেণীতে অন্তভুক্তি বা সংশ্লিষ্টতার মাত্রা ঃ-**

শিক্ষার্থী অত্র স্কুলে একজন দূর্বল ছাত্রী নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না। শ্রেণীতে যথেষ্ট অমনোযোগী। শিক্ষার্থীটি প্রায়ই পিছনের সারিতে বা বেঞ্চে বসে। নিজের পাঠদানে মনযোগী হয়না এবং অন্যদের পাঠগ্রহণে মনযোগী হতে দেয় না। সকলের উদ্দেশ্যে নির্দেশিত প্রশ্ন করা হলে তার থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। সে প্রতিদিন বাড়ির কাজ করে না। বোর্ড থেকে সঠিক তথ্য সে নিয়মিত খাতায় তুলে নেয় না। দলগত কাজে সে মনযোগ তো দেয়ই না বরং পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না।

**প্রাতিষ্ঠানিক কাজের বিশ্লেষণ ঃ**

মারিয়া বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসে না। প্রতিদিনের পড়া বা বাড়ীর কাজ নিয়মিত ভাবে করে না। শিক্ষকের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে না। পড়াশুনার প্রতি তার তেমন কোন আগ্রহ নেই। কোন বিষয় না বুঝলে কারও নিকট থেকে সাহায্য সহযোগিতা নেয় না।

**সবল দিক ঃ**

* মারিয়া ভাল ছবি আঁকতে পারে।
* ভাল গান গাইতে পারে।

**দূর্বল দিক ঃ**

শিক্ষার্থীর নিকট জানতে চাওয়া হলো তার নিকট পড়া কঠিন বা বুঝতে অসুবিধা হয় এমন বিষয় আছে কি? শিক্ষার্থীর উত্তর ঃ ইংরেজী ও গণিত। শ্রেণীতে সে সময়টুকু বুঝতে পারে তাতে মনে হয় সে বিষয়গুলোর উপর কোন গৃহশিক্ষক নেই। মা অল্প শিক্ষিত। মা ভালোমতো পড়া বোঝাতে পারে না। তাছাড়া তার হাতের লেখা খারাপ ও অসংখ্য বানান ভুল হয়।

**শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার ঃ**

* প্রিয় পাঠ্য বিষয় কি?

উ ঃ বাংলা ও সাধারণ বিজ্ঞান।

* এই সপ্তাহে শ্রেণীতে ভাল কিছু ঘটেছে কি?

উঃ এই সপ্তাহে আমাদে বাংলা ক্লাশে পাঠদানের বিষয় বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট উপকরণের ব্যবহার দেখতে পেয়েছি। যা ভালো লেগেছে।

* বাবা মা শ্রেণীতে দেয়া বাড়ী কাজ দেখেন কি?

উঃ মাঝে মাঝে দেখেন, তবে ব্যস্ততার কারনে দেখতে পারেন না।

* বাসায় পড়াশোনা করার জন্য কোন সমস্যা হয় কিনা?

উঃ মাঝে মাঝে সমস্যা হয়। বাবা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তিনি আমাকে সময় দিতে পারেন না।



www.pathagar.com

**ফলাফল ঃ**

ভবিষ্যৎ জীবনের সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে একটি সম্মানজনক পেশাবৃত্তির মাধ্যমে তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে হবে। তার প্রতি বেশী করে নজর দিতে হবে। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় সে ইংরেজী ও গণিতে অত্যাধিক দূর্বল।

**সুপারিশ ঃ**

মারিয়া বাড়ীর পরিবেশ ভাল। তবে সে সব বিষয় বুঝতে পারে না। তার জন্য বিষয় শিক্ষকের সাথে আলাপ আলোচনা করে উপযোগী ব্যবস্থা নিতে হবে।

* সময়ানুবর্তিতার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।
* বিষয়জ্ঞান সম্পর্কে ব্যাপক ধারনা অর্জন করতে হবে।
* নিয়মিক স্কুলে আসতে হবে।
* ইংরেজী ও অংক বিষয়ের প্রতি আরও বেশী জোড় দিতে হবে।
* পারিবার্শ্বিকতায় যেন উচ্ছন্নে না যায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

**উপসংহার ঃ**

প্রতিটি শিক্ষার্থীর উপর জরিপ পরিচালা করে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে উন্নত দেশগুলির অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্ত কাম্য।

**কেস স্টাডি ঃ ২**

একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর শিখন পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন।

**ভূমিকা ঃ**

শিক্ষার্থীর শিখন পর্যালোচনার লক্ষ্যে একজন মেধাবী এবং একজন দূর্বল শিক্ষার্থীর আচরণ লক্ষ্য করে তাদের কর্ম তৎপরতার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধন করা যা এখানে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর প্রতি নিবন্ধন করে সে দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে নিম্নে তা দেয়া হলো ঃ-

| | |
|---|---|
| শিক্ষার্থীর নাম | ঃ উম্মে হানি বাধন |
| শিক্ষার্থীর রোল | ঃ ০১ |
| শিক্ষার্থীর শ্রেণী | ঃ ৭ম |
| বিদ্যালয়ের নাম | ঃ আলীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ |
| পিতার নাম | ঃ কাজিম উদ্দিন |
| পিতার পদবী | ঃ ব্যবসায়ী। |
| মাতার নাম | ঃ সালেহা বেগম |
| মাতার পদবী | ঃ গৃহিনী। |
| ঠিকানা | ঃ ৫/১১, বাহার আলী লেন, আলীগঞ্জ, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ |



www.pathagar.com

**পর্যবেক্ষনের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীতে তাদের অর্ন্তভুক্তি বা সংশ্লিষ্টতার মাত্রা এবং কর্মতৎপরতার বর্ণনা ঃ**

শ্রেণীতে বাধন প্রতিদিন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে। শ্রেণীর প্রতি যথেষ্ট মনযোগী থাকে। প্রায় প্রতিদিনই সে প্রথম বেঞ্চে বসে। সে ক্লাসের একজন মেধাবী ছাত্রী। পাঠের বিষয় নিয়ে তার যথেষ্ঠ আগ্রহ রয়েছে। সে বাড়ীর কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করে। বোর্ডের কাজ নিয়মিত খাতায় বা ডায়রীতে তুলে নেয়। সবার উদ্দেশ্য প্রশ্ন করলে সে হাত উচুঁ করে উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রতিদিনের পড়াও তৈরী করে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার পূর্বজ্ঞান বা পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা যথেষ্ঠ বলেই প্রতীয়মান হয়। শ্রেণীতে দলগত কাজে ও ঠিকমত অংশগ্রহণ করে থাকে। সহপাঠিদের সাথে তার চমৎকার সম্পর্ক বা বন্ধুসুলভ মনোভাব বিদ্যমান এবং যথেষ্ট আন্তরিক বলে পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষকের সাথেও সন্তোষজনক আচরণ করে থাকে।

**প্রাতিষ্ঠানিক কাজের বিশ্লেষণ ঃ**

বাধন বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রী। প্রতিদিনের পড়া বা বাড়ীর কাজ নিয়মিত করে থাকে। শিক্ষকের নির্দেশ যথাযথ পালন করে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে তার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণীর সতীর্থরা তাকে ক্যাপ্টেন বানিয়েছে। যেহেতু সে একজন শিক্ষার্থী তাই তার শিক্ষার ক্ষেত্রে সফলতা বা দূর্বলতা কাজ করে।

নিম্নে তা আলোচনা করা হলো ঃ-

**সবল দিক ঃ**

শ্রেণীতে তার বিষয় গুলোর মধ্যে আনন্দদায়ক বিষয় ইংরেজী ও গণিত। এখানে লক্ষ্যনীয় ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা এবং গণিত একটি জটিল ও চিন্তামূলক বিষয়। কাজেই সে অবশ্যই একজন মেধাবী ও বিকাশমান শিক্ষার্থী হিসেবে তার এই ধারা অব্যাহত থাকলে অবশ্যই সে উন্নতির শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হবে।

**দূর্বল দিক ঃ**

শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনাতে তার সবল বা আনন্দদায়ক বিষয়ের পাশাপাশি তার দূর্বল দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত বা আলোকপাত করা হয়। শিক্ষার্থীর নিকট জানতে চাওয়া হলো তার নিকট কঠিন বা বুঝতে অসুবিধা হয় এমন কোন বিষয় আছে কিনা? শিক্ষার্থীর উত্তর ঃ বাংলা ব্যাকরণ। শিক্ষার্থীর অভিমত থেকে জানা যায় বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা এটা ঠিক। কিন্তু এর উৎপত্তি বা বিকাশের ধারা ইতিহাস ভিত্তিক। সবদিক বিশ্লেষণ সাপেক্ষে শিক্ষার্থীর নিকট ইহা একটি জটিল বিষয় হিসেবে চিহ্নিত।



www.pathagar.com

**শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার ঃ**

সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উম্মে হানি বাধনের আজকের ব্যক্তিগত অভ্যাস রুচি পছন্দসহ তার শিক্ষাজীবনের প্রতিফলন তুলে ধরার প্রয়াস নিম্নরূপ প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো ঃ-

. প্রিয় বিষয় কি?

উত্তর ঃ ইংরেজী ও গণিত।

. গতকালের পড়া কি ছিল?

উত্তরঃ বাংলা কারক, ইংরেজী Tense, গণিতের ল.সা.গু, সাঃ বিঃ, ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি।

. বাড়ীর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে কি?

উত্তরঃ আমি যথাযথভাবে শ্রেণীর বাড়ীর কাজ তুলে নেই এবং সম্পন্ন করি।

. পড়াশুনার জন্য কে বেশী সাহায্য করে?

উত্তর ঃ মা এবং গৃহ শিক্ষক।

বাধন এর একভাই ও তিন বোন আছে। তার বাবা ব্যবসা করেন। মা গৃহিনী, বাসার পরিবেশ ভালো।

**ফলাফল ঃ**

ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে একটি সম্মানজনক পেশা বেছে নিতে আলোচ্য হয়তো বা কষ্টসাধ্য কিন্তু লক্ষ্য অর্জনের মানসিকতা তার মধ্যে বিরাজমান। যে কোন বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন লক্ষ্য স্থির না করে সাদাসিদে জীবন বেছে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

**উপসংহার ঃ**

উম্মে হানি বাধনের প্রতি যেমন জরিপ করা হল সেরূপ প্রতিটি শিক্ষার্থীর উপর জরিপ পরিচালনা করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে উন্নত দেশগুলির অনুরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্তভাবে কাম্য।



www.pathagar.com

# একজন বিএড প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শিক্ষণ পর্যালোচনা

**ভূমিকা ঃ**

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড আর শিক্ষক হলো একটি জাতির নির্মাতা তথা মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষা মানবজীবনে পূর্ণতা বিধানের মূল চাবিকাঠি। শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষাই হলো প্রধান উপাদান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার কারনেই জাতিকে উন্নয়ন করা। শিক্ষা দান, গুণগতমান, দক্ষতা পদ্ধতি ও কলাকৌশল ও পদ্ধতিগত জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

**বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য ঃ**

আলীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলের প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছেন সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক বাবু নিখিল কুমার সরকার। তার নের্তৃত্ব ও সুব্যবস্থাপনা, কর্মউদ্দ্যেগ ও শিক্ষক মন্ডলীর নিবেদিত কর্মদক্ষতার বিশেষ অবদান রয়েছে। এখানকার সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলীর সযত্ন পরিচর্যায় এখানে শিক্ষাক্রম ও কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে।

**শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ**

শিক্ষার্থী ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান কল্পনা করা যায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুখ্য ব্যক্তি হলো শিক্ষার্থী। এই স্কুলে বর্তমানে ১০০০ জন ছাত্র/ছাত্রী আছে। শিক্ষার্থীরা অতি আগ্রহের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে।

**শিক্ষকের সংখ্যা ঃ**

শিক্ষক হলো মানুষ গড়ার কারিগর। এই স্কুল শিক্ষক দক্ষতার সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কল্পে। এখানে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ১৬ জন।

**পাঠদান করা বিষয় ঃ**

২য় পর্যায়ের অনুশীলনী পাঠদানের সময় আমি ২টি বিষয়ের উপর পাঠদান করেছি। বিষয়গুলো হলো গণিত ও বিজ্ঞান।

**অনুশীলনী পাঠদান ঃ**

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা অনুমোদন পর্যবেক্ষণ ও পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও দূর্বলতা গুলো সংশোধন করেন।



www.pathagar.com

**অনুশীলনী পাঠদানের শুভযাত্রা ঃ**

খানবাহাদুর আহছানউল্লা টি. টি. কলেজের শিক্ষক মন্ডলীর নির্দেশনায় ১ ফেব্রুয়ারী ২০১১ থেকে ৩ জন প্রশিক্ষনার্থী আলীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতে যাই। প্রধান শিক্ষক আমাদের অন্যান্য শিক্ষকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সিলেবাস ও ক্লাস রুটিন সংগ্রহ করে দেন।

**সতীর্থদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ ঃ**

সহকর্মীদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে নিজের পাঠদান উন্নত করি। উৎসাহ ও কর্মোদ্দম বাড়াতে ফলাবর্তন হিসেবে একটি করে চেকলিস্ট করি।

**শিক্ষন শিখন পরিবেশ ঃ**

সুযোগ্য শিক্ষক মন্ডলীর পরিচর্যার শিক্ষাক্রম সুচারুভাবে পরিচালিত। শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই সুষ্ঠু ও শিক্ষাপোযোগী অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে সচেষ্ঠ।

**ভৌত পরিবেশ ঃ**

শ্রেণীকক্ষের আকার বড়। পুরো দেয়াল জুড়ে জানালা থাকায় পর্যন্ত আলো বাতাসের অভাব নেই। ব্লাক বোর্ডের অবস্থান বেশ বড়। বিভিন্ন শিখন সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

**শিক্ষার্থীর আগ্রহ ঃ**

বিভিন্ন সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে ও জ্ঞানার্জনে প্রতি শিক্ষার্থীরা অনুরাগী উৎসাহী, কৌতুহলী, সৃজনশীল প্রতিভা ও গুণাবলী বিকাশে তাদের প্রেষণা ও আগ্রহ প্রবল।

**বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের প্রতি প্রদর্শিত আচরণ ঃ**

বিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত দূর্বল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভাল শিক্ষার্থীরা দূরে থাকে। জাতি ধর্ম গোত্র সবার মধ্যে রয়েছে সহযোগী।

**শিক্ষা উপকরনের ব্যবহার ঃ**

শিখন শেখানো কার্যক্রমে নানা প্রকার শিক্ষা উপরণ ব্যবহার করি। যার মধ্যে ছিল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আকষর্ণীয় মডেল, ছবি, মানচিত্র ইত্যাদি।



www.pathagar.com

**উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার অভিজ্ঞতা ঃ**

খান বাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে অধ্যাপক মন্ডলীগণ আমাদের বিদ্যালয়ে দায়িত্বে ছিলেন। তারা মাঝে মাঝে আমাদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং আমার ডাইরীতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইতিবাচক দিক গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পাঠদান। পাঠদান চমৎকার ছিল। শিক্ষিকা খুব আন্তরিক। পাঠদান বিষয়ে দক্ষ, হাতের লেখা ভাল, উপকরণ ব্যবহার করেছে। নেতিবাচক দিক গুলোর মধ্যে ছিল বোর্ডের ব্যবহার। বোর্ডের ব্যবহার আরও সুন্দর করতে হবে।

উপরের উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, স্কুলে আমার পাঠদান অনুশীলনের অভিজ্ঞতা খুবই ব্যতিক্রমধর্মী ছিল। এই অভিজ্ঞতাটি আমাকে বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হতে সাহায্য করেছে।

**মূল্যায়ন ঃ**

অনুশীলনী পাঠদান করে এবং শিক্ষকমন্ডলীর সু-নির্দেশনায় পাঠদান অনুশীলনীতে অনেকটা উন্নতি লাভ করেছি। আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীলতা ও দৃঢ় চরিত্র ও প্রবল শক্তি অর্জন করেছি। উভয় পর্যায় (১ম ও দ্বিতীয়) পাঠদান অনুশীলনের মাধ্যমে আমার দূর্বলতাগুলো সংশোধনের ফলে ভয়, জড়তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।



www.pathagar.com

# গবেষণামূলক সমীক্ষা-১



www.pathagar.com

# ভূমিকা ঃ

শিক্ষা জাতীয় মেরুদন্ড। প্রত্যেকটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর, শিক্ষার মান শুধু প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক প্রভাবে পর্যায়ক্রমে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপের উন্নয়নকে বুঝায় না। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ অর্থাৎ তাদের সৃজনশীল, সৃষ্টিশীল, বাস্তবমূখী, ধৈর্য্যশীল, সহানুভূতি সহমর্মীতা ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো।

সম্প্রতিক কালে বি. এড. প্রশিক্ষনার্থী হিসেবে দেবিদ্বার রেয়াজউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে লক্ষ্য করলাম, শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল বই পড়ার প্রতি অনীহা এবং গাইড বই পড়ার অধিক প্রবণতা, ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আদর্শ নাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। গাইডের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সকল সমস্যার সমাধান সহজে পাওয়ার ফলে জ্ঞান অর্জনের প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা জন্মাচ্ছে এবং কালক্রমে তার নেতিবাচক প্রভাব তার ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি ও সভ্যতার যুগে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাবা-মা সন্তানদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছেন না। জীবনের তাগিদে বাবা-মা উভয়ই বাইরের কাজে এতো ব্যস্ত থাকেন যে, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সন্তানদের সহযোগীতা করতে পারছেন না। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহ শিক্ষক ও গাইড বইকেই সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করছে। কিন্তু তার সন্তান কতটুকু জ্ঞান অর্জন করল, নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে কিনা, নিয়মিত বাড়ীর কাজ করছে কিনা, তার সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে নজর না দেয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের জীবনে নেমে আসে দারুন হতাশা আর নিরাপত্তাহীনতা যা তাদের জীবনেও প্রভাব ফেলে।

পরিশেষে আশা করি আমার এই গবেষণাটি কেবল বি. এড. প্রশিক্ষণার্থী নয় যারা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরও বিশেষ কাজে লাগবে।



www.pathagar.com

# সূচীপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | ভূমিকা | ১ |
| ২ | গবেষণা সমস্যা | ১ |
| ৩ | গবেষণা পর্যালোচনা | ১ |
| ৪ | গবেষণা উদ্দেশ্য | ২ |
| ৫ | গবেষণা একক | ৩ |
| ৬ | নমুনা | ৩ |
| ৭ | তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ | ৩ |
| ৮ | তথ্য সংগ্রহের কৌশল | ৪ |
| ৯ | তথ্য উপস্থাপন | ৮-১০ |
| ১০ | তথ্য বিশ্লেষণ | ১১ |
| ১১ | ফলাফল | ১২ |
| ১২ | সুপারিশ | ১২ |
| ১৩ | গবেষণা সীমাবদ্ধতা | ১২ |
| ১৪ | উপসংহার | ১৩ |
| ১৫ | প্রশ্নমালা | ১৪-১৭ |
| ১৬ | সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি | ১৭ |




www.pathagar.com

**ভূমিকা ঃ**

মানুষের মধ্যে মানুষ্যত্বের প্রকাশ করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি করতে পারে না। শিক্ষার ফলে মানুষ আত্ম-আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারে। আর এর জন্য প্রয়োজন সৃজনশীল প্রতিবার বিকাশ। সকল মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা থাকে। শিক্ষার কাজ সেই প্রতিভাগুলোকে চিহ্নিত করে এর বিকাশ ঘটানো। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীরা সহজ পদ্ধতি অর্থাৎ গাইড বইয়ের মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধানে সক্রিয় হচ্ছে যা শিক্ষার সত্যিকারের লক্ষ্য অর্জনে হুমকী স্বরূপ। আর শিক্ষার্থীদের এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সকল শিক্ষক ও অভিভাবক মন্ডলীর। শিক্ষার্থীদের দেশ ও জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত করাই আমার এই গবেষণার লক্ষ্য।

**গবেষণা সমস্যা ঃ**

গবেষণার সমস্যা নির্বাচন একজন গবেষকের জন্য গবেষনা কার্যক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের একটি। যেহেতু আমি একজন বি. এড. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক, সেহেতু আমার গবেষণা সমস্যাটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংক্রান্ত। তাই আমার গবেষণার বিষয়- "মূল বই না পড়ে গাইড বই পড়ার প্রতি শিক্ষার্থীদের অধিক প্রবণতা ও তার প্রতিকার।"

আমি দেবিদ্বার রেয়াজউদ্দিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ নিতে এসে দেখলাম শিক্ষার্থীরা মূল বই বাদ রেখে গাইড বইয়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছে। যা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার পথে একটি প্রধান অন্তরায়। উক্ত সমস্যা এবং এর উপর প্রকৃত অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমাধানের উপায় বের করলে তা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে আমার গবেষণা সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। সার্বিক দিক বিবেচনা করে এই বিষয়টি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

**গবেষণা পর্যালোচনা ঃ**

৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মূল বই না পড়ে গাইড বই পড়ার প্রতি অধিক প্রবণতা ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত গবেষণা সহায়ক বই পত্র সমাজ নিরীক্ষণ, শিক্ষা, জার্নাল এর কোন সাহায্য পাইনি। তবে পূর্ববর্তী গবেষণার প্রত্যক্ষ ও উল্লেখযোগ্য সাহায্য পেয়েছি।

**গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ**

গবেষণা হলো সত্যানুসন্ধানের একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। আর এই অনুসন্ধান কার্যটি পরিচালনার পশ্চাতে কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। কারণ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো যায় না।



www.pathagar.com

অনুরূপভাবে আমার এই ক্ষুদ্র গবেষণার পেছনেও কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্দেশ্য নির্ভর করে মূলত গবেষণার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর উপর। প্রতিটি গবেষণা কর্মের মতই এই গবেষণারও দুই ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে যথা-

ক. সাধারণ উদ্দেশ্য

খ. সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

**সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ**

১. দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের গাইড পড়ার প্রতি অধিক প্রবণতা একটি অন্তরায় ও তার প্রতিকার। এই বিষয়টি অনুসন্ধান করা।

**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ**

১. মূল বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে তাদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করা।

২. শিক্ষার্থীদের যথাযথ জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো।

৩. দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

৪. গাইড পড়ার প্রবণতা রোধ করা।

**গবেষণা পদ্ধতি ঃ**

১. এলাকা নির্বাচন ঃ এই গবেষণার জন্য দেবিদ্বার রেয়াজউদ্দিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়কে নির্বাচন করা যথার্থ মনে করেছি। কারণ এর পিছনে কতগুলো যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে। যেমন

১) গবেষণরর জন্য আমি এখানে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সাহায্য পেতে পারি যেহেতু আমি এই বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নিয়োজিত আছি।

২) এটা যেহেতু আমার নিজের এলাকা সেজন্য উত্তর দাতারা অনেকেই আমার পরিচিত। (শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক) তাই উত্তরদাতারা আন্তরিকতার সাথে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহী হন।

তাই আমি আমার গবেষণার সার্বিক দিক লক্ষ্য রেখে গবেষণার ক্ষেত্রে হিসেবে উক্ত বিদ্যালয়কে নির্বাচন করি।

২. গবেষণা একক ঃ গবেষণার একক হিসেবে আমি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। কারণ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সাথে আমার বেশি পরিচয় ও সক্ষ্যতা গড়ে উঠেছিল।

৩. নমুনা ঃ যেহেতু শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থী অনেক বেশি এবং অভিভাবক ও শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তাই আমি নিম্নোক্ত দুটি পদ্ধতিতে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করেছি ঃ-

১. প্রশ্নমালার সাহায্যে সাক্ষাতকার গ্রহণ করে।

২. আনুষ্ঠানিক ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে।



www.pathagar.com

**তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ**

সংগৃহীত তথ্যের সুষ্ঠু বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই গবেষণার বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তথ্যের সুষ্ঠু বিচার, সংখ্যা তাত্ত্বিক বর্ণনা দান, কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয়, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে যথা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলগুলো এড়ানো যায়। উক্ত গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ উপস্থাপন ২০ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করব, তাই আমি সমগ্রক থেকে নমুনায়ন এর আশ্রয় নিয়েছি। শ্রেণী সমগ্রক থেকে সরল দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে ২০ জন শিক্ষার্থীকে নমুনা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করি। শিক্ষকদের সমগ্রক থেকে আমি আকস্মিক নমুনা হিসেবে ৫ জনের নমুনা নেই এবং অভিভাবক সমগ্রক থেকে আমি স্বেচ্ছাচারিত নমুনা হিসেবে ৫ জনকে নেই। আমার গবেষণার প্রয়োজনে এই মোট ৩০ জনকে নমুনা হিসাবে নির্বাচন করেছি।

**৪. তথ্য সংগ্রহের কৌশল ঃ**

গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে তথ্য সংগ্রহ। সুতরাং গবেষণায় কোন পদ্ধতিও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে তা আলোচনার দাবী রাখে। সব গবেষণার জন্য যেমন একটি পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা যায় না। তেমনি একটি কৌশল ও পদ্ধতিকে আশ্রয় করে সকল গবেষণা পরিকল্পনা সম্ভব নয়। এজন্য পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে।

এ কারণে গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যাবলী পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে এবং সুশৃঙ্খল সারণীবদ্ধকরণের পর সারণী আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

**তথ্য উপস্থাপন ঃ**

**শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর**

**সারণী-১**

**নির্দিষ্ট ২০ জন শিক্ষার্থী থেকে প্রাপ্ত তথ্য ঃ**

| প্রশ্নমালা | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১. তুমি কি প্রতি দিন বিদ্যালয়ে আস? | ১৯ | ১ | ৯৫% | ৫% |
| ২. তুমি কি প্রতি দিন বাড়ির কাজ কর? | ১৮ | ২ | ৯০% | ১০% |
| ৩. তুমি কি গাইড বই পড়? | ২০ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৪. গাইড পড়তে তোমার কাছে কি ভাল লাগে? | ১০ | ১০ | ৫০% | ৫০% |



www.pathagar.com

সারণী নম্বর-১ এ দেখা যাচ্ছে, ৯৫% শিক্ষার্থী প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসে এবং নিয়মিত বাড়ির কাজ করে ৯০% শিক্ষার্থী। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১০০% শিক্ষার্থী গাইড বই পড়ে এবং গাইড বই পড়তে ভাল লাগে ৫০% শিক্ষার্থীর।

**সারণী-২**

| প্রশ্নমালা | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ৫. গাইডের মধ্যে তুমি তোমার সকল সমস্যার সমাধান পাও? | ২০ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৬. মূল বইয়ে কি তুমি সকল সম্যার সমাধান পাও না? | ১২ | ৮ | ৬০% | ৪০% |
| ৭. গাইডের প্রশ্নের উত্তরগুলো কি সহজ করে দেয়া থাকে? | ১৭ | ৩ | ৮৫% | ১৫% |
| ৮. গাইড পড়ে কি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যায়? | ৪ | ১৬ | ২০% | ৮০% |

সারণী নম্বর-২ এ দেখা যাচ্ছে যে, ১০০% শিক্ষার্থীর মতে গাইডের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়, ৬০% শিক্ষার্থীর মতে মূল বইয়ের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। ৮৫% শিক্ষার্থীর মতে গাইডে প্রশ্নের উত্তরগুলো সহজ করে দেয়া থাকে। কিন্তু ৮০% শিক্ষার্থীর মতে গাইড পড়ে ভাল নম্বর পাওয়া যায় না।

**সারণী-৩**

| প্রশ্নমালা | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ৯. তোমার শিক্ষক কি গাইড বই থেকে পড়ার নির্দেশ দেন? | ৩ | ১৭ | ১৫% | ৮৫% |
| ১০. তোমার শিক্ষক কি মূল বই পড়ার নির্দেশ দেন না? | ১৪ | ৬ | ৭০% | ৩০% |
| ১১. শিক্ষক কি তোমার সকল সমস্যার সমাধান করে? | ২০ | ০ | ১০০% | ০০% |

সারণী নম্বর-৩ এ দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের মতে ৮৫% শিক্ষক গাইড বই পড়তে নিষেধ করেন এবং ৭০% শিক্ষক মূল বই পড়তে নির্দেশ দেন এবং ১০০% শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সকল সমস্যার সমাধান করেন।



www.pathagar.com

সারণী-৪

| প্রশ্নমালা | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১২. তুমি কি বাড়িতে নিয়মিত পড়াশুনা কর? | ১৪ | ৬ | ৭০% | ৬০% |
| ১৩. তোমার পিতা মাতা পড়াশুনায় তোমাকে সাহায্য করেন? | ১৮ | ২ | ৯০% | ১০% |

সারণী-৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৭০% শিক্ষার্থী নিয়মিত বাড়ীতে পড়াশুনা করে এবং ৯০% পিতা মাতা শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার সাহায্য করেন।

## শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর

সারণী-১

**নির্দিষ্ট ৫ জন শিক্ষক থেকে প্রাপ্ত তথ্য ঃ**

| প্রশ্নমালা | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১. আপনার কি শিক্ষকতার উপর কোন প্রশিক্ষণ আছে? | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ২. আপনি কি এম. এড. করেছেন। | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |

সারণী নম্বর-১ এ দেখা যাচ্ছে, আমার জিজ্ঞাসিত ৫ জন শিক্ষকের প্রত্যেকে অর্থাৎ ১০০% বি. এড. করেছেন কিন্তু এম. এড. করেছেন ৪০%।

সারণী-২

| প্রশ্নমালা | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ৩. আপনি কি শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন বাড়ীর কাজ দেন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৪. আপনি কি প্রতিদিন বাড়ীর কাজ আদায় করেন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৫. আপনি কি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেন? | ১ | ৪ | ২০% | ৮০% |
| ৬. আপনি কি পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করে ক্লাসে নেন? | ০ | ৫ | ০০% | ১০০% |

সারণী নম্বর-২ এ দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন বাড়ীর কাজ দেন ও আদায় করেন ১০০%। কিন্তু শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেন ২০% এবং পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করেন ০০% শিক্ষক।



www.pathagar.com

সারণী-৩

| প্রশ্নমালা | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ৭. আপনি কি মনে করেন শিক্ষার্থীরা মূল বই না পড়ে গাইড বই পড়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে? | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৮. আপনি কি মূল বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করেন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৯. আপনি কি শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ে সকল সমস্যার সমাধান করেন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |

সারণী নম্বর-৩ এ দেখা যাচ্ছে, ১০০% শিক্ষকের মতে এটা ঠিক যে শিক্ষার্থীরা গাইড বই পড়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। এবং ১০০% শিক্ষকের মতে তারা শিক্ষার্থীর সকল সমস্যার সমাধান করেন এবং মূল বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করেন।

## অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর

সরণী-১

| প্রশ্নমালা | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১. আপনার সন্তান কি নিয়মিত স্কুলে আসে? | ৪ | ১ | ৮০% | ২০% |
| ২. সময়মত বাড়ীতে পড়তে বসে? | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |
| ৩. বাড়ীতে পড়া দেশিয়ে দেন কি? | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |

সারণী নম্বর-১ এ দেখা যাচ্ছে, অভিভাবকদের মতে ৮০% শিক্ষার্থী নিয়মিত স্কুলে আসে, ৬০% শিক্ষার্থী সময়মত বাড়ীতে পড়তে বসে। ৬০% অভিভাবক বাড়ীতে সন্তানদের পড়া দেখিয়ে দেন।

সারণী-২

| প্রশ্নমালা | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ৪. আপনার সন্তান কি গাইড বই পড়ে? | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৫. বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রাখেন? | ২ | ২ | ৬০% | ৪০% |
| ৬. আপনি কি সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেন? | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |

সারণী নম্বর-২ এ দেখা যাচ্ছে, ১০০% শিক্ষার্থী গাইড বই পড়ে, ৬০% অভিভাবক বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখেন। এবং ৬০% অভিভাবক সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দেন।



www.pathagar.com

## সরণী-ক
### শিক্ষার্থী কর্তৃক পাওয়া তথ্য

| প্রশ্নের নম্বর | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | ১৯ | ১ | ৯৫% | ৫% |
| ২ | ১৮ | ২ | ৯০% | ১০% |
| ৩ | ২০ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৪ | ১০ | ১০ | ৫০% | ৫০% |
| ৫ | ২০ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৬ | ১২ | ৮ | ৬০% | ৪০% |
| ৭ | ১৭ | ৩ | ৮৫% | ১৫% |
| ৮ | ৪ | ১৬ | ২০% | ৮০% |
| ৯ | ৩ | ১৭ | ১৫% | ৮৫% |
| ১০ | ১৪ | ৬ | ৭০% | ৩০% |
| ১১ | ২০ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ১২ | ১৪ | ৬ | ৭০% | ৩০% |
| ১৩ | ১৮ | ২ | ৯০% | ১০% |

## সারণী-খ
### শিক্ষক কর্তৃক পাওয়া তথ্য

| প্রশ্নের নম্বর | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ২ | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |
| ৩ | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৪ | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৫ | ১ | ৪ | ২০% | ৮০% |
| ৬ | ০ | ৫ | ০০% | ১০০% |
| ৭ | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৮ | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৯ | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |



www.pathagar.com

সারণী-গ

অভিভাবক কর্তৃক পাওয়া তথ্য

| প্রশ্নের নম্বর | গণসংখ্যা | | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | ৪ | ১ | ৮০% | ২০% |
| ২ | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |
| ৩ | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |
| ৪ | ৫ | ০ | ১০০% | ০০% |
| ৫ | ৩ | ২ | ৬০% | ৪০% |
| ৬ | ২ | ০ | ৪০% | ৬০% |

**তথ্য বিশ্লেষণ**

উক্ত গবেষণার জন্য সংগ্রহকৃত তথ্য বিশ্লষণ করে সব তথ্য পাওয়া যায় তার নিম্নরূপ ঃ–

১. বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর মতে, মূল বই পড়ে তারা তাদের সকল সমস্যার সমাধান পায় না। তাই তারা গাইড পড়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে।

২. ৮০% শিক্ষার্থীর মতে, গাইড পড়ে ভাল নম্বর পাওয়া যায় না তবুও তারা গাইড পড়ে কারণ শিক্ষকরা তাদের সকল সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করছে না এবং অভিভাবকরা ও তাদের সন্তানের প্রতি সচেতন নয়।

৩. নিয়মিত স্কুলে না আসা, এবং নিয়মিত পড়ালেখা না করার কারণে, শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার পূর্বে দ্রুত সিলেবাস শেষ করার জন্য সহজ পথ হিসেবে গাইড বইকেই বেছে নেয়।

৪. দেখা যাচ্ছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরাও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোন উপকরণের ব্যবহার করেন না, ফলে শিক্ষার্থীর কাছে পড়াশুনাটা আনন্দদায়ক হয় না বিধায় তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটেনা।

**ফলাফল**

১. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ বাঁধা প্রাপ্ত হয়।

২. শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল না হয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৩. জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ ঘটেনা।

৪. ভাল ফলাফল অর্জন করা স্বত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে দেশ ও জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে না।



www.pathagar.com

## সুপারিশ

শিক্ষাদানকে ফলপ্রসু করার জন্য যেসব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখলে ভাল হয় তা নিম্নরূপ-

১. শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্কুলে আসা ও বাড়ীর কাজ আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

২. শিক্ষককে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ করানোর মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

৪. গাইড পড়ার অপকারিতা সম্পর্কে তাদের জানাতে হবে।

৫. পিতা মাতাকে সন্তানের জ্ঞান বিকাশের প্রতি অধিক যত্নশীল হতে হবে।

৬. শিক্ষককে শিক্ষার্থীর পাঠ সংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

## সীমাবদ্ধতা

কোন মানুষ যেমন দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে নয় কোন গবেষণাও ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। আমার এই গবেষণায় ও কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে। আমার দৃষ্টির অগোচরে যদি কোন ভুল থেকে যায় সেজন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

উক্ত গবেষণা কার্যক্রমটি শেষ করতে গিয়ে প্রশ্নমালা তৈরী, তথ্য সংগ্রহ, কম্পিউটার কম্পোজ ইত্যাদি কাজে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। তথাপি অনেক সীমাবদ্ধতা স্বত্তেও নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণা কাজটি শেষ করতে পারায় আমি আনন্দিত।

## উপসংহার ঃ

এই গবেষণা থেকে যা উঠে এসেছে তা হল আমাদের মূল বইকে আরো সহজ, আনন্দদায়ক এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে তৈরী করতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবককে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের প্রতি অধিক যত্নশীল হতে হবে। পরিকল্পনা তৈরী অর্থাৎ শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল, আত্মনির্ভরশীল, পরিশ্রমী, আত্মপ্রত্যয়ী; সাহসী ইত্যাদি গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে যাতে শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতীয় বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হতে পারে।



www.pathagar.com

## শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্ন

১। তুমি কি প্রতি দিন বিদ্যালয়ে আস ? হ্যাঁ ☐ না ☐
২। তুমি কি প্রতিদিন বাড়ীর কাজ কর? হ্যাঁ ☐ না ☐
৩। তুমি কি গাইড বই পড়? হ্যাঁ ☐ না ☐
৪। গাইড পড়তে কি তোমার কাছে ভাল লাগে? হ্যাঁ ☐ না ☐
৫। গাইডের মধ্যে তুমি তোমার সকল সমস্যার সমাধান পাও? হ্যাঁ ☐ না ☐
৬। মূল বইয়ে কি তুমি সকল সমস্যার সমাধান পাও না? হ্যাঁ ☐ না ☐
৭। গাইডে প্রশ্নের উত্তরগুলো কি সহজ করে দেয়া থাকে? হ্যাঁ ☐ না ☐
৮। গাইড পড়ে কি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যায়? হ্যাঁ ☐ না ☐
৯। তোমার শিক্ষক কি গাইড বই থেকে পড়ার নির্দেশ দেয়? হ্যাঁ ☐ না ☐
১০। তোমার শিক্ষক কি মূল বই পড়ার নির্দেশ দেয় না? হ্যাঁ ☐ না ☐
১১। শিক্ষক কি তোমার সকল সমস্যার সমাধান দেয় না? হ্যাঁ ☐ না ☐
১২। তুমি কি বাড়ীতে নিয়মিত পড়ালেখা কর? হ্যাঁ ☐ না ☐
১৩। তোমার পিতামাতা তোমাকে পড়াশুনায় সাহায্য করে? হ্যাঁ ☐ না ☐
১৪। তোমার জীবনের লক্ষ্য কি? হ্যাঁ ☐ না ☐

## শিক্ষকের জন্য প্রশ্ন

১। আপনার কি শিক্ষকতার উপর কোন প্রশিক্ষণ আছে? হ্যাঁ ☐ না ☐
২। আপনি কি এম. এড. করেছেন? হ্যাঁ ☐ না ☐
৩। আপনি কি প্রতিদিন বাড়ীর কাজ দেন? হ্যাঁ ☐ না ☐
৪। আপনি কি প্রতিদিন বাড়ীর কাজ আদায় করেন? হ্যাঁ ☐ না ☐
৫। আপনি কি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেন? হ্যাঁ ☐ না ☐
৬। আপনি কি পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করে ক্লাস নেন? হ্যাঁ ☐ না ☐
৭। আপনি কি মনে করেন শিক্ষার্থীরা মূল বই না পড়ে গাইড বই পড়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে? হ্যাঁ ☐ না ☐
৮। আপনি কি মূল বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করেন? হ্যাঁ ☐ না ☐
৯। আপনি কি শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের সকল সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করেন? হ্যাঁ ☐ না ☐

## অভিভাবকের জন্য প্রশ্ন

১। আপনার সন্তান কি নিয়মিত স্কুলে আসে? হ্যাঁ ☐ না ☐
২। সময়মত বাড়ীতে পড়তে বসে? হ্যাঁ ☐ না ☐
৩। বাড়ীতে পড়া দেখিয়ে দেন কি? হ্যাঁ ☐ না ☐
৪। আপনার সন্তান কি গাইড বই পড়ে? হ্যাঁ ☐ না ☐
৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রাখেন? হ্যাঁ ☐ না ☐
৬। আপনি কি সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেন? হ্যাঁ ☐ না ☐



www.pathagar.com

# সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি


১। সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ
– মুরশিদ আল হাসান

২। সমাজ গবেষণা পদ্ধতি
– খুরশিদ আলম

৩। শিক্ষামূলক গবেষণা
– জাকির হোসেন

৪। Action Research Module- 1.2.3

৫। Action Research in Education.
– মির্জা মুহাম্মদ দিদারুল এনাম




www.pathagar.com

# গবেষণামূলক সমীক্ষা-২

## সূচীপত্র


| ক্রঃ নং | বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১. | ভূমিকা | ৫ |
| ২. | গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ | ৬ |
| ৩. | গবেষণার উদ্দেশ্য | ৭ |
| ৪. | গবেষণার আওতা | ৭ |
| ৫. | সীমাবদ্ধতা | ৭ |
| ৬. | সমস্যার বিবরণ | ৭ |
| ৭. | গবেষণার পদ্ধতি | ৯ |
| ৮. | তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি | ৯ |
| ৯. | নমূনায়ন পদ্ধতি | ১০ |
| ১০. | উদ্দেশ্যমূখী নমূনায়ন | ১০ |
| ১১. | তথ্য বিশ্লেষণ | ১২ |
| ১২. | প্রাপ্ত ফলাফল | ১২-১৬ |
| ১৩. | গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি | ১৭ |
| ১৪. | সুপারিশ | ১৭ |
| ১৫. | উপসংহার | ১৯ |
| ১৬. | Biolograhpy | ২০ |
| ১৭. | প্রশ্নপত্র সংযুক্ত | ২১-২৩ |




www.pathagar.com

## ভূমিকা

শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীদেরকে 'শিক্ষাদান করা'- কথাটি আমরা প্রায়ই বলে থাকি বা শুনে থাকি। কিন্তু উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষা সম্পর্কেও শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং সর্বোপরি শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও কাজ করছে এমন সকলের মধ্যেই চিন্তার প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। তাই 'শিক্ষাদান' কথাটির সঙ্গে দাতা ও গ্রহীতা এই দুটি পক্ষ চলে আসে। এক পক্ষ অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষাদান করেন এবং অন্য পক্ষ অর্থাৎ শিক্ষার্থী সেই দান গ্রহন করে। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই এক সময় আমাদেরে দেশে সমস্ত শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াটি গড়ে উঠে। যেখানে বিশ্বাস করা হতো শিক্ষার্থীরা হচ্ছে শুণ্য মস্তিস্ক, শিক্ষকের কাজ হচ্ছে জ্ঞান দান করে তাদের শুণ্য মস্তিস্ক ভরে দেয়া। এখানে শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান, আর দানটুকু গ্রহন করাই হচ্ছে শিক্ষার্থীর কাজ। আর তাই শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা বা কাজের উপরই জোর দেয়া হয় এবং ব্যর্থতার দায়ভার চাপানো হয় শিক্ষার্থীদের উপর অর্থাৎ দান গ্রহণ ও ধরে রাখার অক্ষমতার উপর।

সামাজিক বিজ্ঞান একটি যা শুধু বই পড়রেই জ্ঞান অর্জন লাভ পরিপূর্ণ হয় না। সমাজ, সংস্কৃতি হলো দেশ ভূখন্ড অনুযায়ী ভিন্নতর হয়ে থাকে। তাই বিষয়টি অবগত হতে হবে। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে শিশু উপযোগী আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। তাদেরকে সামাজিক কাজ করার সুযোগ করে দেয়া তাদের সামনে নতুন সমস্যা তুলে ধরা এবং সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা। তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিশু তার শিখনের ভান্ডারকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে থাকে। এই চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভিতরের সম্ভাবনা সমূহ বিকশিত হয়। তারা সৃজনশীল হয়ে উঠে, নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাঙ্খিত যোগ্যতা ও দক্ষতাসমূহ অর্জন করে এক্ষেত্রে শ্রেণী কক্ষের পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশটি শিশুর জন্য আনন্দদায়ক হলে শিক্ষন-শিখন প্রক্রিয়াটি আকর্ষনীয় হলে শিশুরা এই প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করে। যেখানে এই শিশু উপযোগী পরিবেশের অভাব সেখানে শিশুরা হয় যন্ত্রিক ও মুখস্ত নির্ভর, ব্যহত হয় শিশুর বিকাশ ও সৃজনশীলতা তথা মানসম্মত শিক্ষা।

মানসম্মত শিক্ষা আজ সকলের প্রত্যাশা। বিশেষ করে সরকারী বেসরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোগে দেশে প্রচুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠায় এবং শিশুদের স্কুলগামী করার জন্য নানাবিধ কর্মসূচীর ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার একটি সন্তোষজনক পর্যায় উন্নীত হওয়ার পর অনেক বিলম্বে হলেও 'মানসম্মত শিক্ষা' আজ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডায় পরিনত হয়েছে। এ নিয়ে কথা বলতে হতাশা ব্যক্ত করতে এবং বিভিন্ন সুপারিশ রাখতে দেখা যায় বিভিন্ন সভায়, সেমিনারে ও পত্র পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে। এই আলোচনা, সমালোচনা ওসুপারিশকারীদের মধ্যে আছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ, সরকারী কর্মকর্তা, জন প্রতিনিধি ও নীতি নির্ধারনী পর্যায়ের ব্যক্তিগণ। সকলের বক্তব্যে শিক্ষার মানের বর্তমান অবস্থার জন্য সাধারণ যে বিষয়গুলোকে দায়ী হিসাবে চিহ্নিত হয় সেগুলো গুরুত্বসহকারে সমাধান করতে হবে।



www.pathagar.com

# অধ্যায় ২

১. গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ
-সাধারণ উদ্দেশ্য
-সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য
২. গবেষণার আওতা
৩. গবেষণার সীমাবদ্ধতা।



www.pathagar.com

**গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ ঃ**

এই গবেষণারও ২ ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে। যা সাধারণ উদ্দেশ্য ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হিসাবে নিচে তুলে ধরা হলো।

**সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ**

* শ্রেণী কক্ষের শিখন উপযোগী পরিবেশ কী মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সহায়ক, এ বিষয়টি অনুসন্ধান করা।

**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ**

* শ্রেণী কক্ষের বর্তমান পরিবেশ শিক্ষা উপযোগী কী তা খুঁজে বের করা;
* শ্রেণী কক্ষের যথোপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কী কী প্রয়োজন তা অনুসন্ধান করা;
* শ্রেণী কক্ষের যথোপযুক্ত পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো খুঁজে বের করা;
* সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো চিহ্নিত করা;

**গবেষণার আওতা ঃ**

* সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই গবেষণা থেকে সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং তা সমাধানের জন্য উপায় বের করতে পারে;
* সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই গবেষণা থেকে শিক্ষণ উপযোগী সামাজিক বিজ্ঞান শ্রেণী কক্ষের পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা পেতে পারে;
* এই গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্য সমাধানের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে।

**গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ**

* গবেষণার জন্য সময় খুবই কম বলে উপলব্ধি করেছি;
* নমূনার আকার কম ও বিশ্লেষনে সীমাবদ্ধতা;
* প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর;
* উপাত্তের অপ্রতুলতা;
* উত্তর দাতার সময় কম।

**সমস্যার বিবরণ ঃ**

এই গবেষণার মাধ্যমে নিম্নেকত প্রশ্নপত্রগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে-

* ৭ম শ্রেণীর ক্লাসরুমে শিখন উপযোগী পরিবেশ শিক্ষার্থীদের জন্য যথোপযুক্ত কিনা?
* বিদ্যালয়গুলো কি শিক্ষার্থীদের জন্য যথোপযুক্ত শ্রেণীকক্ষ তৈরী করতে পারছে?
* কীভাবে একটি শ্রেণীকক্ষের শিখন উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়?
* সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর ঘাটতি কী জ্ঞান, দক্ষতা, রিসোর্স না কি আচরণগত তা অনুসন্ধান;



www.pathagar.com

# অধ্যায় ৩

১. গবেষণার পদ্ধতি
২. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি
৩. নমূনায়ন পদ্ধতি
- উদ্দেশ্যমূখী নমূনায়ন



www.pathagar.com

**গবেষণার পদ্ধতি ঃ**

এই গবেষণা পরিচালনার জন্য পরিমানবাচক ও গুণবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে-

* এই গবেষণার জন্য প্রার্থীকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ৩ পর্যায়ে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ১) শিক্ষার্থী ২) অভিভাবক, ৩) শিক্ষকগণের সাথে কথা বলে তাদের মতামত জরিপ করা হয়েছে।
* মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেণী কক্ষের পরিবেশের ভূমিকা কী তা যাচাইয়ের জন্য শ্রেণীকক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে;
* শিক্ষার্থীদের সাথে মুক্ত আলোচনা করা হয়েছে;
* মাধ্যমিক তথ্যের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাপত্র থেকে তথ্যাদি সংগ্রহও করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ৮ম শ্রেণীর পরিবেশ সম্পর্কে বাস্তবধারণা পাওয়া গেছে। যা এই গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

**তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ**

এই গবেষণার জন্য তথ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎসর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

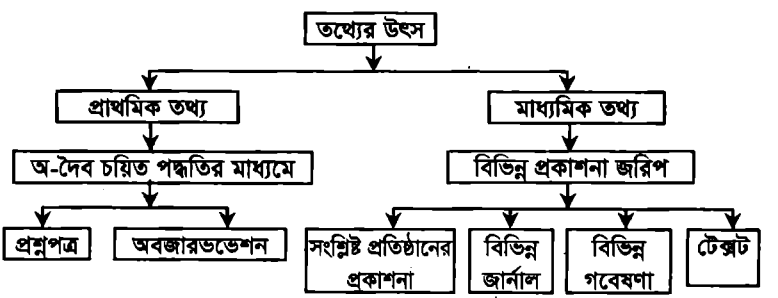




www.pathagar.com

**নমূনায়ণ পদ্ধতি ঃ**

এই গবেষণার জন্য অ-দৈব চয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

**উদ্দেশ্যমুখী নমূনায়ন ঃ**

এই পদ্ধতিতে গবেষক তার ব্যক্তিগত পছন্দ বা অভিজ্ঞতা থেকে নমূনা সংগ্রহ করে নমূনা গঠন করে। নমূনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা তত্ত্ব ব্যবহার করা হয় না। গবেষক তার গবেষণার বিষয়ের বিবেচনা করে নমূনা নির্বাচন করে এবং নির্বাচিত নমূনাগুলোকে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশেষ প্রতিনিত্বমূলক বলে ধরে নেওয়া হয়। এই নমূনায়নের ব্যক্তিগত ঝুকি পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় উদ্দেশ্যমূলক নমূনায়নে গুচ্ছ নমূনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত সমগ্রকের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যপর্ণ এককের সংখ্যা খুব কম হলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধার হলো এতে কম খরচ এবং কম সময়ের প্রয়োজন হয়।



www.pathagar.com

# অধ্যায় ৪

১. তথ্য বিশ্লেষণ

২. প্রাপ্ত ফলাফল



www.pathagar.com

**তথ্য বিশ্লেষণ ঃ**

তথ্য গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণের জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের মধ্যে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপ কার্য থেকে যে সব তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলোকে নির্ধারিত টেবিলে উত্তর দাতার সংখ্যা অনুযায়ী শতকরা হারে প্রকাশ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যা নিচের টেবিলসমূহের মাধ্যমে দেখানো হলো।

**প্রাপ্ত ফলাফল ঃ**

ক. শ্রেণীকক্ষের শিখন উপযোগী পরিবেশ বিষয়ে ২০ জন শিক্ষার্থীর মতামত

ক. ১. শ্রেণীকক্ষের ভৌত সুবিধাদী

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | শ্রেণীকক্ষটি কি রঙ্গিন | ৬ | ১৪ | ৩০% | ৭০% |
| ২ | শ্রেণীকক্ষটি কি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন? | ৮ | ১২ | ৪০% | ৬০% |
| ৩ | শ্রেণী কক্ষে কি বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে? | ৮ | ১২ | ৪০% | ৬০% |
| ৪ | শ্রেণী কক্ষে কি পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রয়োজন? | ৮ | ১২ | ৪০% | ৬০% |
| ৫ | শ্রেণী কক্ষে কি আশেপাশে কি হৈ চৈ হয়? | ১৩ | ৭ | ৬৫% | ৩৫% |
| ৬ | ব্ল্যাক বোর্ডের অবস্থা কি ভাল? | ০ | ২০ | ০% | ১০০% |
| ৭ | ক্লাশের বেঞ্চগুলো কি ভাল? | ৮ | ১২ | ৪০% | ৬০% |

ক.২. শিক্ষণ প্রক্রিয়া

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | শিক্ষকগণ কি নিয়মিত ক্লাশ নেন? | ২০ | ০ | ১০০% | ০% |
| ২ | শিক্ষকগণ কি দলে বসে পড়তে বা লিখতে দেন? | ৭ | ১৩ | ৩৫% | ৬৫% |
| ৩ | শিক্ষকগণ কি জুটিতে বসে পড়তে বা লিখতে দেন? | ৭ | ১৩ | ৩৫% | ৬৫% |
| ৪ | শিক্ষকগণ কি শুধু বক্তৃতা দিয়ে ক্লাস নেন? | ১৮ | ২ | ৯০% | ১০% |



www.pathagar.com

উপরোক্ত টেবিল থেকে দেখা যায় শিক্ষকগণ ১০০% নিয়মিত এবং পূর্ণ সময় ধরে ক্লাশ নেন। কিন্তু তেমন কোন অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। শিশুদের শ্রেণী কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহন কম। শুধুমাত্র একমূখী বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহার কতটা শিখন উপযোগী তা ভেবে দেখা দরকার।

ক.৩. শিশুদের অংশগ্রহন

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | ক্লাশে তোমার কোন কাজ সবার সামনে উপস্থাপন করতে পার? | ৮ | ১৬ | ২০% | ৮০% |
| ২ | পড়া পাড়লে কি তোমাকে প্রশংসা করা হয়? | ৫ | ১২ | ৪০% | ৬০% |
| ৩ | তোমার কি এ যাবৎ কোন দেয়াল পত্রিকা তৈরী করেছ? | ০ | ২০ | ০% | ১০০% |
| ৪ | ক্লাশে কি কবিতা, নাটক বা বিতর্ক করার কোন সুযোগ আছে? | ৫ | ১৫ | ২৫% | ৭৫% |
| ৫ | তুমি কি লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পার? | ০ | ২০ | ০% | ১০০% |

উপরের টেবিল থেকে দেখা যায় শ্রেণীকক্ষে শিশুদের অংশগ্রহনের সুযোগের হার বেশ কম। ৮০% শিশু নিজেদের কাজ সবার সামনে তেমন একটা উপস্থাপন করতে পারে না। ১০০% শিশু বলেছে তারা কোন দেয়াল পত্রিকা তৈরী করতে পারে না। এছাড়া ক্লাশে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম তেমন করার সুযোগ নেই।

ক. শ্রেণী কক্ষে শিখন উপযোগী পরিবেশ বিষয় ৫ জন শিক্ষকের মতামত

খ. ১. শ্রেণী কক্ষের ভৌত সুবিধাদি

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | শ্রেণী কক্ষটি কি রঙ্গিন হওয়া দরকার? | ৫ | ০ | ০% | ১০০% |
| ২ | শ্রেণী কক্ষটি কি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার? | ৫ | ০ | ০% | ১০০% |
| ৩ | শ্রেণী কক্ষে কি বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দরকার? | ৫ | ০ | ০% | ১০০% |
| ৪ | শ্রেণীকক্ষটি হৈ চৈ মুক্ত হওয়া প্রয়োজন? | ৫ | ০ | ০% | ১০০% |
| ৫ | ব্ল্যাক বোর্ড এবং বেঞ্চের অবস্থা কি ভাল হওয়া প্রয়োজন? | ৫ | ০ | ০% | ১০০% |



www.pathagar.com

উপরোক্ত টেবিল থেকে দেখা যায় ১০০% শিক্ষক মনে করছেন শিখন উপযোগী পরিবেশের জন্য উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো প্রয়োজন।

খ.২. শেখানোর জন্য শিক্ষকের আন্তরিকতা

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতার সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | পড়ানোর সময় কি কোন মডেল/ছবি/চিত্র ব্যবহার করেন? | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |
| ২ | বিস্তারিত পাঠ টীকা তৈরী সময় পান? | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |
| ৩ | ক্লাশ শিখন উপযোগী করার জন্য কি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম প্রয়োজন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |
| ৪ | শিখন স্থায়ী করার জন্য কি অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতিতে পড়ানো প্রয়োজন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |

উপরের টেবিল থেকে দেখা যায় ৬০% শিক্ষক পড়ানোর সময় সহায়ক উপকরণ তেমন একটা ব্যবহার করেন না। তারা বিস্তারিত পাঠটীকা তৈরীর জন্য পর্যাপ্ত সময়ও পান না। তবে তারা সংক্ষিপ্ত পাঠটীকা করে ক্লাস নেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়াও ১০০% শিক্ষক বলেছেন, শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম এবং অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

গ. ২. বিদ্যালয়ে কমিউনিটির/অভিভাবকগণের অংশগ্রহণ

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | আপনি কি আপনার সন্তানের স্কুলটি ভিজিট করেছেন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |
| ২ | আপনি কি কোন অভিভাবকের সভায় যোগ দিয়েছেন? | ১ | ৪ | ২০% | ৮০% |
| ৩ | কেউ কি আপনাকে কোন সময় স্কুলটি ভিজিট করতে উৎসাহিত করেছেন? | ১ | ৪ | ২০% | ৮০% |
| ৪ | বিদ্যালয়ের শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য কি অভিভাবকদে মতামত নেয়া প্রয়োজন? | ৪ | ১ | ৮০% | ২০% |
| ৫ | আপনি কি মনে করেন স্কুলে একটি লাইব্রেরী থাকা প্রয়োজন। | ৫ | ০ | ১০০ % | ০% |



www.pathagar.com

১০০% অভিভাবক বলেছেন স্কুলে একটি লাইব্রেরী থাকা প্রয়োজন। ১০০% অভিভাবকই স্কুল ভিজিট করেছেন। তবে তা নিজেদের আগ্রহে। সন্তানদের স্কুলে ফি দেয়ার স্বার্থে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের বিদ্যালয় ভিজিটে তেমন একটা উৎসাহিত করেননি বলে মনে করছেন বেশীরবাগ অভিভাবকরা।

**প্রাপ্ত ফলাফল**

ক. শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | শিক্ষকগণ কি নিয়মিত ক্লাশ নেন? | ৬ | ১৪ | ৩০% | ৭০% |
| ২ | শিক্ষকগণ কি দলে বসে পড়তে বা লিখতে দেন? | ৮ | ১২ | ৪০% | ৬০% |
| ৩ | শিক্ষকগণ কি জুটিতে বসে পড়তে বা লিখতে দেন? | ৮ | ১২ | ৪০% | ৬০% |
| ৪ | শিক্ষকগণ কি শুধু বক্তৃতা দিয়ে ক্লাস নেন? | ৮ | ১২ | ৪০% | ৬০% |
| ৫ | শ্রেণী কক্ষে কি আলো বাতাস প্রবেশ করে? | ১২ | ৭ | ৬৫% | ৩৫% |
| ৬ | শ্রেনী কক্ষে বা আশে পাশে কি হৈ চৈ হয়? | ০ | ২০ | ০% | ১০০% |
| ৭ | ক্লাশের বেঞ্চগুলো কি ভালো? | ৮ | ১২ | ৪০% | ৬০% |
| ৮ | শিক্ষকগণ কি নিয়মিত ক্লাস নেন? | ২০ | ০ | ১০০% | ০% |
| ৯ | শিক্ষকগণ কি দলে বসে লিখতে বা পড়তে দেন? | ৭ | ১৩ | ৩৫% | ৬৫% |
| ১০ | শিক্ষকগণ কি জুটিতে বসে পড়তে বা লিখতে দেন? | ৭ | ১৩ | ৩৫% | ৬৫% |
| ১১ | শিক্ষকগণ কি শুধু বক্তৃতা দিয়ে ক্লাস নেন? | ১৮ | ২ | ৯০% | ১০% |
| ১২ | ক্লাসে তোমার কোন কাজ সবার সামনে উপস্থাপন করতে পার? | ৪ | ১৬ | ২০% | ৮০% |
| ১৩ | পড়া পারল কি তোমার কে প্রশংসা করা হয়? | ৮ | ১২ | ৪০% | ৬০% |



www.pathagar.com

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১৪ | তোমরা কি এ যাবৎ কোন দেয়াল পত্রিকা তৈরী করেছ? | ০ | ২০ | ০% | ১০০% |
| ১৫ | তুমি কি লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পার? | ৫ | ১৫ | ২৫% | ৭৫% |
| ১৬ | বই, খাত, চক, পেন্সিলের বাইরে পড়া বোঝার জন্য কোন উপকরণ যেমন ছবি, চাট ম্যাপ ব্লক, গ্লোব কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করতে পার? | ৪ | ১৬ | ২৫% | ৭৫% |

খ. শিক্ষকগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | শ্রেণীকক্ষটি কি রঙ্গিন হওয়া দরকার? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |
| ২ | শেণীকক্ষটি কি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |
| ৩ | শ্রেণী কক্ষে কি বসার জন্য পর্যপ্ত জায়গা থাকা দরকার? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |
| ৪ | শ্রেণী কক্ষে কি পর্যপ্ত আলো বাতাস থাকা প্রয়োজন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |
| ৫ | শ্রেণী কক্ষটি হৈ চৈ মুক্ত হওয়া প্রয়োজন হয়? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |
| ৬ | ব্ল্যাক বোর্ডে এবং বেঞ্চের অবস্থা কি ভাল হওয়া প্রয়োজন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |
| ৭ | পড়ানোর সময় কি কোন মডেল/ছবি/চিত্র ব্যবহার করেন? | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |
| ৮ | বিস্তারিত পাঠটীকা তৈরীর সময় পান? | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |



www.pathagar.com

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ৯ | ক্লাস শিখন উপযোগী করার জন্য কি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম প্রয়োজন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |
| ১০ | শিখন স্থায়ী করার ন্যায় কি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পড়ানো প্রয়োজন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |

গ. অভিভাবকগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | আপনার সন্তানের শ্রেণী কক্ষটি কি রঙ্গীন? | ১ | ৪ | ২০% | ৮০% |
| ২ | আপনার সন্তানের শ্রেণী কক্ষে কি শিক্ষার্থীদের বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে? | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |
| ৩ | আপনার সন্তানের শ্রেণীকক্ষে কি আলো-বাতাস পর্যাপ্ত? | ২ | ৩ | ৪০% | ৬০% |
| ৪ | আপনার সন্তানের শ্রেণীকক্ষের আশেপাশে হৈ চৈ হয়? | ৪ | ১ | ৮০% | ২০% |
| ৫ | আপনার সন্তানের শ্রেণীকক্ষের বেঞ্চ ও ব্ল্যাক বোর্ডের কি অবস্থা? | ৩ | ২ | ৬০% | ৪০% |
| ৬ | আপনি কি আপনার সন্তানের স্কুলটি ভিজিট করেছেন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |
| ৭ | আপনি কোন অভিভাবক সভায় যোগ দিয়েছেন? | ১ | ৪ | ২০% | ৮০% |
| ৮ | স্কুল কর্তৃপক্ষ কি আপনাকে কোন সময় স্কুলটি ভিজিট করতে উৎসাহ করে? | ১ | ৪ | ২০% | ৮০% |
| ৯ | বিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য কি অভিভাবকদের মতামত নেয়া প্রয়োজন? | ৪ | ১ | ৮০% | ২০% |
| ১০ | আপনি কি মনে করেন স্কুলে একটি লাইব্রেরী থাকা প্রয়োজন? | ৫ | ০ | ১০০% | ০% |



www.pathagar.com

**গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি**

. ১০০% শিক্ষার্থী বলছে তাদের ব্লাকবোর্ড মানসম্মত নয়;

. ৭০% শিক্ষার্থী বলেছে তাদের শ্রেণীকক্ষে চার্ট মডেল ছবি ম্যাপ ইত্যাদি নেই;

. ৬০% শিক্ষার্থী বলেছে তাদের শ্রেণী কক্ষে বসার জন্য মানসম্মত ব্যবস্থা নেই;

. ১০০% শিক্ষার্থী বলেছে তাদের শিক্ষকগণ নিয়মিত ক্লাস নেন;

. ৬০% শিক্ষার্থী বলেছে তাদের শ্রেণী কক্ষে বাতাস প্রবেশ করে কম;

. সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম কম;

. দেয়াল পত্রিকাসহ অন্যান্য কার্যক্রম

. ১০০% শিক্ষার্থী স্কুলে একটি লাইব্রেরী থাকার ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন;

. ৬০% শিক্ষার্থী বলেছে ক্লাস পরিচালনর জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি কম ব্যবহার হয়;

. বেশীরভাগ শিক্ষক বক্তৃতা বা একমুখী পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্লাস পরিচালনা করেন;

. ক্লাস পরিচালনার জন্য শিখন উপকরণ ব্যবহার করা হয় কম (৬০%)

. ১০০% শিক্ষক মনে করেন স্কুলে ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন;

. ক্লাস পরিচালনার জন্য বিস্তারিত পাঠ পরিকল্পনা সকলে তৈরী করেন না।

**সুপারিশ**

একটি শ্রেণী কক্ষে শিখন পরিবেশ বজায় রাখার জন্য

. শ্রেণী কক্ষের ভৌত সুবিধাদী পর্যাপ্ত ও মানসম্মত হওয়া দরকার। যেমন বেঞ্চ, ব্ল্যাক বোর্ড ইত্যাদি;

. শ্রেণী কক্ষের ভৌত সুবিধাদীর অংশ হিসাবে শ্রেণী কক্ষের দেয়াল চার্ট ছবি ক্যালেন্ডার ইত্যাদি থাকা দরকার।

. শ্রেণী কক্ষে আলো-বাতাস প্রবেশ করার ব্যবস্থা থাকলে তা শিখন পরিবেশের জন্য সহায়ক;

. শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের বসার জন্য যথেষ্ট জাগয়া প্রয়োজন। যাতে তারা শ্রেণী কক্ষে একটু ভালভাবে নড়াচড়া করতে পারে;

. শ্রেণী কক্ষে যেন হৈ চৈ সময় হয় বা আশেপাশের শব্দ প্রবেশ না করে সেটি কর্তৃপক্ষের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন;

. শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া যেন অংশগ্রহণ মুলক হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার;

. শ্রেণী কার্যক্রমে আনন্দদায়ক ও উপযোগী করার জন্য শিখন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে;

. শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিশুদের নানা ভাবে উৎসাহিত করতে হবে

. বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি অংশগ্রহণ জরুরী।



www.pathagar.com

**উপসংহার ঃ**

শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি শ্রেণীকক্ষ প্রয়োজন যেখানে শিক্ষার্থীরা শিখে মজা পায়। ভয়ভীতি মুক্ত উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ আছে, প্রশ্ন করা যায়, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম আছে, স্নেহ ভালবাসা বিদ্যামান পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ, কাজের স্বীকৃতি ও প্রশংসা পাওয়া যায়, মনোরম পরিবেশে ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ যাবতীয় সুষ্ঠু পরিবেশের ব্যবস্থা করা।

একটি শিশু তখনই সুস্থ ও সুন্দরভাবে শেখে যখন সে শেখার জন্য উপযোগী পরিবেশ পায় আর শেখার উপযোগী পরিবেশ হল-

নিরাপদ পরিবেশ, আকর্ষণীয় পরিবেশ বৈচিত্রময় পরিবেশ ভয়ভীতিমুক্ত পরিবেশ প্রশ্ন করার স্বাধীনতা আছে এমন পরিবেশ, শান্তিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ, স্নেহ, ভালবাসা, আদর-যত্ন, বন্ধুত্বময় পরিবেশ, পারস্পারিক সহযোগীতা আছে এমন পরিবেশ সৃজনশীল ও উদ্দীপনামূলক পরিবেশ কাজ করার স্বাধীনতা আছে এমন পরিবেশ।

একটি বিদ্যালয়ে শিখন উপযোগী পরিবেশের জন্য শিক্ষকদের সন্তুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিও জড়িত। চাইলেও সবকিছু করা সম্ভব নয়। কমিউনিটি সরকার, শিক্ষক সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সদিচ্ছাই পারে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে।

সংযুক্তি ঃ ১

শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্নপত্র

(নীচের প্রশ্নে তোমার পছন্দমত যে কোন ঘরে টিক চিহ্ন দাও।)

শিক্ষার্থীর নাম ঃ .....

শ্রেণী ঃ ৭ম, রোল .....

বিদ্যালয়ের নাম ঃ .....

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | শিক্ষকগণ কি নিয়মিত ক্লাশ নেন? | | | | |
| ২ | শিক্ষকগণ কি দলে বসে পড়তে বা লিখতে দেন? | | | | |
| ৩ | শিক্ষকগণ কি জুটিতে বসে পড়তে বা লিখতে দেন? | | | | |
| ৪ | শিক্ষকগণ কি শুধু বক্তৃতা দিয়ে ক্লাস নেন? | | | | |
| ৫ | শ্রেণী কক্ষে কি আলো বাতাস প্রবেশ করে? | | | | |



www.pathagar.com

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ৬ | শ্রেণী কক্ষে বা আশেপাশে হৈ চৈ হয়? | | | | |
| ৭ | ক্লাশের বেঞ্চগুলো কি ভালো? | | | | |
| ৮ | শিক্ষকগণ কি নিয়মিত ক্লাস নেন? | | | | |
| ৯ | শিক্ষকগণ কি দলে বসে লিখতে বা পড়তে দেন? | | | | |
| ১০ | শিক্ষকগণ কি জুটিতে বসে পড়তে বা লিখতে দেন? | | | | |
| ১১ | শিক্ষকগণ কি শুধু বক্তৃতা দিয়ে ক্লাস নেন? | | | | |
| ১২ | ক্লাশে তোমার কোন কাজ সবার সামনে উপস্থাপন করতে পার? | | | | |
| ১৩ | পড়া পারলে কি তোমাকে প্রশংসা করা হয়? | | | | |
| ১৪ | তোমরা কি এ যাবৎ কোন দেয়াল পত্রিকা তৈরী করেছ? | | | | |
| ১৫ | ক্লাসে কি কবিতা, নাটক বা বিতর্ক করার কোন সুযোগ আছে? | | | | |
| ১৬ | তুমি কি লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পার? | | | | |
| ১৭ | বই, খাতা, চক, পেন্সিলের বাইরে পড়া বোঝার জন্য কোন উপকরণ যেমন ছবি, চার্ট ম্যাপ ব্লক, গ্লোব কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করতে পার? | | | | |



www.pathagar.com

## শিক্ষকগণের জন্য প্রশ্নপত্র

(নীচের প্রশ্নে তোমার পছন্দমত যে কোন ঘরে টিক চিহ্ন দাও।)

শিক্ষকের নাম ঃ.....

বয়স ঃ.....

শিক্ষাকতা যোগ্যতা ঃ .....

বিদ্যালয়ের নাম ঃ .....

অভিজ্ঞতা ঃ .....

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | শ্রেণীকক্ষটি কি রঙ্গিন হওয়া দরকার? | | | | |
| ২ | শেণীকক্ষটি কি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার? | | | | |
| ৩ | শ্রেণী কক্ষে কি বসার জন্য পর্যপ্ত জায়গা থাকা দরকার? | | | | |
| ৪ | শ্রেণী কক্ষে কি পর্যপ্ত আলো বাতাস থাকা প্রয়োজন? | | | | |
| ৫ | শ্রেণী কক্ষটি হৈ চৈ মুক্ত হওয়া প্রয়োজন হয়? | | | | |
| ৬ | ব্ল্যাক বোর্ডে এবং বেঞ্চের অবস্থা কি ভাল হওয়া প্রয়োজন? | | | | |
| ৭ | পড়ানোর সময় কি কোন মডেল/ছবি/চিত্র ব্যবহার করেন? | | | | |
| ৮ | বিস্তারিক পাঠটীকা তৈরীর সময় পান? | | | | |
| ৯ | ক্লাস শিখন উপযোগী করার জন্য কি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম প্রয়োজন? | | | | |
| ১০ | শিখন স্থায়ী করার ন্যায় কি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পড়ানো প্রয়োজন? | | | | |



www.pathagar.com

## অভিভাবকগণের জন্য প্রশ্নপত্র

(নীচের প্রশ্নে তোমার পছন্দমত যে কোন ঘরে টিক চিহ্ন দাও।)

অভিভাবরেক নাম ঃ.....

বয়স ঃ..... পেশা ঃ.....

শিক্ষাকত যোগ্যতা ঃ.....

বাৎসরিক আয় ঃ.....

ঠিকানা ঃ বাড়ী নং ..... সড়ক নং ঃ.....

থানা ঃ ..... জেলা ঃ.....

অভিজ্ঞতা ঃ.....

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রশ্নসমূহ | উত্তরদাতা সংখ্যা | | শতকরা হার | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| ১ | আপনার সন্তানের শ্রেণী কক্ষটি কি রঙ্গীন? | | | | |
| ২ | আপনার সন্তানের শ্রেণী কক্ষে কি শিক্ষার্থীদের বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে? | | | | |
| ৩ | আপনার সন্তানের শ্রেণীকক্ষে কি আলো-বাতাস পর্যাপ্ত? | | | | |
| ৪ | আপনার সন্তানের শ্রেণীকক্ষের আশেপাশে হৈ চৈ হয়? | | | | |
| ৫ | আপনার সন্তানের শ্রেণীকক্ষের বেঞ্চ ও ব্ল্যাক বোর্ডের কি অবস্থা? | | | | |
| ৬ | আপনি কি আপনার সন্তানের স্কুলটি ভিজিট করেছেন? | | | | |
| ৭ | আপনি কোন অভিভাবক সভায় যোগ দিয়েছেন? | | | | |
| ৮ | স্কুল কর্তৃপক্ষ কি আপনাকে কোন সময় স্কুলটি ভিজিট করতে উৎসাহ করে? | | | | |
| ৯ | বিদ্যালয়ের শিক্ষ শিখন প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য কি অভিভাবকদের মতামত নেয়া প্রয়োজন? | | | | |
| ১০ | আপনি কি মনে করেন স্কুলে একটি লাইব্রেরী থাকা প্রয়োজন? | | | | |



www.pathagar.com

# শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার ও সহপাঠীর ভূমিকা

**পরিবার ঃ**

সামাজিকীকরণের যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে পরিবারের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে যে, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বংশগতি মূল উপাদান যোগায়, সংস্কৃতি নক্শা তৈরি করে এবং পরিবারে পিতামাতা কারিগর হিসেবে কাজ করে। কারণ শিশুর সমস্ত দৈহিক, মানসিক, বস্তুগত ও অবস্তুগত যাবতীয় প্রয়োজন মেটায় পরিবার। পরিবারের শিশু তার চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। মূলতঃ শিশুর চরিত্রের ভিত্তি প্রস্তর রচিত হয় পরিবারেই। কীভাবে কথা বলতে হয়, নিজের আবেগ কীভাবে প্রকাশ করা হয় তা শিশু পরিবার হতেই শিক্ষা লাভ করে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের জীবন যুদ্ধে মুখোমুখি হতে পারে তার জন্য পূর্ব হতেই পরিবার তাকে শিক্ষা প্রদান করে। পরিক্ষার শিশুর অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। শিশুর চলাফেরা, কথাবার্তা, ভাষা শিক্ষা দেওয়া, আচার আচরন শিক্ষা দেওয়া, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দান করার দায়িত্ব একমাত্র পরিবারের। সমাজের এক জন যোগ্য ও দায়িত্বশীল গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের অবদান সবচেয়ে বেশী। সুতরাং শিশুর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে তিনটি সম্পর্কের উপর, যথা (১) পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্ক (২) পিতা-মাতা ও শিশুর মধ্যে সম্পর্ক এবং (৩) পরিবারের শিশুদের মধ্যে সম্পর্কের ওপর।

**সহপাঠী :**

শিশুর সামাজিকীকরণে তার সহপাঠী বা খেলার সাথীরা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। শিশু তার খেলার সাথীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে তার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি পরিস্ফুটিত হয়। সে স্বাবলম্বী হতে শিখে। অন্যদিকে কিশোর অপরাধী হওয়ার অন্যতম কারণ হল খেলার সাথী। গবেষণায় দেখা গেছে যেসব শিশু রেললাইন, রাস্তা, অলিগলি, বস্তিতে ঘুরে বেড়ায় ও খেলা ধুলা করে তারা পরবর্তীকালে বিভিন্নরকম অপরাধমূলক কাজে বেশী লিপ্ত হয়। অর্থাৎ একটা শিশুকে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত করার ব্যাপারে খেলার সাথী সঙ্গিসাথী খুব শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

সাধারণত : সমাজ বলতে আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝি। শুরুতে সমাজ বলতে মানুষের সব রকম পারস্পরিক সম্পর্ককেই বোঝায়। যেমন ম্যাকাইভার বলেন, "সামাজিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ রূপই হলো সমাজ।" সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস বলেন : মানুষ নিজেই সমাজ, মানুষ পরস্পরের সাথে যৌথ ভাবে মিলেমিশে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি একত্রিত হয় বা কোন সংগঠন গড়ে



www.pathagar.com

তোলে তবে তাকে সমাজ বলে। ম্যাকাইভার সমাজ বলতে সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিককে বুঝিয়েছেন-যার মধ্যে আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। এরিস্টেটল বলেছেন 'মানুষ সামাজিক জীব', সমাজবিহীন মানুষ হয় দেবতা, না হয় পশু। সুপ্রচীনকাল থেকে মানুষ সমাজে বাস করে আসছে। সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে সমাজে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান।

সাধারণত : দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকলে যে কোন জনসমষ্টিকে সমাজ বলা যায়।

১) বহুলোকের সংঘবদ্ধ ভাবে বসবাস।

২) এই সংঘবদ্ধতার পিছনে কোন একটি উদ্দেশ্য থাকা।

সামাজিক অস্তিত্বের এ দুটি শর্ত পূরণ করতে হলে সংঘবদ্ধ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক স্বীকৃতি ও অভিন্ন অভিন্ন অনুভূতি থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখনই তাকে সমাজ বলা হয়।

**সমাজের উপাদান :**

১। সংঘবদ্ধ মানুষ : সমাজের প্রধান উপাদান হলো সংঘবদ্ধ মানুষ। মানুষ ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

২। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সচেতনতা : পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সচেতনতা না থাকলে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আর সামাজিক সম্পর্কহীন মনুষ্য গোষ্ঠীকে সমাজ বলা যায় না। সুতরাং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সচেতনতা সমাজ গঠনের অন্যতম উপাদান হিসেবে অভিহিত করা যায়।

৩। সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য : সমাজ গঠন করতে যেমন কতগুলো মানুষের প্রয়োজন তেমনি ঐ সব মানুষের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে অন্তত; সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে যে সম্বন্ধে তাদের মধ্যে অল্প-বিস্তর চেতনা থাকা। কেবলমাত্র সমাজের মধ্যে সাদৃশ্যই থাকবে, এটা ঠিক নয়। যেসব মানুষ নিয়ে সমাজ গঠিত, সেসব মানুষের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

৪। সহযোগিতা : সহযোগিতা গলো সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারন সহযোগিতা ছাড়া সমাজ টিকে থাকতে পারে না। পারস্পরিক সহযোগিতা হলো সমাজের ভিত্তি।

৫। পরস্পর নির্ভরশীলতা : পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সমাজের আরেকটি উপাদান। সমাজের মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। কারণ মানুষ একা বাচঁতে পারে না। সমাজে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে না।



www.pathagar.com

**সামাজিকীকরণ ;**

সামাজিকীকরণ হলো শিশুকে সমাজের উপযুক্ত সদস্য ক'রে তৈরী করার প্রক্রিয়া অর্থাৎ যেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সামাজিক মূল্যবোধ অর্জন, সমাজের রীতিনীতি অনুযায়ী চিন্তা ও কাজ করতে শেখে। সামাজিকরন প্রক্রিয়া শিশু বয়স থেকে আরম্ভ হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রতিটি মানুষ তার সামাজিক পরিবেশের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে কখনও সমাজকে প্রভাবিত করে, আবার কখনও সে সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যার ফলে তার জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে।

**সংস্কৃতি ঃ**

বাংলা 'সংস্কৃতি' শব্দটির ইংরেজি হলো কালচার (Culture) । ষোল শতকের শেষার্ধে ফ্রান্সিস বেকন সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে Culture শব্দটা ব্যবহার করেন। সংস্কৃতি শব্দটি প্রায় প্রতিদিনই আমরা ব্যবহার করে থাকি। মূলত সংস্কৃতি হচ্ছে A way of life যাকে বাংলায় বলে জীবন যাপন পদ্ধতি। অতএব কোন সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতিকে বা প্রণালীকে বোঝায়। প্রকৃত পক্ষে, সংহম হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টি। মানুষ তার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত- সে কারণে এর চিরন্তন কোন রূপ নেই অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। টি, এস, ইলিয়ট (T.S. Eliot) এর মতে মানুষের বৈশিষ্ট্যময় কার্যকলাপ এবং আগ্রহই হলো তার সংস্কৃতি" । ই, বি, টেইলর (E.B.Taylor) এর মতে "সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির অর্জিতজ জ্ঞান, বিশ্বাষ, কলা, নৈতিকতা, আইনপ্রথা এবং অন্যান্য সামর্থ অভ্যাসের জটিল সমষ্টি হলো তার সংস্কৃতি" । অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটি জটিল সামগ্রিক ব্যবস্থা যার অর্ন্তগত রয়েছে সমস্ত মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, আস্থা-বিশ্বাস, শিল্পকলা, আইন-কানুন, রীতিনীতি, আচার-আচরন, অভ্যাস, মূল্যবোধ, প্রভৃতি যা কিছু মানুষ সমাজের একজন সদস্য হিসেবে অর্জন করে থাকে। টেইলরের সজ্ঞাটি আরো সহজ করে বললে সমাজস্থ মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালীকে সংস্কৃত নামে অভিহিত করা যায়। এখানে মার্জিত-অমার্জিতের কোন স্থান নেই।

কিংসলে ডেভিস বলেছেন : 'Man's social life is governed by his culture' অতএব সমাজস্থ মানুষের সর্মগ্র জীবনের প্রকাশ ঘটায় যে সব উপাদান তাই তার সংস্কৃতি। নথ-এর মতে "সংস্কৃতি হলো" কোন সমাজের সদস্যরা বংশ পরম্পরায় যে সব আচার, প্রথা ও অনুষ্ঠান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি একাধারে জীবন যাত্রার নিয়ম প্রণালি, যথা : আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব, অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, খাদ্যভ্যাস,



www.pathagar.com

পোষাক, ভাষা, অনুভূতি, বিবাহ পদ্ধতি, মৃত্যুর পর সৎকার পদ্ধতি, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়গুলি। অন্যদিকে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও উপকরণের সামগ্রীক রূপ যেমন- ঘরবাড়ি, খাদ্য দ্রব্য, আসবাপত্র, যানবাহন প্রভিতি সংস্কৃতির অঙ্গ। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়ক সকল কিছুই হলো সংস্কৃতি।

মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সংস্কৃতির ভূমিকা অনন্য। সংস্কৃতি মানুষের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন সাহায্য করে।

১) সংস্কৃতি ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে।

২) সাংস্কৃতিক উপাদান ব্যক্তিকে সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে শেখায়।

৩) সংস্কৃতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করে।

প্রত্যেক সমাজে রয়েছে নিজস্ব রীতি নীতি আচার-আচরণ, চাল-চলন, উৎসব। এগুলিই প্রথা। প্রথাগুলি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে সৃষ্ট। আমাদের সমাজে বড়দের সালাম দেয়া, আদাব দেয়া; ছোটদের স্নেহ করা প্রথা। তেমনি বর্ষবরণ, নবান্ন উৎসব- এগুলি ধর্মীয় উৎসব নয় তবে দেশীয় বা সামাজিক-সাংস্কৃতি প্রথা।

**শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ**

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও দ্বিমুখী। সংস্কৃতি একদিকে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে অন্যদিকে শিক্ষা সংস্কৃতির লালন ও উন্নয়ন সাধন করে। এক কথায় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলো শিক্ষা আবার কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভাব অনিবার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন সমাজে যদি ধর্মের প্রভাব প্রবল থাকে, তবে সে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব অবশ্যম্ভবী। আবার কোন দেশের সংস্কৃতি যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রভাব থাকে, তবে শিক্ষায়ও এর প্রভাব পড়বে। মোট কথা, সমাজের শিক্ষাব্যবস্থায় তার সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। বারলেট এর মতে, 'Social tradition influence ways of thinking, imagining, and doing creative things' আর এই যে চিন্তা, মনে রাখা, কল্পনা করা, সৃজনশীলতা সব কিছুই শিক্ষার প্রক্রিয়ার অর্ন্তভূক্ত।

শিশু জন্মের পর থেকে সমাজের কৃষ্টিমূলক উপাদান গুলোর দ্বরা প্রভাবিত হয় এবং সেগুলোর নিয়ন্ত্রণেই সে সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করে। এ কারনেই শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণে তথা সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদান গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।



www.pathagar.com

বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগে যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হবে নিজস্ব সংস্কৃতির স্থায়িত্ব, অখন্ডতা ও সংহতির জন্য কাজ করা। এজন্য শিক্ষার কাজ হবে অতীতের ভিত্তিতে বর্তমান সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের চাহিদার সাথে সমন্বয়সাধন। এদিক থেকে বলা যায় কোন সমাজের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে ঐ সমাজের জীবন পদ্ধতি, দেশীয় প্রতিষ্ঠান, ভাষা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথা, লোকাচার, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা, ইত্যাদির সংরক্ষণ এবং যুগের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে এগুলোর উন্নয়ন।

**পরিবার ঃ** পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম মানব গোষ্ঠী। গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপই হলো পারিবারিক জীবন। প্রত্যেকটি মানুষ একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। এমন কোন মানব সমাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে পরিবার প্রথা নেই। পরিবার হলোএকটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন যেখানে পিতা-মাতা ও তাদের সন্তান-সন্ততি একত্রে বসবাস করে।

**পরিবারের সংজ্ঞা ঃ** অধ্যাপক নিমকফ পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেনে, "পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাতিসহ বা সন্তানাদি ছাড়া স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে।" সমাজবিজ্ঞনী ম্যাকাইভার বলেন, "পরিবার হলো একটি গোষ্ঠী যা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়।"

**পরিবার কীভাবে গঠিত হয় ঃ** বিবাহ হলো পরিবার গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত। এক জন পুরুষ সমাজ স্বীকৃত উপায়ে এক জন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে একটি একক পরিবার গঠন করে। তবে আদিম সমাজে বিবাহ ব্যতিরেকেই পরিবা গঠিত হত। কিন্তু আমাদের সমাজে এটা সম্ভব নয়। এমন পরিবার অজানা নয় যেখানে পিতৃমাতৃহীন ভাই-বোন অথবা মা ও মেয়ে বা ছেলে অথবা বাবা তার অবিবাহিত ছেলে বা মেয়ে অথবা দাদা তার নাতি বা নাতনি নিযে পরিবার গঠন করছে। সুতরা বলা যায় যে বিবাহের মাধ্যমে অথবা বিবাহ না করেও পরিবার গঠন করা যায়।

**পরিবারের প্রকারভদ ঃ** পরিবার বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান হলেও সমাজ ভেদে বা দেশ ভেদে পরিবারের রূপ ভিন্নরকম হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারের বিভিন্নবাবে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

১. স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (ক) এক পত্নীক পরিবার (খ) বহু পত্নীক পরিবর (হ) বহুপতি পরিবার।

২. পরিবারের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা কার উপর ন্যস্ত তার ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ- (ক) পিতৃপ্রধান পরিবার (খ) মাতৃপ্রধান পরিবার।

৩. বিবাহ উত্তর বাসস্থানের ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা ঃ- (ক) পিতৃবাস পরিবার (খ) মাতৃবাস পরিবার (গ) নয়াবাস পরিবার।



www.pathagar.com

৪। বংশ গণনার ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ- (ক) পিতৃ বংশানুক্রমিক পরিবার (খ) মাতৃ বংশানুক্রমিক পরিবার।

৫। পরিবারের আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা (ক)া অণুপরিবার (খ) বর্ধিত পরিবার এবং (গ) যৌথ পরিবার।

সামাজিকীকরণের যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে পরিবারের ভূমিকাই সর্বোপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে তাকে যে, শিমুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বংশগতি মূল উপাদান জোগায়, সংস্কৃতি নক্শা তৈরি করে এবং পরিবারে পিতামাতা কারিগর হিসেবে কাজ করে। কারন শিশুর সমস্ত দৈহিক, মানসিক, বস্তুগত ও অবস্তুগত যাবতীয় প্রয়োজন মেটায় পরিবার। পরিবারেই শিশু তার চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। মূলত ঃ শিশুর চরিত্রের ভিত্তি প্রস্তর রচিত হয় পরিবারেই। কীভাকে কথা বরতে হয়, নিজের আবেগ কীভাবে প্রকাশ করা হয় তা শিশু পরিবার হতেই শিক্ষা লাভ করে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের জীবযুদ্ধে মুখোমুখি হতে পারে তার জন্য পূর্ব হতেই পরিবার তাকে শিক্ষা প্রদান করে। পরিবর শিশুর অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। শিশুর চলাফেরা, কথাবার্তা, ভাষা শিক্ষা দেওয়া, আচার আচরণ শিক্ষা দেওয়া, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান করার দায়িত্ব একমাত্র পরিবারের। সমাজের এক জন যোগ্য ও দায়িত্বশীল গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের অবদান সবচেয়ে বেশি। সুতরাং শিশুর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে ৩টি সম্পর্কের ওপর, যথা ঃ-

(১) পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্ক

(২) পিতা-মাতা ও শিশুর মধ্যে সম্পর্ক এবং

(৩) পরিবারের শিশুদের মধ্যে সম্পর্কের ওপর।

**সহপাঠী ঃ** একই শ্রেণীতে একই সাথে যারা পড়াশুনা করে তারাই সহপাঠী। শিশুর সামাজিকীকরণে তার সহপাঠী বা খেলার সাথীরা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। শিশু তার খেলার সাথীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে তার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি পরিস্ফুটিত হয়। সে স্বাবলম্বী হতে শিখে। অন্যদিকে কিশোর অপরাধী হওয়ার অন্যতম করণ হল খেলার সাথী। গবেষণার দেখা গেছে যেসব শিশু রেললাইন, রাস্তা, অলিগলি, বস্তিতে ঘুরে বেড়ায় ও খেলাধূলা করে তারা পরবর্তীকালে বিভিন্নরকম অপরাধমূলক কাজে বেশি লিপ্ত হয়। অর্থাৎ একটা শিশুকে অপরাধমূলক কজে লিপ্ত করার ব্যাপারে খেলার সাথী বা সঙ্গীসাথী খুব শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।



www.pathagar.com

# মূল্যবোধ

ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Religion'। এটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 're' এবং 'legere' অথাব 'ligare' শব্দ থেকে যার অর্থ বন্ধন (bindback)। শব্দগত অর্থে ধর্ম হলো যা ব্যক্তিকে পারস্পরিক ভালবাসা, সহানুভূতি এব দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। নৃবিজ্ঞানী টেইলর এর মতে, "ধর্ম হলো জীবের আত্মিক বিশ্বাস" ডুর্খেইম বলেন যে, "ধর্ম হলো পবিত্র জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানাদি"। মনীষী ফেজার এ মতে, "ধর্ম হলো মানুষের চেয়ে উচ্চতর এমন একটি শক্তিতে বিশ্বাস যা মানব জীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে"। তার মতে, ধর্মের মূল উপাদান ২টি যথা (ক) মানুষের চেয়ে উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস এবং (খ) সে শক্তির আরাধনা। অন্যান্য দার্শনিকদের মতে ঃ Religion consists in belief in a super human power of power which control and guide the destiny of man, the sentiments of awe, reverence, love and devotion and the practical conduct which follows from them.

অর্থাৎ এক বা একাধিক মানবাতীত শক্তি যা মানুষের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, উহাতে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তদনুযায়ী ভীতি, শ্রদ্ধা, প্রেম ও ধ্যানের ভাবাবেগে উদ্গাত বাস্তব আচার ব্যবহারকে ধর্ম বলে।--(Introduction of Philosophy – Jadu Nath Singh) দার্শনিকদের উপরোক্ত সংজ্ঞ মতে স্রষ্টার কর্তৃক প্রেরিত বাণী বা প্রত্যাদিষ্ট বাণী থেকে। যে বাণীতে রয়েছে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, সামাজিক রাজনৈতিক, আরাধনা তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর নিয়ন্ত্রণাধিকার। স্রষ্টা মানুষের জন্য তাঁর স্বর্গীয় দূতের মাধ্যমে তাঁর মনোনিত মহাপুরুষদের নিকট যুগে যুগে এসব বানী প্রেরণ করেছেন। অতএব ঃ ধর্ম হচ্ছে এক মানবাতীত মহাশক্তি, যে শক্তি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সকল সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং যিনি সর্বশক্তির আধার, সই সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তাঁর প্রতি ভীতি, শ্রদ্ধা, প্রেম ও ধ্যানের ভাবাবগে উদ্গাত হয়ে তাঁর দেওয়া প্রত্যাদিষ্ট বিধি-বিধান মতে সর্ব কার্য পরিচালনা করা।

এককতা সর্বজন স্বীকৃত যে, ধর্ম ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশের মাধ্যমে তাকে মানসিক সুখ ও শান্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এটি সমাজ ব্যবস্থার একটি মৌলিক ও সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। ধর্ম সত্য, সুন্দর, দয়া, ভালোবাসা, সহানুভূতি, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তাই ধর্ম জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রত্যেক দেশে শিক্ষা শুরু হয়েছিল ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে। শুরুতে ধর্মই ছিল শিক্ষার ভিত্তি। যেমন- ভারতবর্ষে প্রাচীন ও মধ্য যুগে শিক্ষাব্যবস্থা মসজিদ, মন্দির, বৌদ্ধমঠ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের জীবনকে নানাবাবে প্রভাবিত করে। যে ব্যক্তি



www.pathagar.com

যে ধর্মে বিশ্বাসী সে ব্যক্তি ঐ ধর্মের রীতিনীতি ও বিধানসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। শৈশব কাল হতে যে ব্যক্তি ধর্মে বিশ্বাসী সে ব্যক্তি ঐ ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা লালিত হয় এবং সে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তীকালে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত হয়। ধর্ম মানুষের মনে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চালিত করে, স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ, সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণে গুণাবলি হতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম মানুষকে মন্দ পথ পরিহার করে সৎপথে চলার নির্দেশ দেয়, আচরণে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। এককতায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষা ধর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। শিক্ষা ও ধর্ম উভয়ের উদ্দেশ্যই এক, অর্থাৎ ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে জাগ্রত করা। ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষার কতগুলো দায়িত্ব পালন করে যার মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন হয়ে থাকে। ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান মানুষকে সামাজিক সংস্কৃতির পরিচয় দান, মহাপুরুষদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য অনুকরণে অনুপ্রাণিতকরণ, ব্যক্তির আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ, আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন, পরস্পরের মেলামেশার মাধ্যমে সৌহার্দ্যভাব গড়া প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে থাকে।

## মূল্যবোধ

শ্রমের মর্যাদা দান, চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, পরীক্ষায় নকল না করা, ঘুষ নেয়া, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখা, লোভ না করা, কারো বাড়ি বা অফিসে প্রবেশের অনুমতি নেওয়া, ওয়াদা রক্ষা করা, নিয়মিত নামাজ পড়া, রোজা না রাখা, অন্যের ক্ষতিসাধন করা, সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলা, ছিনতাই করা, মেহমানকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া, শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা, পকেট মারা, কথা দিয়ে কথা না রাখা, দান করা।

| মূল্যবোধের গ্রহণীয় আচরণ | মূল্যবোধের বর্জনীয় আচরণ |
|---|---|
| | |
| | |



www.pathagar.com

# বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শিক্ষা

অধিক জনসংখ্যা দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। জাতীয় উন্নয়নের প্রধানতম শর্ত হলো দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা। দেশের অর্থনীতি গতি আসবে যখন মানুষের ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশী হবে এবং দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বিদেশ থেকে পণ্য করলে এতে দেশের মুদ্রাস্ফীতিও বাড়বে। মুদ্রাস্ফীতি এবং দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটলে তাও অর্থনীতিকে নাজুক করে তুলবে।

**বাংলাদেশে অর্থনীতির নাজুকতার কারণ :**

১) স্বল্প মাথাপিছু আয়।
২) কৃষির উপর নির্ভরশীলতা।
৩) শিল্পে অনগ্রসরতা।
৪) মূলধনের অভাব।
৫) শিক্ষার অভাব।
৬) কারিগরি জ্ঞানের অভাব
৭) দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব ।
৮) প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার।
৯) ব্যাপক বেকারত্ব।
১০) প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন।
১১) বৈদেশিক বানিজ্যের ওপর নির্ভরশীলতা।
১২) দুর্বল অর্থনৈতিক অবকাঠামো।
১৩) প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ।
১৪) দারিদ্রের দুষ্টচক্র।
১৫) দ্বৈত অর্থনীতি।
১৬) বৈদেশিক সাহয্যের ওপর নির্ভরশীলতা।
১৭) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।
১৮) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব।
১৯) অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল জনসংখ্যা।
২০) আমদানি ওপর নির্ভরশীলতা।
২১) সরকারের অধিক ব্যয়।
২২) অপব্যয় ও অপচয়।
২৩) অনিয়ম ও দুর্নীতি।

অতএব উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করতে পারলে বাংলাদেশেও উন্নত দেশসমূহের মত নিত্য ব্যবহার্য ও বিলাসজাত দ্রব্যের যোগান প্রচুর তেমনি



www.pathagar.com

চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। বেকারত্বের হার কম থাকবে এবং বিভিন্ন আত্মনির্ভরশীলতা বিরাজ করবে।

আমাদে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। এর একটি প্রধান কারণ আমাদের দেশের জনসংখ্যার আধিক্য। তাছাড়া জনসংখ্যা একটি অংশ হলো বেকার। ফলে আমাদের জাতীয় উৎপাদন অত্যন্ত কম। তাছাড়া আয়ের সিংহভাগ খাদ্য ও বস্ত্র ক্রয়ের জন্য খরচ হয়ে থাকে। পৃথিবীব্যাপী যেখানে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে সেই প্রভাব উন্নয়নশীল দেশের জনগণের জীবনযাত্রার ওপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করছে।

অর্থনৈতিক মন্দার ফলে যে কোন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও আয়ের উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সমাজে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের জীবন মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর্থিক অসচ্ছলতার করণে সমাজে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের জীবন মান (Quality of life) নিচু স্তরে নেমে যায়। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতায় আক্রান্ত হয়। শিশু মৃত্যুহার বেড়ে যায় এবং তারা পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। অনুন্নত দেশে পারিবারিক নিরাপত্তার উৎসই হচ্ছে সন্তান, অধিক সন্তান পরিবারের জন্য জীবন বীমার মত কাজ করে। বাংলাদেশের মত আরো অনেক দেশে যেহেতু বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার ভরণ পোষণের কোন রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা নেই। সেজন্য তাদে একমাত্র ভরসা থাকে অধিক সন্তান বিশেষ করে পুত্র সন্তান। মরে বেচে যেসব সন্তান থাকবে তারাই আগামী দিনে পরিবারের আয়ের পরিবারে তথা উন্নয়ণশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সারণী-১

তিন দশকব্যাপী বিভিন্ন কয়েক প্রকার দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ও গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধি

| মাথাপিছু GNP ঃ ১৯৮০ সালের মার্কিন ডলার হিসেবে | | | | জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক গড় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৯৫০ | ১৯৬০ | ১৯৮০ | ১৯৫০-৬০ | ১৯৬০-৭০ | ১৯৭০-৮০ |
| শিল্পোন্নত দেশ | ৩,৮৪১ | ৫,১৯৭ | ৯,৬৮৪ | ১.২ | ১.০ | ০.৭ |
| মধ্য আয়ভূক্ত দেশ | ৬২৫ | ৮০২ | ১,৫২১ | ২.৪ | ২.৫ | ২.৫ |
| নিম্ন আয়ভূক্ত দেশ | ১৬৪ | ১৭৬ | ২৪৫ | ১.৯ | ২.৫ | ২.৩ |

উৎস ঃ World Development Report, World Bank, 1980



www.pathagar.com

**বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশের মাতাপিছু জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা ঃ**

সারণীতে দেখানো হয়েছে যে, শিল্পোন্নত দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৯৫০ সালে যেখানে ছিল ৩,৮৪১ মার্কিন ডলার তা তিন দশক পর প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৯,৬৮৪ মার্কিন ডলারে। তখন বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২ থেকে প্রায় অর্ধেক কমে দাড়ায় ০.৭ এর মধ্যে। নিম্ন আয়ভূক্ত দেশে তিনদশক সময়ে তাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় মাত্র ১৬৪ ডলার থেকে দেড়গুণ বেড়ে ২৪৫ মার্কিন ডলারে ওঠে, একই সময়ে তাদের জনসংখ্যা হারও ১.৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৩ এ উন্নীত হয়। এতে বোঝা যায় যে, অর্থনৈতিক দুরবস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম শক্তিশালী প্রভাবক। যে দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় কম সেদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই বেশী। সুতরাং দরিদ্রতার সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক বোঝানোর জন্য কতগুলো নির্বাচিত দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং তার জন্য বার্ষিক শতকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে সারণী-২ এ দেখানো হলো।

সরণী-২
কয়েকটি দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়
এবং বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

| দেশ | মাথাপিছু জাতীয় আয় মার্কিন ডলারে (১৯৮৮ হিসেবে) | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১৯৮৮ হিসেবে) |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ১৭০ | ২.৭ |
| ভারত | ৩৪০ | ২.০ |
| শ্রীলংকা | ৪২০ | ১.৮ |
| ইথিওপিয়া | ১২০ | ৩.০ |
| জাপান | ২১,০২০ | ০.৫ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ১৯,৮৪০ | ০.৭ |
| জার্মানী | ১৬,৫৭০ | ০.০ |

উৎস ঃ World Population Data Sheet, PRB, 1988, Human Development Report, 1991, UNDP.

উক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে সব দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় বেশী অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্বল্প আয়ভূক্ত দেশের তুলনায় অনেক কম। যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর মাথাপিছু জাতীয় আয় হলো যথাক্রমে ১৯৮৪০ এবং ১৬৫৭০ মার্কিন ডলার, এ দু'টি দেশের শতকরা



www.pathagar.com

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ০.৭ ও ০.০ যা উন্নয়নশীল দু'টি দেশ, বাংলাদেশ ও ভারতের তুলনায় অনেক কম। ভারত বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় যথাক্রমে ৩৪০ ও ১৭০ মার্কিন ডলার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.০ ও ২.৭ (সারণী-২)

উন্নয়নশীল দেশে পুষ্টিহীনতার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। যেখানে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ চরম পুষ্টিহীনতায় এবং শতকরা ৫০ ভাগ সাধারণ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। তাছাড়া ডায়রিয়া, হাম, আমাশয় ইত্যাদি এসব অঞ্চলের নিত্যসাথী এবং এর যেন কোন একটি রোগ হওয়ার পর দেহের পুষ্টিমান অত্যাধিক পরিমানে নেমে যায়। অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার প্রভাবে মৃত্যু প্রবণতা বিশেষ করে শিশু মৃত্যুহার বেড়ে যায়। পুষ্টিহীন পরিবারে সকলেই দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় এবং দুর্বল ব্যক্তি সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অধিক সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে বা স্বল্পতা ব্যবধানে গর্ভবর্তী হওয়ার কারণে মায়েদের স্বাস্থ্য অচিরেই ভেঙ্গে পড়ে এবং প্রসবকালীন মায়ের মৃত্যুপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বেশী সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে মায়ের যেমন অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহানী ঘটে তেমনি তার গর্ভজাত সন্তান ও প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে স্বাস্থ্যের অধিকারী ও রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এভাবেই পুষ্টিহীন সমাজে মৃত্যু বেশী হয় এবং অধিক মৃত্যু মানুষের জন্মহার বাড়িয়ে দেয়।

পুষ্টিহীনতার আরও কারণ হলো সাধারণ মানুষ খাবারের খাদ্য মান (Food value) জানেনা। কোন খাবারে কোন ধরনের ভিটামিন আছে তা না জানার জন্যও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। তাছাড়া স্বল্পমূল্যে অনেক খাবার আছে যেগুলোর খাদ্য মান (Food value) দামী খাবারের সমান। সে বিষয়েও জনগণ অজ্ঞাত রয়েছে। তাই স্বল্প আয়যুক্ত জনগণের খাবারের মান জেনে খাওয়া উচিত।



www.pathagar.com

# মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশ প্রক্রিয়া ঃ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ান

## বৃদ্ধির ধরণ ও দৈহিক পরিণমন

**ভূমিকা ঃ**

শিশু জন্ম গ্রহণ করে, আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। এই বড় হওয়ার ক্ষেত্রে তার অনেক রকম পরিবর্তন হতে থাকে। যেমন ঃ তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে, ওজন বাড়তে থাকে, হাত পা বড় হতে থাকে, হাত দিয়ে সে কিছুই ধরতে পারত না আস্তে আস্তে ধরা পরে নিজ ইচ্ছ মত সঞ্চালন করতে পারা, হাটতে দৌড়াতে ও খেলা করতে পারা, ৬/৭ বছর বয়সে দাঁত পড়ে নতুন দাঁত ওঠা, কথা বলতে পারা ইত্যাদি। অসংখ্য এ পরিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় কতক পরিবর্তন পরিমাণগত আর কতক পরিবর্তন গুণগত। পরিমাণগত পরিবর্তন যেমন ঃ দৈঘ্যের্র বৃদ্ধিকে 'বর্ধন' এবং গুণগত পরিবর্তন যেমন ঃ নিজে ফিডার ধরে খেতে পারাকে 'বিকাশ' বলে আখ্যায়িত করতে পারি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিণমন ও অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে এভাবেই শিশুর বিকাশ সাধিত হতে পারে।

**বর্ধন ঃ**

বর্ধন হচ্ছে পরিকমাণগত পরিবর্তন। জন্মের পর শিশুর পা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। সে লম্বা হচ্ছে, ওজন বাড়ছে, হাতটি মোটা হচ্ছে ইত্যাদি। জন্মের সময় শিশুর উচ্চতা ও ওজন যা তাকে বড় হওয়ার সাথে সাথে তা বৃদ্ধি পায়। জীবনের প্রথম দু'বছর উচ্চতা বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত থাকে। তারপর থেকে শিশুর দৈহিক বৃদ্দি অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে চলে।

জন্মের সময় শিশুর ওজন সাড়ে পাঁচ পাউন্ড থেকে নয় পাউন্ডের মধ্যে থাকে। এটাই সাধারণ ওজন। এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। সঠিক গড় ওজন বলা মুশকিল। তবে সাধারণ ভাবে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে হালকা হয়। জন্মের পর প্রথম পর্যায়ে ওজন কমতে থাকে। এক সপ্তাহের মাথায় শিশু আবার তার জন্মের সময়কার ওজন লাভ করে। চার মাস বয়সের মধ্যে শিশুর ওজন তার জন্মের ওজনের দ্বিগুণ হয়। এক বছর বয়সে তা তিন গুণ হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তিন বছর বয়স পর্যন্ত বছরে গড়ে ৫ পাউন্ড করে ওজন বাড়ে। প্রথম বছর উচ্চতার তুলনায় ওজন বেশি বৃদ্ধি লাভ করে। দ্বিতীয় বছর ওজনের তুলনায় উচ্চতা বাড়ে। দু'বছর পর্যন্ত দৈহিক দিক দিয়ে শিশু দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে।



www.pathagar.com

সারণী ঃ ২.১

| শৈশবের উচ্চতা বৃদ্ধি | |
|---|---|
| বয়স | উচ্চতা (ইঞ্চি) |
| জন্ম সময়ে | ১৯-২০ |
| ৪ মাস | ২৩-২৪ |
| ৮ মাস | ২৬-২৮ |
| ১ বৎসর | ২৮-৩০ |
| ২ বৎসর | ৩২-৩৪ |
| ৫ বৎসর | ৩৮-৪০ |

সরণী ঃ ২.২

| শৈশবের উচ্চতা বৃদ্ধি | |
|---|---|
| বয়স | ওজন (পাউন্ড) |
| জন্ম সময়ে | ৫.৫-৯ |
| ৪ মাস | ১২-১৬ |
| ৮ মাস | ১৮-২৪ |
| ১ বৎসর | ২১-২৭ |
| ২ বৎসর | ২৫-৩১ |
| ৫ বৎসর | ৩০-৪০ |

**উৎস ঃ** (Child Development, Fourth Edition, Elizabeth Hurlock International Student Edition)

ছয় বছরে শিশুদের ওজন জন্মের সময়ের ওজনের প্রায় ৭ গুণ বেশি হয়ে থাকে। মেয়েদের গড় ওজন ৪৫.৫ পাউন্ড ও ছেলেদের গড় ওজন ৪৯ পাউন্ড হয়। ৩ বছর বয়স থেকে ১১/১২ বছর বয়স অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত ওজন বৃদ্ধির হার অনেক কমে যায়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ওজন ও উচ্চতার এই হিসাব পাশ্চাত্য শিশুদের ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী। আমাদের দেশের শিশুদের ওজন ও উচ্চতা এই হিসাব থেকে কিছুটা কম হয়ে থাকে।

**বিকাশ ঃ**

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি দিকের পরিবর্তণ ঘটে যেটা হচ্ছে গুণগত পরিবর্তন। এটাকেই বিকাশ বলা হয়। যেমন- সে পূর্বে নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু ধরতে পারত না, ১ বৎসর বয়সে সে ইচ্ছামত থাবা দিয়ে ধরতে পারে। ২ বৎসর বয়সে শিশু নিজ অঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে বলে



www.pathagar.com

সাইকেল চালাতে পারে ইত্যাদি হচ্ছে শারীরিক বিকাশ। বিকাশ বলতে শুধুমাত্র উচ্চতার বৃদ্ধি বা দক্ষতার উন্নতি বোঝায় না কথা বলতে শেখা, শালীনতা বজায় রাখা, বাল্য বয়সে সমবয়সীদের সাথে মিশতে পারা, বিবেক নীতির শাসন মানা, কৈশোর কালে সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, দৈহিক পরিবর্তন মেনে নিয়ে লিঙ্গভেদে ভূমিকা পালন, সচেতন মূল্যবোধ গড়ে তোলা ইত্যাদিও বিকাশ। বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়া যেখানে বর্ধন ও ক্ষয় দুটোই ক্রিয়াশীল। জীবনের প্রথম দিকে ক্ষয়ের চেয়ে বর্ধন এবং জীবনের শেষের দিকে বর্ধনের চেয়ে ক্ষয় প্রাধান্য পায়।

পরিণমন ও অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের ধারাকে বিকাশ বলে। Development means a progressive series of changes that occurs as a result of maturation & experience.

**বিবর্তনের (বর্ধন ও বিকাশের) প্রকারভেদ ঃ**

মুতৃগর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে আমৃত্যু ব্যক্তির বর্ধন ও বিকাশগত পরিবর্তন হতে থাকে। এই পরিবর্তন ৪ (চার) ধরনের ঃ

ক) আকারগত পরিবর্তন (Change in size) ঃ শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার উচ্চতা, ওজন ও দেহের আয়তন বাড়ে- যেমন দৈর্ঘ ২০ থেকে ৬০ তে হওয়া সঙ্গে সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া।

এ ছাড়া স্মৃতিশক্তি, যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা, প্রত্যক্ষণ এবং সৃজনশীল কল্পনা শক্তিও পরিবর্তন ঘটে ধীর ধীরে। যে ছোট শিশুটি সংখ্যার ধারণা সহজে বুঝতে পারতো না সেই বড় হয়ে বিরাট বিরাট অঙ্গ কষতে সমর্থ হয়। এটা তার মানসিক ক্ষমতার পরিবর্তনের উদাহরণ।

খ) আনুপাতিক পরিবর্তন (Change in proportion) ঃ বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে। যেমন, জন্মের সময় শিশুর মাথা ও দেহের আকারগত অনুপাত থাকে ১ ঃ ৪ । প্রাপ্ত বয়সে তা হয়ে দাঁড়ায় ১ ঃ ১২। শিশুর হাত পা দেহের যে অনুপাতে বাড়ে চোখ কিংবা মাথা সে অনুপাতে বাড়ে না। জন্ম থেকে পূর্ণ বয়স পর্যন্ত দেহের। অঙ্গ পত্যঙ্গের এরূপ আনুপাতিক পরিবর্তন ঘটে।

গ) পুরাতন বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি (Disappearance of old Features) ঃ যেমন - দুধের দাঁত পড়ে যাওয়া। প্রথম যৌনাবস্থার পর থাইমাস গ্রন্থি বিলুপ্ত হওয়া। শিশু সুলভ কমনীয়তা হারিয়ে যাওয়া, শিশু সুলভ চলাফেরার পরিবর্তন, শিশুসুলভ কণ্ঠ ও কথাবার্তা পরিবর্তিত হওয়া। রূপকতার কল্প কাহিনীগুলো একসময় তার মনোযোগ কেড়ে নিত, বড় হওয়ার পর আর তার মন কেড়ে নেয় না ইত্যাদি। মোট কথা, শিশুর শারীরিক ও মানসিক তথা আচরণগত অনেক বৈশিষ্ট্য বড় হওয়ার সাথে সাথে হারিয়ে যায়।



www.pathagar.com

ঘ) নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন (Acquisition of New Features) ঃ ক্রমান্বয়ে শিশু কিছু নতুন বেশিষ্ট্য অর্জন করে। যেমন দুধের দাঁতের বদলে নতুন দাঁত, গলার স্বর পরিবর্তন, যৌন বৈশিষ্ট্য, নতুন ধরনের আগ্রহ, উদ্বেগ, বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি। অভিজ্ঞতা ও শিখনের ফলে কথা বলার কৌশল, বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনমূলক নৈপুন্য, বিভিন্নপ্রকার খেলার দক্ষতা, আবৃতি, অভিনয়, বক্তৃতা প্রভৃতি কুশলতা সে অর্জন করে।

**বর্ধন ও বিকাশের বৈশিষ্ট্য ও নীতি ঃ**

মাতৃগর্ভ থেকে শিশু ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এই বাড়নকে আমরা 'বর্ধন' ও 'বিকাশ' দুভাগে বিভক্ত করে দেখালেও তা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ও অবিচ্ছেদ্য। বর্ধন ও বিকাশের রয়েছে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিময় ধারা। রয়েছে কিছু বৈশিষ্ট্য ও নীতি। যেমন ঃ

**১। বিকাশ সুনির্দিষ্ট ও পূর্বোক্তিযোগ্য ধারা মেনে চলেঃ** এ ধারা জন্ম পূর্ব এবং জন্ম পরবর্তী উভয় সময়েই ঘটে থাকে। যেমন জন্ম পূর্ব পরিবেশে প্রথম সৃষ্টি হবে 'জাইগোট' তারপর কোষ বিভজন তারপর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন। ঠিক তেমনই জন্ম পরবর্তী সময়ে কথা বলার ব্যাপারে প্রথমে কুজন তারপর অস্পষ্ট উচ্চারণ , আধো আধো বোলা, একটি শব্দে পরে সংখ্যা বেড়ে মনের ভাব প্রকাশ। সংক্ষেপে বলা যায় আগের কাজটি আগে পরের কাজটি পরে। কখনও পরের কাজটি আগে হবে না।

**২। বিকাশ অগ্রসর হয় কতগুলো ধাপের মাধ্যমে ঃ** মাতৃগর্ভে জাইগোট গঠনের পর হতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি ধাপ বা ভাগের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি ধাপের রয়েছে আবার ক্রমবিকাশমূলক কাজ। বিশেষ ধাপের কাজগুলি যদি কেউ সম্পন্ন করতে না পারে তাবে তাকে অস্বাভাবিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আমাদের জীবন চক্রকে ভ্রূণ, নবজাতক, শৈশব, বাল্য, যৌবন বৃদ্ধকাল এভাবে মানোবিজ্ঞাণীগণ বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রত্যেকটি পর্যায়ের রয়েছে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য। সে সব বৈশিষ্ট্য অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি বিশেষ পরবর্তী পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রত্যেকটি পর্যায়ের রয়েছে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য। সে সব বৈশিষ্ট্য অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি বিশেষ পরবর্তী পর্যয়ে যাবার যোগ্যতা অর্জন করে।

**৩। বিকাশের বিভিন্ন দিকের (Aspet) রয়েছে বিভিন্ন গতি বা হার ঃ** জন্মের পর শিশুর সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই হারে বাড়ে না। নবজাতকের মাথাটি দেহের তুলনায় অনেক বড় থাকে কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় না। জন্মের পর প্রথম ২ বৎসর শিশুর দৈহিক বিকাশ দ্রুত হয় পরে গতি মন্থর হয়ে পড়ে। বয়ঃসন্ধিকালে আবার এ গতি বৃদ্ধি পায়।



www.pathagar.com

**৪। বিকাশের গতি সমগ্র থেকে বিশেষের দিকে অগ্রসর হয় ঃ** প্রথমে শিশুর আচরণের প্রকাশ থাকে সামগ্রিক। যেমন, শিশু যখন কাঁদে তখন তার সারা শরীরই তার সঙ্গে যুক্ত হয়" পরবর্তীকালে বড় হলে কাঁদতে শুধু চোখের ব্যবহার হয়। এরূপ প্রথমে যে কোন শব্দ শুণে ভয় পেত বড় হলে তেমন থাকে না, হয়ত শিয়ালের ডাক বা সাইরেনকে ভয় করে।

**৫। বিকাশের ধারায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিকে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ঃ** বিকাশের নিজস্ব ধারা আছে। বিশেষ বিশেষ সময়ে তার গতি দ্রুত হতে পারে শ্লথও হতে পারে। নিয়ম মাফিক চলে এ বিকাশ। কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে থাকে পার্থক্য। যেমন কেউ হাঁটতে শুরু করে দেরিতে কেউ বা যথাসময়ে।

**৬। বর্ধন ও বিকাশ পরিণমন ও শিখনের ওপর নির্ভরশীল ঃ** পরিণমন এক প্রকার অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি যার সঙ্গে সংগতি রেখে কিছু শেকাতে হয়। পরিণমন নির্ধারণ করে দেয় ব্যক্তি বিশেষ কতটুকু শিখন গ্রহণ করতে পারবে। পরিণমানের পূর্বে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের কোন সার্থকতা নেই।

**৭। বিকাশের ধারায় বিচ্ছিন্নতা আছে এবং তাদের মাঝে সমন্বয় আছে ঃ** যেমন, ধরুন অনালী গ্রন্থির কথা। প্রতিটি গ্রন্থি তার নিজ নিজ হরমেন তৈরি করে, তাদের কার্যাবলি সম্পন্ন করে আবার তাদের পরস্পরের মাঝে সমন্বয়ও আছে। আমাদের বুদ্ধি, মনোযোগ, আবেগ, প্রেষণা, স্মৃতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করে আবার একে অপরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।

**৮। বর্ধন ও বিকাশের কতগুলো গতি আছে ঃ**

বিকাশের গতি দু'প্রকার নীতি মেনে চলে। এগুলো হলো ঃ

. Cephalocaudal Principle

. Proximodistal Principle

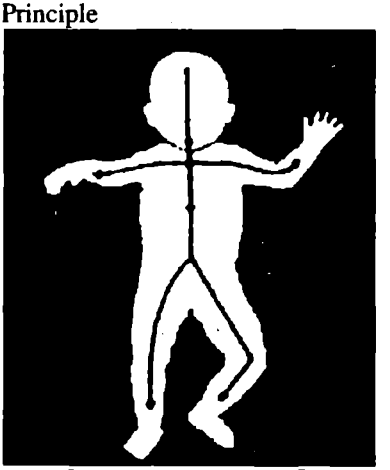

*চিত্র ১০ ঃ ১ বিকাশের গতি দু'প্রকার নীতি মেনে চলে*



www.pathagar.com

মাথা থেকে ধীরে ধীরে পায়ের দিকে বিকাশের গতিকে বলে Cephalocaudal Principle. উদাহরণ ঃ- প্রথমে শিশুর মাথা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে তারপর ধীরে ধীরে দেহ এবং সব শেষে প নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কাছ থেকে দূরের দিকে বিকাশের ধারার সঞ্চালনকে Proximodistal Principle বলে। প্রধান প্রধান অঙ্গের কার্যকলাপ দেহের কেন্দ্র হতে দেহের বাইরের দিকে অগ্রসর হয় যেমন শিশু প্রথমে চোখ, মাথা, ঘাড় এবং পরে বাহু, কনুই ও আঙ্গুল নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।

**৯। শিশুর জীবনের প্রথম দিকের বিকাশ পরবর্তী বিকাশের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ঃ** শিশুর জীবনের প্রথম দিরেক অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ তার পরবর্তী জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে। এটা জীবনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। গবেষণাঅয় দেখা গেছে যে ঃ শিশুর জীবনে প্রথম থেকে স্নেহ-ভালবাসা, নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলে সে সুসামঞ্জস্য আচরণ প্রদর্শন করে। তার বিকাশ সুষম ও সুস্থ হয়। বিপরীতে অস্বাভাবিক আচরণের প্রাধান্য দেখা দেয়। বড় বড় অপরধীদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে তাদের এ অপসংগতির মূলে রয়েছে শৈশবের অতৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা।

**১০। বিকাশের ধারায় কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ আছে ঃ** প্রতিটি সমাজে বিশেষ বয়সে কিছু আচরণ করতে হয়, দক্ষতা অর্জন করতে হয়। একে ক্রমবিকাশমূলক কাজ বলে। সুতরাং নির্ধারিত সে কাজগুলো সে বয়সে তার করা দরকার। এ সময়কেই আমরা সন্ধিক্ষণ বলছি।

. Maturation (পরিণমন বা পরিপক্কতা) ঃ পরিণমন বা পরিপক্কতা হচ্ছে ব্যক্তির অর্ন্তনিহিত বৈশিষ্ট্যের উন্মোচন (Maturation is the unfolding of the characteristics present in the person) জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির সুপ্ত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশকে পরিণমন বলা যেতে পারে। শিক্ষা ব্যতিরেকে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশই হচ্ছে পরিণমন। যেমন ঃ বসতে শেখা, দাঁড়াতে শেখা- ইত্যাদি। এজন্য কোন শিখন বা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় না। মনোবিজ্ঞনে এ গুলিকে Phylogenetic function বলা হয়। বিপরীত সাতার কাটা, সাইকেল চড়া ইত্যাদিতে শিখন বা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ গুলোকে বলা হয় Ontogenetic function।

*** পরিণমন ও শিখন ঃ**

পরিণমনের অগ্রগতির সঙ্গে শিশুর শিখনের অগ্রগতি হয়। পাঁচ বছর বয়সে পরিণমনের যে স্তরে সে লেখা শিখেছে ঐ সয়সে নিশ্চয়ই সে মটর গাড়ি চলাতে পারবে না। ১৮-২০ বৎসরে তার পক্ষে এটা সম্ভব। অতএব যে বয়সে যে কাজটি তার পরিণমনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সে কাজটি শেখানো উচিত।

শিশু কোন বয়সে পরিণমনের কোন স্তরে রয়েছে কিংবা কোন স্তরে কোন কাজটি কতটুকু করতে পারবে সেসব আমাদের জানা দরকার। আমরা যদি সেই



www.pathagar.com

পরিস্থিতি শনাক্ত করতে পারি তাহলে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য বুঝে শিখনের কাজে এগিয়ে নিতে পারবো। শিক্ষার্থী যদি পরিণমনের কোন স্তরে বিশেষ শিখন গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে তবে তাকে সার্থক ভাবে শেখানো অসম্ভব। এটা জানার জন্য মানোবিজ্ঞানীগণ ইঙ্গিত করেছেন তনিটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি, সেগুলো হলো ঃ

১। শিখন গ্রহণে শিক্ষার্থীর আগ্রহ (Interest in learning) ।

২। আগ্রহের স্থায়ীত্ব (Sustained interest)।

৩। উন্নতি (Improvement) বা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী দক্ষতা অর্জন করছে কিনা তা লক্ষ করা।

* ৬ থেকে ১১/১২ বৎসর বয়সকে বাল্যকাল বলা হয়। এ সময়ে ছেলে ও মেয়েদের বিকাশে পার্থক্য দেখা যায়। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে দ্রুত বাড়ে। পরবর্তীতে ছেলেরা মেয়েদেরকে ওজন ও উচ্চতায় অতিক্রম করে। এ সময় শৈশবের কোমলতা ও কমনীয়তা অনেক কমে আসে। ৭-৮ বৎসরে হাতের মাংশপেশী বৃদ্ধির ফলে হাতের আকৃতি দৃঢ় ও প্রশস্ত হয়। পায়ের বৃদ্ধি ও হাতের অনুরূপ হয়। এ সময় সারা দেহের অনুপাতে মাতার আকৃতি ছোট, মুখ গহ্বর ও চোয়াল বড় হওয়ায় মুখমন্ডলের আনুপাতিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। দেহ কাণ্ডের প্রশস্তাতা কর্মে ও দেহ লম্বাটে হয়।

এ বয়সে পেশী ও বৃহৎ পেশীর গঠন চলতে থাকে। পেশী সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এ সময় তারা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। দৌড়ানো, লাফানো, ডিগবাজী দেওয়া, গাছে চড়া, এক পায়ে লাফানো ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন করে। ৭-৮ বৎসর বয়সে ব্যাট ও বলের যোগাযোগ করতে পারে। ছবি আঁকা, কাগজ ও কাপড় কেটে জিনিসপত্র তৈরি করা, সেলাই করা। বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার ইত্যাদির কাজ করতে সক্ষম হয়।

* E. Hurlock ১২ থেকে ২১ বৎসর পর্যন্ত সময় কালকে কৈশোর কাল (Adolescence) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সময় দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি সাধন হয় এ সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়। যৌবন ও বাল্যকালের সন্ধিক্ষণ। এ সময় দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির বর্ধন ও বিকাশ ঘ'টে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। বয়ঃসন্ধিকালের শেষের দিকে উচ্চতা পূর্ণতায় পৌছায়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সতেজ ও সবল হয়, তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ছেলেদের গোঁফ দেখা দেয়। মেয়েদের স্তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুটৌল হয়। ছেলেমেয়েদের যৌন অঙ্গের বর্ধন ও বিকাশ ঘটে। যৌন গ্রন্থির পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। প্রারম্ভিক কৈশোর ছেলেমেয়েরা দৈহিক বিকাশের জন্য সংকোচ বোধ করে। যৌন বিকাশের ফলে বয়ঃসন্ধিকালের শেষে মেয়েরা পূর্ণঙ্গ নারী ও ছেলেরা পূর্ণাঙ্গ পুরুষে পরিণত হয়।



www.pathagar.com

# বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েদের চাহিদা

বয়ঃসন্ধিকালে বহুমুখী পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের সঙ্গে নতুনভাবে সংগতি বিধারেন নিমিত্তে নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। মনোবিজ্ঞানী Stanly Holing Worth বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণকৃত চাহিদাগুলো হলো ঃ

(১) আত্মপ্রকাশের চাহিদা ঃ যৌবনাগমকালে শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মপ্রকাশের চাহিদা তীব্রভাবে দেখা দেয়। তারা খেলা ধূলা, নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে বড়দের সামনে নিজকে জাহির করতে চায়। তারা কঠিন কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

(২) স্বাধীনতার চাহিদা ঃ তারা আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়। মেলেমেয়েদের তখনকার এ স্বাধীন আকাঙ্খা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির ফল।

(৩) যৌন চাহিদা ঃ যৌনতার বিকাশের ফলে তাদের মধ্যে যৌন চাহিদা দেখা দেয়। তাদের মাঝে বিপরীত নিঙ্গের প্রতি ব্যাপক আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে কাছে পেতে চায়।

(৪) সামাজিক চাহিদা ঃ এ স্তরে মানসিক ও আবেগিক বিকাশের ফলে গৃহ, পরিবার, সমাজ তথা পৃথিবী সম্পর্কে নানা ধরনের অনুভূতি এবং কৌতূহল জাগ্রত হয়। এটা তাদের সামাজিক চাহিদা। খেলার সাথী, সহপাঠির সঙ্গে দল গঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তারা এ চাহিদা পূরণ করে।

(৫) জ্ঞানের চাহিদা ঃ চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি প্রদান ও বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জগৎ সম্বান্ধে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং বহুবিধ প্রশ্ন তাদের মনে জাগে। এটাই তাদের জ্ঞানের চাহিদা। এ চাহিদা সঠিকভাবে পূরণের ওপর তাদের দক্ষতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি নির্ভর করে।

(৬) দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা ঃ তাদের জ্ঞানের চাহিদা ও কৌতূহলের বর্শবর্তীতে এবং অদম্য পেশী শক্তির বলে দুঃসাহসিক কাজ করে নিজেকে জাহির করতে চায় এমন কি ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও নেমে পড়ে। কৌতূহল ও আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করার জন্য দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা সৃষ্টি হয়।

(৭) জীবনাদর্শের চাহিদা ঃ এ বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে জীবনাদর্শের চাহিদা সৃষ্টি হয়। জীবন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তাদের মাঝে দানা বেঁধে ওঠে। আত্ম সত্তার বিকাশের সঙ্গে তারা জীবন দর্শন নিয়ে ভাবতে থাকে এবং সুন্দর জীবন বিকাশের দর্শন খুঁজতে থাকে।

(৮) নীতি বোধের চাহিদা ঃ তাদের মাঝে নীতিবোধ জাগ্রত হয়। ভাল মন্দ, উচিত অনুচিত ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তারা সচেতন হয়। অপকর্মের জন্য দুঃখ অনুভব করে, স্বীয়কর্মের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চায়।



www.pathagar.com

(৯) নিরাপত্তার চাহিদা ঃ এ বয়সের ছেলেমেয়েরা সামাজিক শাসন, রাজনৈতিক নিপীড়ন, বয়স্কদের অনুশাসন ইত্যাদি থেকে তারা নিরাপত্তা খোঁজে। তারা নিজেদের অবস্থান, দায়িত্ব কর্তব্য ও কর্মভয়ের আশংকা দূর করতে চায়।

(১০) পেশা বা বৃত্তির চাহিদা ঃ এ বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতে সক্ষম হয় বিধায় ববিষ্যত পেশা বা বৃত্তি নির্বাচন ও স্বাধীনভাবে উপার্জনক্ষম হয়ে সমাজে নিজকে সম্পৃক্ত করার জন্য পেশা বা বৃত্তির চাহিদা তীব্রবাবে অনুভব করে।

## বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাবলি ঃ

(১) দৈহিক পরিবর্তনজনিত সমস্যা।
(২) পেশীয় দক্ষতা জনিত সমস্যা।
(৩) হরমোনে কার্যকারিতা জনিত সমস্যা।
(৪) আবেগিক সমস্যা।
(৫) যৌন চাহিদা জনিত সমস্যা।
(৬) বীরত্ববোধের সমস্যা।
(৭) অপরাধ প্রবণতা।
(৮) নীতিবোধের সমস্যা।
(৯) স্বাধীনতার চাহিদা জনিত সমস্যা।
(১০) আত্মপ্রকাশের চাহিদাজনিত সমস্যা।
(১১) সামাজিক চাহিদাজনিত সমস্যা।
(১২) নিরাপত্তাজনিত সমস্যা।
(১৩) নতুন জ্ঞানের চাহিদা জনিত সমস্যা।
(১৪) বৃত্তি হীনতার সমস্যা।
(১৫) জীবনাদর্শজনিত সমস্যা।

## সমস্যা সমাধানের উপায় ঃ

(১) তদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।
(২) উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া।
(৩) সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে।
(৪) কাজ বন্টন ও দায়িত্ব প্রদান ক'রে।
(৫) ভাল কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কার দিয়ে।
(৬) তাদের চাহিদার পরিতৃপ্তি দিয়ে।
(৭) সুস্থ যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে।
(৮) নৈতিক শিক্ষার প্রবর্তন ক'রে।
(৯) বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবর্তন ক'রে।
(১০) সুন্দর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।



www.pathagar.com

# গ্রাম অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা

বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ। গ্রামের উন্নতিই দেশের উন্নতি। গ্রাম ভিত্তিক পরিকল্পনা ছাড়া গ্রাম উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের দেশের গ্রাম উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো গ্রাম উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাজের সমন্বয়ের অভাব। বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রাম উন্নয়নে বেশ কিছু সংখ্যক সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থা নিয়োজিত রয়েছে যেমন ঃ বিএডিসি, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ইত্যাদি। এত কিছুর পরও গ্রাম-গঞ্জের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে যেমন ঃ

১) গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যালয়ে ভৌত সুবিধার অভাব।
২) পয়ঃনিস্কাশন প্রণালীর ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়।
৩) গ্রামীণ মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বেশি।
৫) নিম্নমানের জীবন যাত্রা।
৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা।
৭) অপুষ্টি, প্রয়োজনে পরিমাণ মত খারাব না খাওয়া।
৮) শিক্ষার্থীদের তুলনায় শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা।
৯) উন্নত পাঠাগারের অভাব।
১০) প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব।
১১) নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের অভাব।
১২) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অপর্যাপ্ততা।
১৩) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য বস্তুগত ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার অভাব।
১৪) শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি আশানুরূপ না থাকায় পেশাগত মনোযোগ কম থাকে।
১৫) উচ্চমান সম্মত শিক্ষকের অভাব বিশেষ করে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়।
১৬) শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা কম যেমন ঃ- পড়ার টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি।
১৭) বিদ্যালয় থেকে বাড়ীর দূরত্ব বেশি হওয়ায় যাতায়াত বেশ কষ্টকর্
১৮) ক্লাসে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বেশি সময় হাতে কলমে শিখন (Activity based learning) কৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।
১৯) পিতা/অভিভাবকদের কাছ থেকে সহায়তা (Support) কম পাওয়া যায় যেহেতু তারা অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত।
২০) শ্রেণীকক্ষে এক ঘেয়েমী শিক্ষাদান পদ্ধতি।



www.pathagar.com

২১) গ্রামীণ জনগণের আর্থিক সুবিধা ভাল না থাকার জন্য একই বিষয়ের বিভিন্ন লেখকদের বই না কিনে একজন লেখকের বই কিনে থাকে এবং পড়ে থাকে।

২২) বিদ্যালয় এবং বাসস্থানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা না থাকা।

২৩) স্বল্প আয়ের লোকদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালানো অসুবিধা।

২৪) তাদের পক্ষে ঠিকমত ভর্তির টাকা এবং মাসিক বেতন দেয়া সম্ভব হয় না।

২৫) দূরবর্তী স্থানে স্কুলের অবস্থান।

২৬) লাইব্রেরী ও বিজ্ঞানাগার না থাকা।

**গ্রাম অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যার সমাধানের উপায় ঃ**

১। সকল বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার্

২। সুষ্ঠু পাঠদানের জন্যে প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করা। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা।

৩। পর্যাপ্ত বইপত্র সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধান।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

৫। শ্রেণী কক্ষের পাঠদানের মান উন্নয়ন।

৬। শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত কমাতে হবে। শ্রেণী কক্ষে সর্বোচ্চ অনুপাত হবে ১ ঃ ৪০।

৭। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

৮। গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার থেকে নির্দিষ্ট হারে অনুদান প্রদান করা দরকার।

৯। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদি ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১০। উন্নয়ন কাজের তদারকির জন্য প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক তথা ম্যানেজিং কমিটি ও গভনিং বডির সদস্যদের নিয়ে শক্তিশালী উন্নয়ন কমিটি গঠন করা।

১১। শিক্ষার্থীদের উপদেশ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বধান জোরদার করা।



www.pathagar.com

১২। স্কুলের আর্থিক সংকট নিরসনের জন্য সহজশর্তে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা।

১৩। শিক্ষকগণ শ্রেণী পাঠদানের ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় যেন গাফলতি না করেন এবং পরীক্ষার হলে কোন শিক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন না করে সেদিকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার।

১৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় উদ্যোগ ও সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৫। শিক্ষকদের শূণ্যপদে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ নিশ্চিত করা।

১৬। শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণ বহন করা।

১৭। রাস্তা ঘাট নির্মাণ করা।

১৮। গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৯। শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক জোরদারকরণ।

২০। যে এলাকায় বিদ্যালয় অবস্থিত সেই এলাকার জনগণকে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে সকল সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা সম্ভব হয় না তবে সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে এর সমাধান করা সম্ভব।

**শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ঃ**

পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর গ্রাম থেকে শহরে আগত মানুষের ক্রমাগত ভিড় নানাবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছে। স্থানাভাবে নবাগতদের আশ্রয় নিতে হচ্ছে, অপরিকল্পিতভাবে বেড়ে ওঠা শহরতলীতে অথবা বস্তিতে। এসব অঞ্চলে পরিবেশ নোংরা এবং আধুনিক জীবন যাত্রার উপকরণ প্রায় অনুপস্থিত অশিক্ষা ও দারিদ্র্য এই অধিবাসীদের নিত্য সঙ্গী। শহরে এসেও কাজের অভাব বেকারত্বকেই তাদের বরণ করে নিতে হয়। ফলে বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। যেখানে ওদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া করা বেশ কষ্টকর। শহর অঞ্চলে এই সমস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো হচ্ছে ঃ

১) বাসস্থান সমস্যা

২) নোংরা বস্তি জীবন

৩) পানীয় জলের সমস্যা

৪) জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত, ফলে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদূর্ভাব দেখা যায়

৫) শহরের পয়ঃপ্রণালী, হাট বাজার ইত্যাদি অনেক সময়ই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না।



www.pathagar.com

৬) জনগণের প্রয়োজন মোতাবেক যানবাহন অপর্যাপ্ত

৭) শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য লেখাপড়ার ব্যাপারে কোন উপ-বৃত্তির ব্যবস্থা নেই।

৮) মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসংস্থানের সাথে সংযুক্ত নয়, ফলে লেখাপড়া খরচ জোগাতে না পেরে ( হয়) ঝরে পড়ে। অন্য পেশায় চলে যায়।

৯) টিউশন ফি সময়মত দিতে পারে না।

১০) যাতায়াতের খরচ বেশি

১১) পরিবার থেকে লেখাপড়ার ব্যাপারে কোন সহযোগিতা পায় না কারণ অভিভাবক হয় অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত।

১২) শিখন সামগ্রী (বই, খাতা, কলম, পোষাক, পরিচ্ছদ) খরচ মিটানো কষ্টকর।

১৩) প্রাইভেট টিউশন ফি দেয়া সম্ভব হয় না।

১৪) অনুন্নত ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি থেকে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

১৫) টিউশন ও অন্যান্য খরচ বেশি থাকায় উন্নত মানের বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না।

১৬) অস্বাস্থ্যকর ও অপুষ্টিতে ভোগে বলে অনেক সময় মানসিক হীনমন্যতায় ভোগে।

১৭) সরকার প্রদত্ত স্বাস্থ্য ও সেবা থেকে অনেক সময় থাকে বঞ্চিত।

১৮) আর্থিক সামর্থ্য ভাল না থাকার জন্য বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে।

১৯) পরিমিত ও পুষ্টিকর খাবারের অভাব।

২০) পরিবারের অর্থ সংকটের জন্য অল্প বয়সে কাজের প্রতি আগ্রহী হয় এবং বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হয়।

২১) শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ সেখানে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেই। তাদের সমস্যাও সমাধানের কোন বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হয় না।

২২) শহরে নামী বা ভাল স্কুলগুলোতে ওরা ভর্তি হতে পারে না, আর্থিক অসুবিধার জন্য। কিন্তু নিম্ন আয়ের বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যালয়ের পরিমান অত্যন্ত কম থাকাতে ইচ্ছে থাকলেও ওরা পড়াশুনা করতে পারে না।

২৩) দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষার গুরুত্ব ভাল ভাবে বুঝতে পারে না। অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেয়ে কাজে পাঠানোকেই উত্তম মনে করে থাকে।



www.pathagar.com

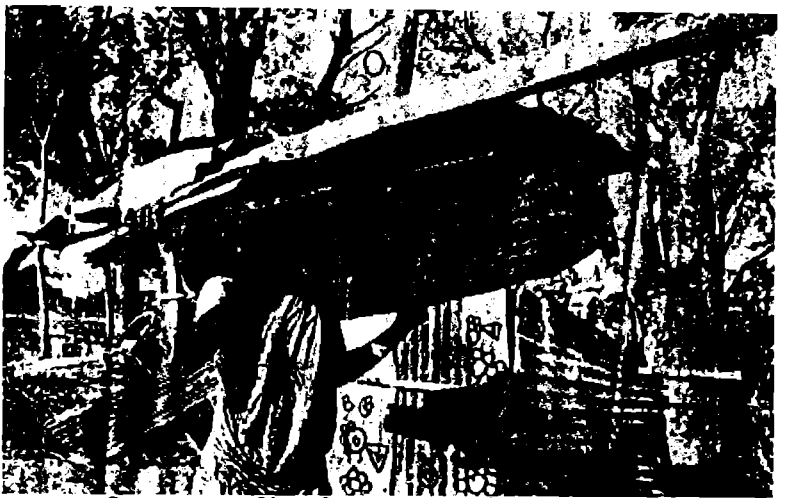

*চিত্রঃ ২১.১ ঃ ঘূর্ণিঝড় সিহরে ধ্বংস হয়েছিল তাঁর সবকিছু। বিপদ মোকাবিলা করে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা বরগুনা শহরের বড়িয়ালাপাড়া বস্তির এই নারীর।*

সূত্র ঃ প্রথম আলো, ২১/১১/০৮।

**৪ খ) শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা সমাধানের উপায় ঃ**

১) রাস্তা ঘাট, পয়ঃপ্রণালী, হাট বাজার ইত্যাদি উন্নয়ন সাধন করা দরকার্

২) ছিন্নমূল মানুষের জন্য শহরের বাইরে সুপরিকল্পিত আবাসস্থল নির্মাণ করা দরকার।

৩) বস্তিবসীদের স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য সহজ কিস্তিতে ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার।

৪) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সরকারি স্বাস্থ্য সার্ভিস সম্প্রসারিত করা।

৫) বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্নমূখী প্রকল্প গ্রহণ করা।

৬) শহরাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

৭) সর্ব সাধারণের জন্য সরকার বর্তমানে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বই পুস্তক সরবরাহ করে থাকেন। এই সরবরাহ বর্তমানে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত করা দরকার।

উপরোক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানবিকতাবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক ও দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে যোগ্যতার সংঙ্গে অংগ্রহণের লক্ষ্যে তৈরি করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন এবং কার্যকরভাবে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।



www.pathagar.com

# আবেগ (Emotion)

আমাদের মনের অনুভূতি আর তার দৈহিক প্রকাশ নিবিড় ভাবে জড়িত। আমরা আনন্দে উল্লাসিত হই, ভয়ে ভীত হই, রাগে উত্তেজিত হই, দুঃখে বিমর্ষ হই। এই যে আনন্দ, রাগ, ভয়, দুঃখ ইত্যাদি এগুলোই আবেগ। কোন কোন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়ার ফলে আমাদের দেহ মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া বা আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার ফলে কান্না, হাসি, দুঃখ, রাগ ইত্যাদি নানা ধরনের অভিজ্ঞতা অনুভব করি, আর প্রকাশ করি, এগুলোই আবেগ। উডওয়ার্থ ও মারকুইস বলেন "আবেগ হলো ব্যক্তির একটি আলোড়িত অবস্থা।"

আবেগ অনুভূতি সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিন্তু আবেগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক বহিঃপ্রকাশ। আবেগ মনের একটি বিচলিত অবস্থা। এটা "Stirred up state of agitation" ল্যাটিন Emover থেকে ইংরেজি Emotion শব্দ এসেছে যার অর্থ হলো প্রক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। তাই বলা যায় আবেগ হলো মনের সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশমান অবস্থা যা ব্যক্তিকে দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে বিচলিত করে। যখন কোন ব্যক্তি আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন সে দেহ মনে উত্তেজিত অবস্থায় থাকে তার স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। আবেগ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেগুলোকে সংজ্ঞা আকারে তুলে ধরা হলো ঃ-

১। "বস্তুর প্রত্যক্ষণ জীবে যে দৈহিক সংবেদন সৃষ্টি করে তাই হলো আবেগ।" –জেম্‌স

২। "আমাদের আচরণ ও চিন্তার মূলে রয়েছে কতগুলো সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির সাথে জড়িত রয়েছে একটি করে আবেগ।" –ম্যাগডুগাল

৩। "আবেগ হল একটি অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা যা শরীরকে উজ্জীবিত করে এবং অভিজ্ঞতা লাভকারীর নিকট যার অর্থ ও মূল্য রয়েছে।" –জন সি. রাচ (১৯৮৪)

**আবেগের বৈশিষ্ট্য ঃ**

প্রাণীর আবেগের কতগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অতি সহজেই প্রাণীর অন্যান্য মানসিক অবস্থা হতে আবেগকে পৃথক করে। এখানে আবেগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমূহ তুলে ধরা হলো ঃ

• আবেগ জাগানোর জন্য উদ্দীপক প্রয়োজন। পরিবেশিক উত্তেজনা ব্যক্তির মধ্যে অনেক আবেগ তৈরি করে। কোন ব্যক্তির অশোভন আচরণে আমরা রেগে যেতে পারি। তেমনি কষ্টকর কোন অভিজ্ঞতা স্মৃতিচারণ করে কাঁদতে পারি।



www.pathagar.com

• আবেগের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্কের জন্য অনুভূতি ও আবেগ দু'টো পৃথক হয়েছে। আবেগের সঙ্গে কম বেশি শারীরিক পরিবর্তন হবেই। যেমন ক্রন্দনের সময় চক্ষু দিয়ে পানি ঝরা।

• আবেগের স্থায়ীত্ব বেশী একটি মনের মাঝে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী থাকে। এটি জীবের মাঝে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় ও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। হঠাৎ আমরা রেগে যাইনা আবার হঠাৎ রাগ থেমে যায় না।

• আকাঙ্খার সঙ্গে আবেগ জড়িত। কোন প্রবল ইচ্ছা বা আকাঙ্খাকে জোর করে অবদমন করলে আবেগ সৃষ্টি হয়।

• অনেক সময় দৈহিক অবস্থা থেকে আবেগ সৃষ্টি হয়। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে আবেগের প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটে। যেমন বাল্য বয়সে যে কারণে হাউ মাউ করে ক্রন্দন করতে দেখা যায় সে একই কারণে বয়ঃজ্যেষ্ঠরা তেমন করে ক্রন্দন করে না।

• আবেগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি ব্যক্তির মানসিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করে থাকে। যেমন ঃ কোন ব্যক্তির যদি খুব মাথা ধরে তখন কেউ অতিরিক্ত কথা বললে খুব রাগ হয়।

• আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী জেম্‌স (James) এবং ডেনমার্কের ল্যাংগের মতে উদ্দীপকের উপস্থিতিতে দৈহিক পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে প্রক্ষোভের (আবেগ) অনুভূতি সৃষ্টি হয়। প্রক্রিয়াটি হচ্ছে ঃ-

উদ্দীপক → দৈহিক পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া → প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি।

**আবেগের শ্রেণী বিভাগ ঃ**

McDugall মানুষের আবেগতে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

(১) প্রাথমিক বা মৌলিক আবেগ (Primary Emotion) ঃ সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত আবেগগুলোকে মৌলিক আবেগ বলা হয়েছে। তার মতে মৌলিক আবেগ ১৪টি যথা ঃ ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি, স্নেহানুভূতি, কাম, বিস্ময়, হীনমন্যতা, আত্মগৌরব, একাকীত্ববোধ, স্বাধিকারবোধ, সৃজনী স্পৃহা, আমোদ, ক্ষুধা ও দুস্থভাব। সকল প্রবৃত্তি যেমন জন্মের সময় থাকে না, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায় তেমনি কিছু কিছু মৌলিক আবেগ ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়।

(২) জটিল আবেগ (Secondary or Complex Emotion) ঃ অনেক সময় দুই বা তার বেশী প্রবৃত্তি এক সঙ্গে জাগে ফলে দুই বা তার বেশি আবেগ একত্র হয়ে যে আবেগমূলক অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকেই ম্যাকডুগাল মিশ্র জটিল আবেগ বলেছেন।

যেমন ঃ কৃতজ্ঞতা হলো মমতা ও হীনমন্যতার মিশ্রণ।

ঘৃণা হলো ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়ের মিশ্রণ।



www.pathagar.com

(৩) অর্জিত আবেগ (Derived Emotion) ঃ প্রাথমিক ও মিশ্র আবেগ ব্যতিত ম্যাগডুগাল আর এক ধরনের আবেগের কথা বলেছেন যা হচ্ছে অর্জিত আবেগ, যেগুলোর সঙ্গে প্রবৃত্তি বা কর্ম প্রবণতার কোন মিল নেই।

যেমন ঃ বিবাদ, উল্লাস, আশা, আশংকা ইত্যাদি।

আবেগের সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে ঃ

এ গুলো দু'প্রকার ঃ (ক) বাহ্যিক পরিবর্তন ও (খ) অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

(ক) বাহ্যিক পরিবর্তন ঃ আবেগকালীন সময়ে আমাদের আচরণে অনেক পরিবর্তন ঘটে, এগুলোকে আবেগকালীন আচরণ বলা যেতে পারে। সাধারণত ঃ আবেগের সময় বাহ্যিক আচরণের যে সব পরিবর্তন আসে সেগুলো হলো ঃ

• মুখ ভঙ্গির পরিবর্তন ঃ মনের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব ও ভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের মানসিক অবস্থা মুখে প্রতিফলিত হয়। আবেগরে সময় ঠোঁট নাক কপাল ও চিবুকের বিভিন্ন পেশীতে পরিবর্তন হয়।

• অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের পরিবর্তন ঃ আবেগের সময় বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া সাধারণ নিয়মে হয় না। রাগের সময় আমরা জোহে হাত পা নাড়াচাড়া করি। যখন দুঃখ পাই তখন চুপচাপ বসে থাকি।

• গলার স্বরের পরিবর্তন ঃ ভয়, আনন্দ, বিস্ময় ইত্যাদি আবেগে বিভিন্ন রকম ধ্বনি হয়, গলার স্বরে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়। গলার স্বর শুনে হাসছে না কাঁদছে, বিস্মিত না আনন্দিত না দুঃখিত হয়েছে তা সাধারণভাবেই বোঝা যায়।

• চোখের তারার পরিবর্তন ঃ আবেগের সঙ্গে চোখের সম্পর্ক নিবিড়। আবেগের সাথে সাথে চোখের তারা কখনও বড় কখনও ছোট হয়। যেমনে ঃ- বিস্ময়ে আমাদের চোখ বড় হয়ে যায়।

• শ্বাস প্রশ্বাসের পরিবর্তন ঃ আবেগের সময় শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায়।

• চেহারার পরিবর্তন ঃ যেমন ঃ- যখন হাসি দেয় তখন মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ধারণ করে ইত্যাদি।

(খ) অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনঃ আবেগকালীন সময়ে দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরেও অনেক পরিবর্তন হয়। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন গুলো নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ-

• হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বৃদ্ধি ঃ সুস্থ অবস্থায় যে হৃদস্পন্দন মিনিটে ৮৪ বার, বিশেষ আবেগের সময়ে তা বেড়ে মিনিটে ১০৪ বারে দাঁড়াতে পারে।

• রক্তচাপের পরিবর্তন ঃ হৃদস্পন্দন বাড়ার সঙ্গে ব্যক্তির রক্তের চাপও বেড়ে যায়। যেমন অত্যধিক ক্রোধে রক্তের চাপ বেড়ে যায়।

• নাড়ীর স্পন্দন পরিবর্তন ঃ নাড়ীর গতির হারেও পরিবর্তন আসে। ভয়ে কারো নাড়ীর গতি খুব দ্রুত হয় আবার অনেক সময় নাড়ীর বেগ কমে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।



www.pathagar.com

• ত্বকের রাসায়নিক তড়িৎ প্রবাহের গতি ঃ মানুষের ত্বকে তড়িৎ পরিবাহী ক্ষমতা আছে। আবেগের সময় এ ক্ষমতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষমতাকে বলা হয় Galvanic Skin Response বা Reflex (G.S.R.) Lie Detector নির্ণয়ের জন্য রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী লুরিয়া একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করেন যাকে মিথ্যা নির্ণয়ক যন্ত্র বা Lie Detector বলা হয়। এর সাহায্যে উন্নত বিশ্বে অপরাধীদের মিথ্যা জবাব নির্ণয় করা হয়ে থাকে। পুরুষের চাইতে মহিলারা বেশি আবেগ প্রবণ বলে পুরুষের তুলনায় মহিলাদে G.S.R. অনেকে বেশি হয়।

• মস্তিস্ক তরঙ্গের পরিবর্তন ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় একজন সুস্থ মানুষের মস্তিস্কের আলফা তরঙ্গের আবর্তন হয়।

প্রতি সেকেন্ডে ৮-১২ বার। কিন্তু তীব্র আবেগের সময় প্রতি সেকেন্ডে মস্তিস্কের তরঙ্গের আবর্তন হয় ১২ বারের অনেক বেশি। যেমন ঃ- ভয়ে কাপতে থাকা।

**ব্যক্তি জীবনে আবেগের ভূমিকা ঃ**

মানব জীবনে আবেগের প্রভাব অসমান্য। যদিও মনে করা হয় মানুষ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মানব জীবনে যুক্তির চেয়ে আবেগের ভূমিকাই প্রধান। পৃথিবীর বড় বড় ঘটনা দূর্ঘটনা যেমন ট্রয়ের যুদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া, বাবরী মসজিদ ধ্বংস ইত্যাদির পিছনে যুক্তির চেয়ে আবেগের ভূমিকাই প্রধান ছিল। মনোবিদ রস বলেন "দুটো বিশ্ব যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে আমাদের সকলের উপলব্ধি করা উচিত প্রক্ষোভ মানুষের জীবনে কী ধরনের ক্ষতি করতে পার।" আবেগ ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, এবং যেকোন আবেগ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শিশু থেকে শুরু করে সকল বয়সী ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কেননা তীব্র আবেগের ব্যক্তি তার বিচার বিবেচনা, বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে না। নিজের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আবেগের ফলে মানসিক অস্তিরতা থেকে মানসিক দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। অতএব আবেগের সুষ্ঠু বিকাশ অত্যন্ত জরুরি।



www.pathagar.com

# আবেগিক বিকাশ

**ভূমিকা ঃ**

শিশু যত বড় হতে থাকে তার মানসিক আবেগিক অভিব্যক্তির মধ্যে নানা বৈচিত্র ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শিশুর কাজে বাঁধা দিলে, তাকে বকা দিলে, তার খেলনা কেড়ে নিলে বা শিশু যা চায় তা না পেলে শিশু রেগে চিৎকার করে কাঁদে, মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় ও হাত পা ছোড়াছুড়ি করে। ৭/৮ বছর বয়সে সে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে আর আবেগিক বিকাশ যাতে স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে সেদিকে পিতামাতা ও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা দরকার। শিশু অনেক সময় ভয়, লজ্জ, নিন্দা ও সমালোচনার বয়ে আবেগকে প্রকাশ না করে জোর করে দমিয়ে রাখে। আবেগকে জোর করে দমিয়ে রাখা সমীচীন নয় এতে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মনের একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক। জন্মের পর থেকে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আবেগীয় অবস্থা ও আচরণের পরিবর্তণ হতে দেখা যায়। এক এক বয়সের আবেগের বৈশিষ্ট্য এক এক রকম। একই উদ্দীপকের প্রতি এক এক সয়সে অর্থাৎ শিশু, বালক, কিশোর ভিন্ন ভিন্ন রকম আচরণ প্রদর্শন করে। তার আবেগের এই যে পরিবর্তন এটাকেই আবেগের বিকাশ বলা হয়। আমরা বলতে পারি ঃ

"যে প্রক্রিয়ায় শিশুর আবেগের উদ্দীপক ও আবেগিক ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় আবেগিক বিকাশ।" বয়স, অভিজ্ঞতা, পরিণমন ও শিক্ষা আবেগিক বিকাশকে প্রভাবিত করে।

- জীবনের যে কোন স্তরে আবেগিক বিকাশের পিছনে তিনটি কারণ ঃ
- চাহিদার তৃপ্তি ঃ যেমন চাকুরি জন্য সাক্ষাৎকার দিয়ে আসার পর নিয়োগ পত্রটি পেয়ে আনন্দ উচ্ছাস।
- চাহিদার অতৃপ্তি ঃ যেমন মেডিকেল কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বিমর্ষ হওয়া বা ক্রন্দন করা।
- নিরাপত্তার অভাব ঃ যেমন পছন্দের মোবাইল সেটটি চুরি হয়ে যাওয়ায় দুঃখ পাওয়া। শৈশব থেকে এ তিনটি করণে ব্যক্তির মধ্যে আবেগের বিকাশ ও প্রকাশ হতে দেখা যায়। বিভিন্ন মৌলিক ও মিশ্র জটিল আবেগের বিকাশ বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হতে থাকে।

**শৈশবকাল ঃ**

প্রতিটি শিশু জন্মের সময়ে তৃপ্তিদায়ক ও অতৃপ্তিকর এ দু'টি অনুভুতিমূলক আবেগিক উপাদান নিয়ে আসে। যে পরিবেশে সে অবস্থান করে তার কিছু তাকে



www.pathagar.com

আনন্দ আর ব্যক্তিগত তৃপ্তি দান করে, কিছু তাকে অসুখী করে। আবেগ ব্যক্তির এমন এক অবস্থা যা তার আচরণকে প্রভাবিত করে। শিশুর আবেগ সব সময়ই কোন না কোন দৈহিক আচরণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেমন, খুশীতে হাসা। এ ধরনের আচরণ মানুষের সব বয়সে একই রকম থাকে না। তাছাড়া যে সব উদ্দীপক প্রাথমিক অবস্থায় শিশুর মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করে সময়ের সাথে সে সব উদ্দীপকের প্রভাবের পরিবর্তন ঘটে। যেমন শিশুরা বিড়াল দেখে ভয় পায় কিন্তু বড় হলে সে ভয় থাকে না। বয়সের সাথে আবেগজনিত আচরণের পরিবর্তন হয়।

জন্মের সময় শিশুর মধ্যে চার ধরনের আবেগিক ক্রিয়ার ক্ষমতা দেখা যায় ভয়, রাগ ভালসাবা ও ঘৃণা। শিশুদের আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া বড়দের মত নয়।

**শিশুর বৈশিষ্ট্য ঃ**

- শিশুর আবেগ খুব তীব্র
- শিশুর আবেগের স্থায়ীত্ব কম
- শিশুর আবেগমূলক আচরণ পরিবর্তনশীল
- শিশুর প্রতিক্রিয়ার বিকাশে সামগ্রিক থেকে বিশেষ আবেগে সূচিত হয়
- শিশুর আবেগের মাত্রায় পরিবর্তন হয়
- শিশুর আবেগের প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্নতা আছে
- শিশুর আবেগিক প্রতিক্রিয়া শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাপেক্ষ

দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সাথে সাথে আবেগিক ক্রমবিকাশ ঘটে। আবেগের বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন হয়। শিশুর প্রাথমিক আবেগিক আচরণ তার মা যিনি তাকে সারাক্ষণ দেখাশোনা করেন তাকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করে থাকে। কারো মতে শিশুর প্রথম নির্দিষ্ট আবেগিক আচরণ হলো পরিচিত মানুষের মুখ দেখে হাসা। পরে এই নিরব হাসি উচ্চ হাসির রূপ প্রহণ করে। মানোবিজ্ঞানী ক্যাথরিন ব্রিজেসের মতে আবেগের ক্রমোবিকাশ ঃ

| জন্ম কাল | সাধারণ উত্তেজনা | |
|---|---|---|
| ৩ মাস | অস্বাচ্ছন্দ | আনন্দ |
| ৪ মাস | রাগ | |
| ৫ মাস | বিরক্তি | |
| ৬ মাস | ভয় | হর্ষ |
| ৯ মাস | | বড়দের প্রতি ভালবাসা |
| ১২ মাস | | |
| ১৫ মাস | হিংসা | ছোটদের প্রতি ভালবাসা |
| ১৮ মাস | | |
| ২১ মাস | | উল্লাস |



www.pathagar.com

দু'বছর পর শিশুর আবেগ পরিবারকে ছাড়িয়ে বিস্তৃত পরিবেশে জড়িয়ে পড়ে। সঙ্গী সাথীদের প্রতি ভালবাসা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া লজ্জা, ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদিও বিকাশ ঘটে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আবেগ প্রকাশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। শিশু যত পরিবর্ত হয় তত তার বাহ্যিক প্রকাশের তীব্রতা কমে এবং আচরণ সংযত ও মার্জত হয়ে ওঠে। যেমন ঃ ৪/৫ বয়সে রেগে গেলে চিৎকার দিয়ে কাঁদে, হাত পা ছুড়ে, ৭/৮ বছর সয়সে তেমন করে না।

**বাল্যকাল ঃ**

এ বয়সে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করে। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের আনন্দ ধরনের আবেগ বেশী দেখা যায় । এ বয়সের ছেলেমেয়েরা চিন্া ভাবনা মুক্ত হয এবং তাদের মধ্যে আনন্দ, উল্লাস, হাসি খুশীভাব বেশী পরিমাণ দেখা যায়। আশংকা, রাগ, ভয় ইত্যাদি আবেগও থাকে। শিশুসুলভভয়ের পরিবর্তে তাদের মধ্যে বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষিতে ভয়ের ভাব দেখা যায়। এ বয়সে বাবা মার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় ছোট ভাই বোনদের প্রতি ঈর্ষা সৃষ্টি হয়। আবার বাবা মার শাসনের ফলে ভুল বোঝাবুঝি হয় এবং বিরূপ আবেগ সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

**বয়ংসন্ধিকালের আবেগ ঃ**

বয়ংবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মৌলিক ও মিশ্র জটিল আবেগের বিকাম হতে থাকে। বয়ংসন্ধিকালে রাগ, ভয়, দুচিন্তা, স্নেহ, ভালবাসা, ঘৃনা, ঈর্ষা ইত্যাদি আবেগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়ে এসব আবেগ প্রকাশে তীব্রতা দেখা যায়। আবেগ মূলক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ বয়সের ছেলেমেয়েরা অন্য স্তরের ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী পার্থক্য দেখায়। এ বয়সে সব আবেগের বিকাশ হয়। আবেগি আচরণের প্রকাশ কোন কোন সময় খুব বেশি হয়। আবার কোন কোন সময় একদম থাকে না। যেমন : কোন সময় আনন্দ খুব তীব্র ভাবে প্রকাশ করে; আবার এমন বিমর্ষ হয়, সে যে কোন সময়ে আনন্দিত হয়েছিল তা কল্পনা করা যায় না।

এ বয়সে নিম্নরূপ বিষয় গুলো প্রকাশ পায় ঃ

১. বন্ধুত্ব
২. রাগ
৩. ভয়
৪. আশংকা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব
৫. বিমূর্ত ধারণাকেন্দ্রীক আচরণ
৬. অন্তর্মুখিতা ও আত্মকেন্দ্রীকতা
৭. আদর্শ গঠন



www.pathagar.com

৮. দুচিন্তা
৯. প্রতিক্রিয়া তীব্রতা
১০. যৌন আবেগ
১১. আবেগের অবদমন ও
১২. আনন্দ

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও যৌন অঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মধ্যে মানসিক চাঞ্চল্য বা মানসিক ধৈর্যের অভাব দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে ও বাইরে বন্ধুত্বের জন্য অস্থির হয়ে ওটে। ছেলেরা ছেলে বন্ধু ও মেয়েরা মেয়ে বন্ধু পছন্দ করে। বিশেষ একজনকে নয় দলকেই বেশি পছন্দ করে। বন্ধুদের কাছে মনের কথা বলার মধ্যে আছে নিজের মানসিক উদ্বেগ, অস্বস্থি ও সংঘাতের হাত থেকে অব্যাহতি। দ্রুত শারীরিক পরিবর্তন ও চাহিদার চাপে বয়ঃসন্ধিকালে সংশয়ের সঙ্গে অপরাধী মনোভাব দেখা দেয়। লজ্জাভাব , ভয়, অপরাধবোধ ইত্যাদি আবেগ যৌন আচরণের সঙ্গে নতুন রূপ নেয়। হীনমন্যতার অনুভূতি , কোন কোন সময়ে আক্রমনাত্বক ভাব, কোন সময় মনমরা ভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। এ বয়সে বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা জন্মে বলে বিমূর্ত ধারনাকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে। নৈতিক সেন্টিমেন্টের বিকাশও এ স্তরে হয়। এ বয়সে দেহের আকস্মিক পরিবর্তন, যৌন পরিণতি ও মানসিক ক্ষমতার পূর্ণতা লাভ এ সব মিলে কৈশোরে একটি বিপ্লব ঘটে যায়। শৈশবে ও বাল্যের সুপ্রতিষ্ঠিত আবেগের সংগঠনটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। নিজের বহুমুখী পূর্ণতা উপলব্দি করে বিপূল আনন্দ পায় আবার তার সামর্থ ও প্রয়োজনের প্রতি সমাজের অবহেলা ও উদাসীনতা তাদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফলে অর্ন্তমূখী (Introvert) বা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে এবং অনমনীয়তা, সংকীণতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। এ বয়সটি আদর্শ গঠনের সময়। এখন তারা ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূণ্য, সুনীতি-দূর্নীতি, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করে এবং সঠিক উত্তর পাওয়ার চেষ্টায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এ বয়সে শৃঙ্খলবোধ ও আদর্শের সংঘাত দেখা দেয়।

**লজ্জা, উদ্বেগ (Worry), উৎকণ্ঠা (Anxiety) ঃ**

এগুলো এক ধরণের ভয়েরই বহিঃপ্রকাশ। বাল্যকালে এ সব ভয়ের সূত্রপাত হয়। কাল্পনিক ভয় থেকে উদ্বেগের (Worry) সৃষ্টি হয়। মানসিক বিকাশের সাথে সাথে শিশু মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। স্কুলের কোন সমস্যা, পরিবারের কোন পরিস্থিতিনিয়েও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। উদ্বেগের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ দেখা দেয়।- পলায়নপরতা, ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া, মুখমন্ডল বিবর্ণ হওয়া, ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।



www.pathagar.com

উদ্বেগ যখন অনেক বেশি ও তীব্র হতে থাকে তখন উৎকণ্ঠায় (Anxiety) পরিণত হয়। মানসিক ভয় বা মনের বেদনাদায়ক দুশ্চিন্তা থেকেও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। সমবয়সীরা যে সব শিশুদের গ্রহণ করে না, এরূপ প্রত্যাখ্যাত শিশুদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বেশি দেখা দেয়। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা উৎকণ্ঠায় বেশি ভোগে। দিবা স্বপ্ন, দুৎস্বপ্ন, অসুস্থতা, অতি আক্রমনাত্ব ব্যবহার, বিদ্রোহী ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। লাজুকতা সামাজিক ভয় থেকে সৃষ্টি হয়। এ সময় শিশুরা চুপ করে থাকে। হাতে কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া করে বা দাঁত দিয়ে নখ কাটে।

**মানব/ব্যক্তি জীবনে আবেগের ভূমিকা ঃ**

মানব জীবনে আবেগের প্রভাব অসামান্য। যদিও মনে করা হয় মানুষ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মানব জীবনে যুক্তির চেয়ে আবেগের ভূমিকাই প্রধান। পৃথিবীর বড় বড় ঘটনা দূর্ঘটনা যেমন ট্রয়ের যুদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া, বাবরী মসজিদ ধ্বংস, পাকিস্তান-ভারতের পারমানবিক বিস্ফোরণ, মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধ ইত্যাদি অনাকাঙ্খিত ঘটনার পিছনে যুক্তির চেয়ে আবেগের ভূমিকাই প্রধান ছিল। মনোবিদ রস বলেন, "দুটো বিশ্ব যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে আমাদের সকলের উপলব্ধি করা উচিত প্রত্যেক মানুষের জীবনে কী ধরনের ক্ষতি করতে পারে।" আবেগ ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, এবং যে কোন এবগ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শিশু থেকে শুরু করে সকল বয়সী ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কেননা তীব্র আবেগের ব্যক্তি তার বিচার বিবেচনা, বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে না। নিজের ওপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আবেগের ফলে মানসিক অস্থিরতা থেকে মানসিক দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি দৃষ্টি হয়।

আবেগ মানুষকে কর্মচঞ্চল করে তুলে, সৃষ্টিধর্মী সমস্ত কাজের পিছনেও আবেগ, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়, সম্পর্ক স্থাপন, ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি, পরোপকার করা, একে অপরের প্রতি সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি যাবতীয় কল্যাণকামী ক্রিয়াকর্ম ও আচরণের ক্ষেত্রেও আবেগের ভূমিকা বিদ্যমান।

**আবেগ নিয়ন্ত্রণ ঃ**

মানব জীবনে আবেগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবেগ ব্যক্তিকে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করায়। আবেগীক সমতা ব্যক্তির গঠনমূলক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করে, ব্যক্তির জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুস্থিতি বজায় রাখে। আবেগের অভিব্যক্তি এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। কেউ সামান্য কারণে রেগে যায়, কেউ রাগ সৃষ্টিকারী উদ্দীপকের উপস্থিতিতেও নির্বিকার, শান্ত ও স্বাভাবিক থাকে। কেউ সামান্য



www.pathagar.com

কারণে ভীত ও উত্তেজিত হয়। আবেগের যথাযথ সুষ্ঠু বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে তথা জাতীয় জীবনে সুখ-শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে।

সুন্দর সামাজিক জীবন যাপনের জন্য এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি বজায় রাখার জন্য আবেগীক নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। সামান্য কারণে কেউ রেগে ওঠে, কেউ সাধারণ সমস্যায় দিশেহারা হয়, কেউ সামান্য অসুখ বিসুখে চঞ্চল ও অস্তির হয়ে ওঠে। এদের আবেগীক অস্থিরতা গৃহের ও পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে। আবার এমন অনেকে আছেন যারা ধীরস্থির অচঞ্চল, নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। নিম্নে আবেগ নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি উপায় তুলে ধরা হলো ঃ

১. পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বড় ব্যক্তিত্ব, বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক এবং মহাপুরুষদের জীবনী পর্যালোচনা করে দেখা গেছে তাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের মূলে রয়েছে আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। আসলে আত্মশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ বলতে আবেগীক নিয়ন্ত্রণকেই বোঝায়। আত্মসংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২. প্রাচীনকাল হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও মনীষীর অভিমত হলো পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, ভালবাসা, সৌন্দর্য্যবোধ এবং নৈতিক ও ধর্মীয় মাধ্যমেই সামাজিক জীবনে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. শিক্ষামনীষীদের মতে শিশুদের মাঝে সহমর্মিতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে অতিরঞ্জিত আবেগ দমন করা যায়।

৪. শিক্ষার্থীর তীব্র আবেগকে উপেক্ষা না করে তার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে নিয়ন্ত্রিত আবেগের সুফল বুঝিয়ে দিয়ে সঠিকভাবে আবেগ নিয়ন্ত্রণের কৌশল অনুশীলন করাতে হবে।

৫. শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কচিমনের শিক্ষার্থীদের অপ্রত্যাশিত আবেগ দমন করা যায়।

প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মনোবিদ, চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদরা জীবনের বিকাশ ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে আবেগিক নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জীবনের বিকাশ ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে আবেগিক নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জীবনের সাথে আবেগ ওৎপ্রতভাবে জড়িত। শিক্ষার্থীর তীব্র আবেগকে উপেক্ষা না করে আবেগ প্রশমিত হওয়ার পর শিক্ষক আবেগের ক্ষতিকর দিকগুলো ধীরস্থির ভাবে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরবেন এবং নিয়ন্ত্রিত আবেগের সুফলগুলোও আলোচনা করবেন। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে যেমন ঃ সাহিত্য চর্চা, সঙ্গীত চর্চা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, নাট্যাভিনয়, অঙ্কন, খেলাধূলা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে। সামাজিকতা, সমাজে মেলামেশা ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এসব কর্মকান্ডে



www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ও আবেগমূলক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে।

**শিক্ষা ও আবেগ ঃ**

আবেগ মানব জীবনে এক প্রয়োজনীয় দিক। আবেগ কাজের পেছনে শক্তি জোগায়। মানব আচরণের ধরন ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে আবেগের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষায় অগ্রগতি, তার মানসিক সংগঠন, তার ব্যক্তিত্ব সব কিছু নির্ভর করে তার আবেগিক বিকাশের ওপর। সুষম আবেগিক বিকাশ সুষম ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে।

আনন্দ, কৌতূহল, বিস্ময় যে কোন ব্যক্তিকে নিত্য নতুন জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে থাকে। অজানাকে জানার কৌতূহল ও বিস্ময় মানব সভ্যতাকে এই স্তরে উন্নীত করেছে। সমুদ্র তলদেশের বৈচিত্র নিরীক্ষণ, মহাশূন্যে তারকা লোকের রহস্য উদ্ঘাটন, পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ, শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে বিচরণ করেও মানুষের কৌতূহলের অবসান ঘটেনি। নিত্য নতুন কৌতূহল ও বিস্ময় তাকে নতুন তথ্য ও জ্ঞান আহরণে কর্মচঞ্চল করে তোলে।

শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টিতে শিখন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করবে। শিক্ষককে এ দিকে নজর রাখতে হবে। আবার অন্যান্য আবেগ ও তার সুষম বিকাশ এবং নিয়ন্ত্রণে দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের আবেগ সমূহ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণের প্রতি শিক্ষক ও অভিভাবককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সত্য, সুন্দর ও মহৎ কাজের প্রতি আকর্ষণবোধ, অসত্য, অন্যায় ও অসামাজিক কাজের প্রতি ঘৃণাবোধ, প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতাবোধ যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে

A.T. Jersild এর মতে শিক্ষার্থীদের আবেগমূলক জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষকের কর্তব্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত করা এবং পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিবিধান করে চলতে সাহায্য করা। রাগ, ভয়, শোক-দুঃখে শিশু যখন আচ্ছন্ন থাকে তখন সে কোন কিছুতেই মনসংযোগ করতে পারে না। শিখবার মত মানসিক অবস্থা তার থাকে না তাই জোর করে কোন কিছু শিখালও শেখাটা স্থায়ী হয় না।

সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরা গণিত ও ইংরেজি এ দু'টি বিষয়ে ভয় পায়, পরীক্ষাকে এবং নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে ভয় পায়। এই ভয় শিক্ষার্থীর কর্মশক্তিকে হ্রাস করে এবং আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরায় । ৪-৫ বছর বয়সে শিশুরা স্কুলে যেতে শুরু করে। এই বয়সে মায়ের আকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হলে



www.pathagar.com

নিরাপত্তার অভাববোধ তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। ফলে তারা তাদের সহপাঠিদের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা করতে পারে না এবং পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে না।

এই অহেতুক ভয় দূর করার জন্য শিক্ষককে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ বিষয়ের দূর্বলতা দূর করার জন্য তাদের ভুল ত্রুটিকে দেখিয়ে দিতে হবে এবং ভুল সংশোধনের জন্য বার বার অনুশীলন করাতে হবে। বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়ে দায়িত্ব সম্পাদনে তাদের সহায়তা করতে হবে। সমাপ্ত কাজের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করতে হবে। বার বার পরীক্ষা নিয়ে তাদের পরীক্ষা নিয়ে তাদের পরীক্ষা ভীতি দূর করতে হবে।

আত্ম বিশ্বাসের অভাব, প্রতিকূল পরিবেশ, স্নেহ-ভালবাসার অভাব, নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতি শিশু-কিশোরদের মনে ভয় সৃষ্টি করতে থাকে। বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রয়োজনে সহযোগিতা করে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে ভয়, রাগ, সুখ. দুঃখ বিভিন্ন আবেগরে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজের ভয়, মানসম্মানের ভয়, মৃত্যু ভয়, আল্লার ভয় প্রভৃতি ব্যক্তিকে অন্যায় ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করে।

ভয়, রাগ, ঘৃণা, উদ্বেগ, সুখ, দুঃখ, ভালবাসা প্রভৃতি আবেগের যথাযথ প্রকাশকে উৎসাহিত করতে হবে এবং এগুলির অসংযত প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিরষ্কার, উপহাস বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে আবেগকে দূর করা যায় না একথা পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে স্মরণ রাখতে হবে।

পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে ও দৃষ্টি রাখতে হবে ঃ

১। আবেগের সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রকাশের মাধ্যমেই শিশুর জীবন ও তার স্বভাব চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। তাই অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাঁদের সুষ্ঠু ও যথাযথ আবেগিক বিকাশ ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে আদর্শ স্থাপন করতে হবে।

২। সত্য, সুন্দর ও মহৎ কাজের প্রতি আকর্ষণবোধ সৃষ্টিক এবং অসত্য, অন্যায় ও অসামাজিক কাজের প্রতি ঘৃণা বোধ, প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতাবোধ যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে।

৩। যে কোন সমালোচনাকে সহজভাবে গ্রহণ ও সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

৪। নিজের ক্ষমতা অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে এবং অপরকে তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা দিতে হবে।



www.pathagar.com

৫। নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রেক্ষিতে আকঙ্খার স্তর নির্ণয় করতে হবে।

৬। প্রত্যেক মানুষের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এই সত্যকে স্বীকার করে সফলতা, বিফলতা বা জয়-পরাজয়কে সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে।

৭। ভুল-ত্রুটিকে কেউ দেখিয়ে দিলে সেগুলি সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

৮। ব্যর্থতা, হতাশা, নৈরাজ্য প্রভৃতিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হবে। আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়তা করতে হক্ষ।

৯। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধান করে চলার জন্য সাহায্য করতে হবে, পরামর্শ দিতে হবে।

১০। আনন্দ, কৌতূহল, বিস্ময় প্রভৃতি আবেগ সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের ও সন্তান-সন্ততিদের সহযোগিতা করতে হবে।

১১। শিক্ষার্থীদের হানিকর ও ক্ষতিকর আবেগগুলো সংযতভাবে প্রকাশের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১২। ব্যক্তি জীবন বিকাশের জন্য উপকারী আবেগগুলোর চর্চার দিকে নজর দিতে হবে।

১৩। সামাজিক সুশৃঙ্খল রীতিনীতিকে সঠিকভাবে মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

১৪। অহেতুক ভয় হতে নিজকে দূরে রাখার অভ্যাস গঠন করতে হবে।

১৫। সুস্থ স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষমতা অর্জন করতে শিক্ষা দিতে হবে।

১৬। শিক্ষার্থীদের নিজের ভুল নিজে সংশোধন করার যথার্থ যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা যাতে করে শিক্ষার্থী ব্যক্তি জীবনে অসংযত রাগ ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ হতে দূরে থাকতে পারে।

১৭। সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের অনাকাঙ্খিত আবেগ দমন করে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর চেষ্ট করতে হবে।

আনন্দ, কৌতূহল, বিস্ময় প্রভৃতি আবেগ যে কোন ব্যক্তিকে নিত্য নতুন জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে থাকে। অজানাকে জানার কৌতূহল ও বিস্ময়ই মানব সভ্যতাকে এই স্তরে উন্নিত করেছে। সমুদ্র তলের বৈচিত্র নিরীক্ষণ, মহাশূণ্যে তারকালোকের রহস্য উদ্ঘাটন, পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ, শ্বাপদসঙ্কু গভীর অরণ্যে বিচরণ করেও মানুষের কৌতূহলের অবসান ঘটেনি। নিত্য নতুন কৌতূহল ও বিস্ময় তাকে নতুন নতুন তথ্য ও জ্ঞান অন্বেষণে কর্মচঞ্চল করে তোলে। পিতামাতা ও শিক্ষক, ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও কৌতূহল সৃষ্টিতে সহায়তা করবেন। শিশু-কিশোরের আবেগ যাতে মাত্রা ছড়িয়ে না যায় সেদিকে সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার।



www.pathagar.com

# স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য

জন্মগ্রহণের পর শিশুর বৈশিষ্ট্যাবলি যা আমরা লক্ষ্য করি ক্রমাগত বয়স বৃদ্ধির সাঙ্গে সে সব পরিবর্তন ও নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে থাকে, স্বাভাবিক ভাবে। ফলে বয়স ভেদে যে সব বৈশিষ্ট্যাবলি স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয় তাকে স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য বলে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো কোন শিখনের ফল নয়। যেমন ঃ জন্মের সময় শিশুর দাঁত থাকেনা, কিন্তু ১ বৎসর বয়সে চার থেকে ছয়টি দাঁত উঠে। শৈশব ও বাল্যকালে ছেলেদের দাঁড়ি থাকেনা কিন্তু কৈশোরকালে দাঁড়ি গোফ উঠে। শৈশব ও বাল্যকালে মেয়েদের বুক সমান থাকে, কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালে স্তন বড় হয় ইত্যাদি যেমন শারীরিক বৈশিষ্ট্য তেমনি বয়স স্তর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার্থীদের বয়সস্তর অনুযায়ী যে সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় সে সব জানা একজন শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার সঙ্গে আচরণ করা, তাকে পরিচালনা কর, নির্দেশনা প্রদান, পাঠ দান পদ্ধতি অবলম্বন এবং তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা প্রদান করাই শিক্ষকের কর্তব্য। বয়ঃসন্ধিকালের (মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের) শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসংখ্য স্ব-প্রকাশ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

**বয়ঃসন্ধিকাল ঃ** শৈশব ও বাল্যকাল পেরিয়ে সংক্ষিপ্ত বয়ঃসন্ধির মধ্য দিয়ে যৌবনের দ্বার প্রান্তে পৌছানোর যে দ্রুত, বাড়ন্ত, পরিবর্তনশীল সময় তাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়। ইংরেজি Adolescence এর অর্থ হলো পরিপক্কতা অর্জন (To grow maturity)। সাধারণত ঃ ১২ থেকে ১৯ বৎসর পর্যন্ত সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল ধরা হয়। আবহাওয়া ও অঞ্চলভেদে এটা কিছুটা পরিবর্তনশীল। ১২-১৪ বৎসরকে প্রারম্ভিক বয়ঃসন্ধিকাল (Early Adolescence) এবং ১৫-১৯/২১ বৎসর প্রান্তিক বয়ঃসন্ধিকাল (Late Adolescence) বলা হয়। অনেকে যৌন পরিণতির (Puberty) স্তরকেই বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোরকাল বলে বিবেচনা করছেন। প্রকৃতপক্ষে বাল্যকালের শেষ পর্যায় ও কৈশোরের আগমনের সন্ধিক্ষণকে বয়ঃসন্ধিকাল (Puberty) বলে।

"বয়ঃসন্ধিকারের শিক্ষার্থীরা হলো ফ্লেপার (Flepper) অর্থাৎ যে পাখির এখনও পরিপূর্ণ পাখনা গজায়নি অথচ বাসাতেই উড়বার অব্যাহত চেষ্ট করছে" - Stanly Hall.

• বয়ঃসন্ধিকাল মানব জীবনের একটি বিশেষ সময়কাল যেখানে উপনীত হলে মনের রাজ্যে বার বার নতুন চিন্তা চেতনা জাগ্রত হয়। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে তাদের মানসিক, আবেগিক বিকাশ ঘটতে থাকে এবং সামাজিক বোধ ও দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে, ফলে



www.pathagar.com

জগতকে তারা নতুনরূপে দেখতে ও উপলব্ধি করতে থাকে। বিশেষ করে যৌবনাগমনের ফলে জীবনের উপলব্ধিটাও সম্পূর্ণ নতুনভাবে রূপ নেয়। তাদের মধ্যে অনেক নতুন চাহিদাও সৃষ্টি হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে স্বীয় অবস্থানের সংগতি বিধান, চাহিদার পূরণ ও সমস্যাবলি সমাধানের ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা রক্ষায় অসুবিধার মধ্য দিয়ে এ বয়সের ছেলেমেয়েদের কাটাতে হয়।

**বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলি ঃ**

(১) প্রাথমিক বয়ঃসন্ধিকালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ধন সম্পন্ন হয় এবং প্রান্তীয় বয়ঃসন্ধিকালে উচ্চতা ও শারীরিক ভাবে পূর্ণতায় পৌঁছায়।

(২) ছেলেমেয়েদের পেশীর শক্তি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৃঢ়তা এবং সতেজতা বৃদ্ধি পায়। দেহের সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্ধন হয়ে থাকে।

(৩) যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি, বিকাশ ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়; প্রান্তীয় বয়ঃসন্ধিকালে পূর্ণতায় পৌঁছায়। ছেলেদের পিতৃত্ব এবং মেয়েদের মাতৃত্ব প্রবণতার সকল আঙ্গিক বৃদ্ধি সম্পন্ন হয় এবং ক্ষমতা লাভ করে।

(৪) শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রমন্ডলি ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির (Ductless Gland) বিকাশ ঘটে।

**বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলি ঃ**

(১) প্রাথমিক বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীদের মাঝে বুদ্ধির পরিবর্তন আসতে থাকে এবং প্রান্তীয় বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধির পরিপূর্ণতা আসে। এ সময় তারা সঠিক বুদ্ধি সম্পন্ন কাজ করতে পারে।

(২) চিন্তা শক্তির দৃঢ়তা আসে এবং বিমূর্ত চিন্তার বিকাশ ঘটে।

(৩) এ বয়সে যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা আসে বিদায় তারা যুক্তি প্রদানে সক্ষম হয় ও যুক্তি তর্কে অবতীর্ণ হয়। যুক্তি সহকারে সবকিছুকে বুঝতে চায়।

(৪) বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার বিকাশ ঘটে ফলে অনুসন্ধান করে তার সম্পর্কে সে বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সহ তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হয়।

**বয়ঃসন্ধিকালে আবেগিক বৈশিষ্ট্যাবলি ঃ**

(১) এ বয়সের ছেলেমেয়েরা তীব্রভাবে আনন্দ অনুভূতির আবেগ প্রকাশ করে।

(২) আবার তারা সামান্যতে বিমর্ষ ও মর্মাহত হয়। সামান্যতে অভিযান করে; ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশী অভিমানী হয়।

(৩) যে কোন আক্রমণাত্বক অনুভূতির কারণে লজ্জা ও হীনমন্যতায় ভোগে।

(৪) প্রান্তীয় বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীর মাঝে ভয়, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্মুখীতার আবেগ থাকে।



www.pathagar.com

(৫) এদের আবেগের মধ্যে অহমিকার ও ঈর্ষাবোধ বেশি থাকে। নিজের বুঝের উপর প্রাধান্য দিতে চায়।

(৬) তারে আবগ সংঘাতময় হয়ে থাকে; নৈতিক সেন্টিমেন্ট বেশী থাকে।

(৭) এ বয়সে আবেগের মধ্যে সমবেদনার চাইতে মর্মবেদনা বেশী থাকে।

**সামাজিক বৈশিষ্ট্যাবলি ঃ**

(১) প্রান্তীয় বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের মাঝে দলগঠনে প্রবণতা বেশী থাকে।

(২) তাদের মাঝে বন্ধুত্ব গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সহানুভূতি ও সহযোগিতার অনুভূতি প্রবল হয়।

(৩) তখন ছেলেমেয়ে উভয়ে উভয়ের সাথে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হয় এবং লেখালেখিতে নেমে পড়ে।

(৪) এ বয়সের ছেলেমেয়েদের মাঝে মানবতবোধ এবং জনকল্যাণমূলক কাজের প্রবণতা তীব্রভাবে দেখা দেয়।

ছবিগুলো লক্ষ্য করুন, ছেলেমেয়েদের আচরণগত দিক ও প্রতিক্রিয়া বিচার করুন ঃ

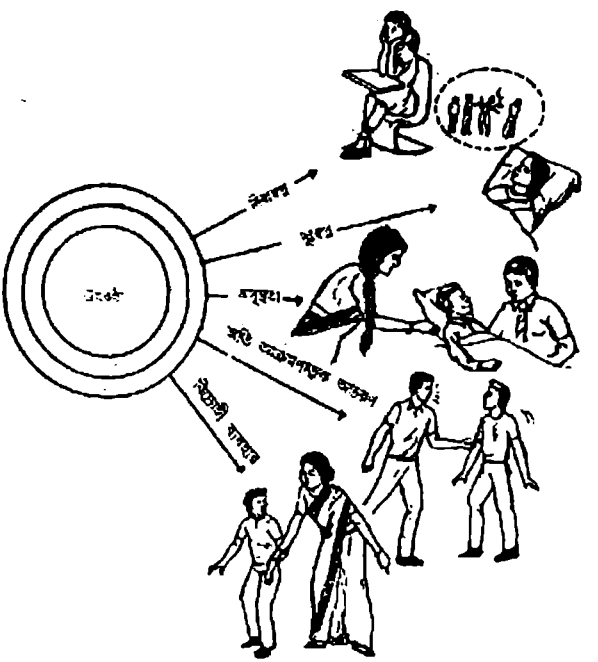

*ছেলেমেয়েদের ওপর উৎকণ্ঠার প্রভাব*



www.pathagar.com

# বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থী

যেসব শিক্ষার্থী দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে পৃথক তাদেরকে বোঝানোর জন্য 'বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী' কথাটি ব্যবহার করা হয়। বিশেষ শিখন চাহিদার শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে যেসব শিক্ষার্থী তারা হলোঃ

১. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী
২. শ্রবণ প্রতিবন্ধী
৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
৪. শারীরিকভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধী।

স্বল্প মাত্রার এসব প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের সাথে একই বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করতে পারে। সামন্য সহযোগিতা ও উৎসাহ পেলে এরাও অনেক শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির সঙ্গে কিছুটা হলেও তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

শিক্ষকের উচিত, এইসব শিক্ষার্থীদেরকে জানা, তাদের ও তাদের সমস্যা খুঁজে বের করা এবং শিখন সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এরাও মানুষ। সকলের মত এদেরও মৌলিক অধিকার পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা ও জীবন যাপনে অভ্যস্থ হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। এটা তাদের মৌলিক অধিকার। আমাদের সংবিধানে তাদের মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

## প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমস্যা ঃ

**স্বল্পবুদ্ধি প্রতিবন্ধী ঃ** স্বল্প বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখনের গতি সমবয়সীদের তুলনায় খুবই কম। এদের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়, বিষয়বস্তুর প্রতি বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না, সবকিছুকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে দেখে, কৌতূহল প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয়। সমবয়সীদের যেসব বিষয়ে অনুরাগ থাকে, এদরে তা থাকে না। এরা সমবয়সীদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করে না, বয়সে ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশা করে।

**স্বল্প শ্রবণ প্রতিবন্ধী ঃ** স্বল্প শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের ভাব বিনিময়ে অসুবিধা হয়। শিক্ষক ও সঙ্গী শিক্ষার্থীদের কথা ভালভাবে অনুসরণ করতে পারে না। কথা শোনার সময় বক্তার মুখের কাছে ঝুঁকে কথা শোনা।

**স্বল্প দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ঃ** স্বল্প দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শ্রেণীর কার্যাবলি অনুসরন করতে পারে না। কোন বস্তুকে খুব কাছে নিয়ে দেখে। পড়ার সময় বই চোখের কাছে নিয়ে পড়ে। চক বোর্ডের স্বাবাবিক লেখা/অক্ষর আসনে বসে স্পষ্ট দেখতে



www.pathagar.com

পায় না। প্রায়ই হোঁচট খেয়ে পড়ে। পড়তে দিলে মাথা দরে বা ক্লান্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ তীর্যকভাবে তাকায় বা কিছু দেখার সময় মাথা কাত করে।

**শারীরিক প্রতিবন্ধী ঃ** শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা পোরিও বা দূর্ঘটনার কারণে কিংবা জন্মগতভাবে শরীরের বিভিন্না অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমস্যা থাকে। এতে তাদের চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় হাত পুড়ে গেলে লেখার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। শরীরের কোন নির্দিষ্ট অঙ্গের হাড় বেড়ে গিয়ে বসার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। অনেক সময় তাদের জন্য বিশেষ ধনের আসন-ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। বোবা, তোতলা শিক্ষার্থী শিক্ষকের বক্তব্য বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারে না কিংবা সংকোচ বোধ করে। অনেক সময় এরা লম্বায় সমবয়সীদের তুলনায় খাটো হয়, বিদ্যালয়ের বা শ্রেণীর অন্যান্য কোন শিক্ষার্থী না বুঝে তাদের বিকৃত নামে সম্বোধন করে। যেমন ঃ- এই পিচ্চী বা বামন বা নুলা (খোঁড়া) ইত্যাদি। এতে এরা খুবই অসহায় অবস্থায় থাকে। সমবয়সী ও অন্যান্যদের সাথে মিশতে পারে না।

**বিশেষ শিক্ষা চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমস্যা নিরসনে শিক্ষকের ভূমিকা ঃ**

শিক্ষক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখন সমস্যা শনাক্ত করে তাদের শিখন সমস্যা দূর করবেন। এজন্য তিনি যা করবেন তা হলো ঃ

- প্রতি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের শিখন সমস্যা শনাক্ত করা।
- পিতা-মাতা/অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করে প্রতিবন্ধিতার কারণ খুজে বের করা।
- বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এসব শিক্ষার্থীদের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করা ও শিখনে উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমস্যা সনাক্ত করে শিখন সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১। স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন সমস্যা দূরীকরণে শিক্ষকের ভূমিকা ঃ

- স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রায় দুই বছর পিছিয়ে থাকে। তাই বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে এদের ব্যক্তিস্বত্তার বিকাশে সহায়তা করা যায় না। কারণ এ ধরনের শিক্ষার্থীরেদ জন্য উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও কখনই স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের স্তরে আনা সম্ভব হয় না। তবে এরা যেন আত্মনির্ভরশীল পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসেবে বিকাশ লাভ করে, সে বিষয়ে চেষ্ট করতে হবে। এদের জন্য শিক্ষকের অত্যন্ত ধৈর্যের প্রয়োজন। ঘৃণা ও অবজ্ঞা দিয়ে এদের উন্নত করা যায় না। এদেরকে ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারলে তা কার্যকর হবে। বিষয়বস্তু বার বার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এদের মনোযোগ



www.pathagar.com

ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় শিক্ষাকাল কমিয়ে ফেরতে হবে। এই সব শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর সঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যবস্তা করলে তাদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যহত হয়। সুতরাং এদের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

• স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা যাতে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সহজভাবে সম্পাদন করতে পারে, যথাযোগ্য সামাজিক আচরণ করতে পারে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, শিক্ষার মধ্যে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা যেনা মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিখনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য শিক্ষকের ভূমিকা ঃ

• এ ধরনের শিক্ষার্থী শিক্ষককের সরাসরি দেখতে না পেলে শিক্ষকের কথা বুঝতে পারে না। কারণ শিক্ষক কথা বলার সময় তার ঠোঁটের নাড়াচড়া লক্ষ্য করে সে মূল বিষয় বুঝে নেয়ায় চেষ্টা করে। এ অবস্থায় শিক্ষককে এমন জায়গায় দাড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে কথা বলতে হবে যেন সকলে তাকে দেখতে পায়।

• কোন শিক্ষার্থী কানে শোনার যন্ত্র (Hearing aids) ব্যবহার করলে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা বা নানা ভাবে বিব্রত করতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণত; শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুটি নিজেকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে চাইবে এবং পেছনের বেঞ্চে বসতে শুরু করবে যা তার শিখনে সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনা যেন না ঘটে সে জন্য শিক্ষকের উচিত হবে শ্রেণীর/বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর সমস্যা সম্পর্কে ধারণা দেয়া। শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুকে যেন সবাই শিখনে সহযোগীতা করে এ ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

• শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সবসময়ে একজন ভাল ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে অনুসরণ করে, যদি শিক্ষকের কোন বক্তব্য তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় তাহলে ঐ ভাল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তারা সাহয্য নেয়। তাই শিক্ষক যদি ভালো ও মেধাবী ২/১ জনের সাথে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর ভাল সম্পর্ক বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নিতে পারেন তাহলে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীটি শিখনের ক্ষেত্রে ততটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণের শিক্ষকের ভূমিকা ঃ

• যারা সামান্য বা ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (Low vision) এদের প্রতি শিক্ষকের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে তাদের পিতামাতার সাথে কথা বলে তার দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা কী ধরনের তা জেনে সেভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।



www.pathagar.com

• তাদের বসার জন্য সামনের বেঞ্চে জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। এতে বোর্ডের লেখা দেখতে তাদের অসুবিধা হবে না।

• শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এতে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবে এবং যে কোন ধরণের সহযোগীতা করবে।

৪। শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণে শিক্ষকের ভূমিকা ঃ

শারীরিক প্রতিবন্ধী (Physically disabled) শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের সমস্যার কথা চিন্তা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন ঃ

• আসবাবপত্র এমনভাবে সাজাতে হবে যেন তাদের মধ্যে কেউ হুইল চেয়ার (wheel chair) ব্যবহার করেও চলাফেলা করতে পারে।

• লেখার বোর্ডটি অপেক্ষাকৃত নিচু করতে হবে যাতে সেও হুইল চেয়ারে বসে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মত লিকতে পারে।

• শিক্ষকের কিছু কিছু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা মনে আঘাত না পায়। যেমন- শিক্ষক যদি বলেন, যাদের পড়া হয়েছে তারা দাড়াও। তাহলে হুইল চেয়ারে বসা শিক্ষার্থীর পক্ষে দাড়ানো সম্ভব হবে না। আবার শিক্ষক যদি বলেন তাড়াতাড়ি লেখ, যার লেখার সমস্যা থাকে তার পক্ষে তাড়াতাড়ি লেখা সম্ভব হবে না।

শ্রেণী বা বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষার্থী নেয শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুকে কানা, খোড়া, বোবা, তোতলা ইত্যাদি বলে সম্বোধন না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই তাদের অসুবিধার কথা জানাতে হবে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।



www.pathagar.com

## কর্মপত্র : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের লক্ষণসমূহ (স্পাইডারগ্রাম)
## বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থী

কর্মপত্র – ১

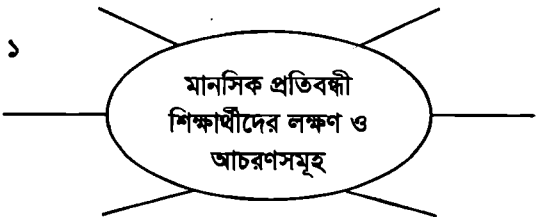


কর্মপত্র – ২

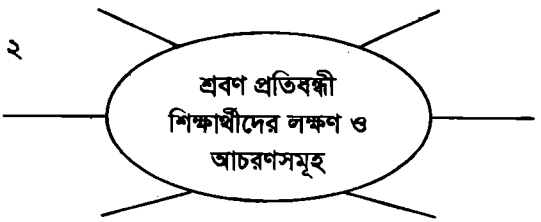


কর্মপত্র – ৩

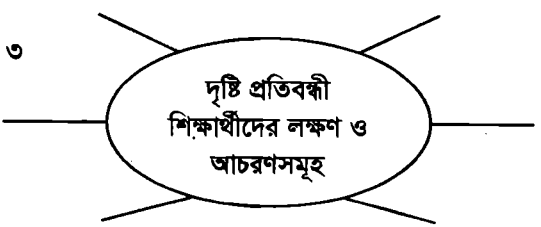


কর্মপত্র – ৪

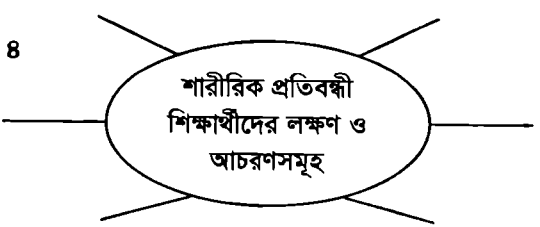




www.pathagar.com

## সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি


১। সুশিক্ষক – ড. *মঞ্জুশ্রী চৌধুরী*
২। শিক্ষার ভিত্তি – *প্রফেসর একে এম মোজাম্মেল হক*
৩। বৃহত্তর বাংলার ইতিহাস পরিচয় – *ম. ইনামূল হক*
৪। বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা; প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি – ড. *আবদুল ওয়াহীদ*
৫। শিক্ষার ভিত্তি – ড. *মোঃ আজহার আলী* ও ড. *আবদুল আউয়াল খান*
৬। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা – *হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত*
৭। ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস – *এ কে এম আবদুল আলীম*
৮। মাধ্যমিক শিক্ষা – *ফয়জুননেছা ও মনিরুজ্জামান*
৯। শিক্ষানীতি পরিক্রমা – *প্রফেসর মোঃ আনসার আলী*
১০। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা – *অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন*
১১। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী – ড. *মুহাম্মদ আবদুল্লা*
১২। শিক্ষানীতির স্বরূপ – *মোঃ আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম*
১৩। পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদ জুন, ২০০৪
১৪। স্মরণিকা – গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ২০০৪
১৫। নবোন্মেষ, ঢাকা মেট্রোপলিটন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ১৯৯৯
১৬। পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদ এপ্রিল, ২০০৩
১৭। দর্পণ – দেবিদ্বার রেয়াজ উদ্দীন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা ২০০০
১৮। অগ্রদূত – দেবিদ্বার রেয়াজ উদ্দীন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা ১৯৯৬
১৯। সচিত্র বাংলাদেশ জানুয়ারি, ২০০৩
২০। সচিত্র বাংলাদেশ জানুয়ারি, ২০০৪
২১। আমার বাংলাদেশ আমার ভাবনা – *অধ্যাপক আলমগীর কবির*
২২। জাতি গঠনে সুশিক্ষায় শিক্ষক – *আলমগীর হোসেন খান*
২৩। জেন্ডার, নেতৃত্ব এবং নারীর অধিকার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা আলোচনাপত্র, জুন ২০০৯
২৪। মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিশুর ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত মডিউল (১ – ৩)
২৫। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা – *মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান*




www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
আলমগীর হোসেন খান
প্রকাশনায়
হাতেখড়ি
প্রচ্ছদ : মশিউর রহমান

হাতেখড়ি

ISBN : 984-70200-0063-4
984 70200 0063 4

www.pathagar.com